

অভয়া সংস্করণ
ABHAYA EDITION

আষাঢ় ১৪৩৩
JULY 2026

MED দর্পণ



An Initiative by Students of



BURDWAN
MEDICAL COLLEGE

*With sincere appreciation,
The Editorial Department.*

প্রতিবাদের অন্ধরে, ন্যায়ের আহ্বান

আমরা ‘নইলে মিথ্যা হত সন্ধ্যাতারা
ওঠা

মিথ্যা হত কাননে ফুল ফোটা’’

–এতো শুধু মর্মবাণী হয়েই থেকে গেছে।
আজও এই একবিংশ শতাব্দীতেও
নারীবৈষম্য থেকে শুরু করে নারীসুরক্ষা,
নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা প্রশ্ন চিহ্নের মুখে/

অভয়া আজ শুধু একটি নাম নয়-
প্রতিটি নারীর প্রতিবাদের প্রতীক,
প্রতিটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবিচল
প্রতিরোধের সাহসী কণ্ঠ। সময়ের সঙ্গে
সঙ্গে আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ততা
কমলেও তা জারি আছে, কারণ
তিলোত্তমার বিচার আজও মেলেনি। শুধু
এই নৃশংসতাই নয়, সাম্প্রতিক কালে
ঘটে যাওয়া একজন ডাক্তারের ওপর
অ্যাসিড নিক্ষেপের মতো বর্বর আক্রমণ
এই দুই ঘটনাই সমাজের সামনে এক
নির্মম বাস্তবতা তুলে ধরে। দুই ভিন্ন
ঘটনার অন্তরালে একই প্রশ্ন প্রতিধ্বনিত
হয়- কবে একজন নারী ভয়হীনভাবে
বাঁচার অধিকার পাবে?

তবুও অন্ধকার-ই শেষ কথা হয়।
অন্ধকারের উৎস থেকে উৎসারিত
আলো খুঁজে নেওয়ার দায়িত্ব
আমাদেরই। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে
আজও যাঁরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে
দাঁড়িয়েছেন, অকথ্য নির্যাতনের পরও
মাথা উঁচু করে বাঁচতে শিখেছেন ও
শিখেয়েছেন তাঁদের সকলকে স্যালুট।

আমাদের ম্যাগাজিন কমিটি নারী ও
স্বাস্থ্যকর্মীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত
যেকোন সহিংসতার তীব্র নিন্দা
জানায়। আমরা ন্যায়বিচার, নিরাপত্তা
ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবিতে
সোচ্চার সকল মানুষের পাশে আছি।
যে সাহস অন্যায়ের সামনে মাথা নত
করে না, যে কণ্ঠ নীরবতাকে ভেঙে
সত্য উচ্চারণ করে-সেই সব সাহসী
নারী এবং আপোষ না করে অন্যায়ের
বিরুদ্ধে লড়ে চলা প্রতিটি মানুষকে
আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কুর্নিশ।

বেঁচে থাকার গান

INDEX

- 01 From the Desk of the Principal
- 02 Note from the MSVP
- 03 Address by the Dean
- 04 Letter from The Editor - in - Chief
- 05 নিলয় - Bengali Literary Section
- 06 Parallax - English Literary Corner
- 07 उद्गार - Hindi Sahitya
- 08 Wanderlust - Travelogue
- 09 The Remedy Records - Medical Cases
- 10 Oracle's Insight - Ichthyosarcotoxycosis:
A Detailed Review
- 11 Clinical Compass - Medical Updates
- 12 Anatomy of a Venture
- 13 চিত্রGRAPHY
- 14 Mehfil -e -Art
- 15 Voices Behind The Pages
- 16 Sports Spotlight



Prof. (Dr.) Mousumi Bandyopadhyay

PRINCIPAL

BURDWAN MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL



Department of Health and Family Welfare
Government of West Bengal

Office of the Principal, Burdwan Medical College, Baburbag, Burdwan – 713104
Phone No. – (0342)7962201, Mail ID- burdwanmedicalcollege76@gmail.com

Dated, Burdwan, the 18.06.2026

MESSAGE

It gives me immense pleasure to learn that the MBBS students of Burdwan Medical College are launching an **online monthly magazine**.

On this special occasion, I extend my warm greetings and sincere felicitations to all the students who have taken the initiative to make this endeavour a reality. This magazine will serve as a valuable platform for the expression of medical articles, creativity, academic excellence, case studies, literary talent, and innovative ideas among the students and faculty members of the institution.

I am confident that this online monthly magazine will foster intellectual exchange, encourage constructive thinking, and strengthen the spirit of unity and collaboration within the Burdwan Medical College fraternity. I sincerely appreciate the efforts of all those involved in its publication and wish them continued success in this noble venture.

May this magazine grow from strength to strength and become a source of inspiration, knowledge, and pride for our institution.

 18/06/26

Principal

Burdwan Medical College
Purba Bardhaman

Principal
Burdwan Medical College
Purba Bardhaman



Prof. (Dr.) Tapas Ghosh

MSVP

BURDWAN MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL

The launch of an online monthly magazine by the MBBS students of Burdwan Medical College is a welcome and commendable initiative.

Such a publication reflects the enthusiasm, talent, and academic spirit of our students. I hope it becomes a meaningful forum for exchanging knowledge, showcasing creativity, and promoting scientific as well as literary pursuits within the institution.

I congratulate the editorial team and everyone associated with this endeavour. May this magazine continue to inspire learning, innovation, and excellence, and contribute significantly to the academic legacy of Burdwan Medical College.

My best wishes for its continued success.



Prof. (Dr.) Arunima Chaudhuri

DEAN OF STUDENT AFFAIRS
BURDWAN MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL

Dear Students,

It gives me immense pleasure to welcome the launch of our college magazine — a new chapter in the intellectual and creative life of our institution. This publication is more than a collection of articles; it is a mirror reflecting the thoughts, aspirations, and talents of our student community, and a testament to the vibrant culture of expression we hope to nurture here.

Medicine, at its heart, is a deeply human science. As you progress through your training, you will encounter suffering, resilience, hope, and loss in ways few other professions do. This is precisely why I want to emphasize the importance of health humanities within this magazine's pages. Literature, poetry, narrative medicine, art, and reflective writing are not diversions from clinical learning — they are essential companions to it. They sharpen empathy, deepen observation, and help you make sense of experiences that data and textbooks alone cannot capture. A physician who can articulate a patient's story with sensitivity is often a physician who listens more carefully at the bedside.

I encourage every student to contribute — whether through reflective essays on clinical encounters, poetry, illustrations, book reviews, or explorations of ethics and the doctorpatient relationship. Let this magazine become a space where scientific rigor and humanistic reflection coexist and enrich one another.

My heartfelt congratulations to the editorial team for their initiative and hard work in bringing this vision to life. I wish you all continued success, creativity, and growth.

**With warm regards and best wishes,
Arunima Chaudhuri**



ARITRA SINGHA ROY

EDITOR - IN - CHIEF

জানি না ঠিক কোথা থেকে কি ভাবে শুরু করব , তবে যা লিখছি তা মন থেকেই , সঙ্গে পাঠককূল কে এটা বলে আশা দিতে পারি যে এই ম্যাগাজিন ডিজিট্যাল হলে কি হবে ! এটার বাঁধন কিন্তু ভালোবাসা ও কিছু সরল বিশ্বাসে তৈরি সুতো ।

ফার্স্ট ইয়ার থেকে বার তিনেক প্রচেষ্টা করে অবশেষে কোনো একটা সফল ভাবে সেটা কে বাস্তবের মাটিতে নামাতে পারার খুশি হয়তো আমার বলে প্রকাশ করার মতো নয় ।

একদিন সন্ধ্যার সময় নিজের ঘরের বাইরে এক জন সিনিয়র ও তার দুই জুনিওর-এর একটা হাসির ছলে বলা কোনো কথা যে এভাবে সত্যি হতে পারে কেবল এখনও একটা থ্রিল অনুভব করি । এবার সহজ করে বলি ওই জুনিয়র আর কেউ নয় দক্ষ অনুজ নীলাঞ্জন আর আগ্নিক । ওরা ছিল বলে এটা আজ দাঁড়াতে পেরেছে,পেরেছে ডানা মেলতে । এই যে হবে হবে থেকে হয়ে গেলো ব্যাপার টা সত্যি অসাধারণ। আমি কৃতজ্ঞ আমার পুরো টিম বিশেষ ভাবে আমার বন্ধু আফরিন যে এই ভাবে আমায় সঙ্গ দেবে তা বলে বোঝানোর মতো নয় । পুরো দল কে হয়তো প্রণাম জানানো তাও যথেষ্ট নয় । এই পাহাড় প্রমাণ কাজ কে এত সফল ভাবে নামানোর জন্য । সিনিয়র দের থেকে অনেক বার শুনেছিলাম যে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ টাকে বিএমসি বলে তা বর্ধমান এর বি লেখার জন্য নয় বেস্ট লেখার বি ওটা , যে ভাবে এই দল কাজ করেছে এত অল্প সময়ে তা ওটাই প্রমাণ করলো । হয়তো এই টিম এর জন্য এটা সম্ভব ।

একটা ভালো কাজ শুরু হলে অনুপ্রেরণা আসে বাধা ও আসে এটা প্রকৃতির নিয়ম আমরা ও তার ব্যতিক্রম নয় এটা বলতে পারি । প্রথম চারা গাছ পুঁতেছিলাম বাংলায় করব আর বিষয় দিয়ে ছোট একটা কিছু করব ভেবে কিন্তু নিজেদের অজান্তেই গাছটা কখন যে এত বড় হয়েছে বুঝতেই পারি নি । শুনেছিলাম এটা নাকি দুঃসাহস যে তোরা তিনটে ভাষা

কে রাখছিস ! তার সঙ্গে এত বিষয় কে !!!!! । কোনোদিন হবে না নৈব নৈব চা কিন্তু করতে পেরেছি ভালো লাগছে । যুক্তি তর্ক করে কিহ্ ভাবে হবে হবে কি হবে ঠিক করতে গিয়ে আবার জানলাম শেখার জন্য শেষ নাই । আমরা ভগবান শয়তান কিছুই নয় যে আমাদের ভুল হবে না ওটা থাকবে অনুরোধ রইল সফল পাঠক হিসাব হিসেবে ওটা আমাদের দেখানো । আমরা ম্যাগাজিন প্রকাশ পর থেকে এটার অপেক্ষায়।

সবাই জানলে খুশি হবে এই মিষ্টি নাম টা আমাদের সব থেকে কনিষ্ঠ সদস্যরা দিয়েছে , পৃথা কে এটার জন্য ধন্যবাদ। জয়শ্রী রায় বা সিজার বাগচী থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে কাজ টা করার চেষ্টা করেছি তাদের নাম না লিখলে ভারী অন্যায় হবে ।

আমরা যে এই ভাবে ম্যাগাজিন টা কে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ এর সব সেগমেন্ট এ ছড়িয়ে দিতে পেরেছি এর জন্য আমরা যে অ্যালাইড মেডিকেল স্টুডেন্ট, নার্সিং স্টুডেন্ট সবার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি । আমাদের পত্রিকা প্রাক্তনী দের কাছে ও বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমাদের পথ দেখানোর জন্য। ডিপার্টমেন্ট থেকে সব থেকে বড় কথা প্রিন্সিপাল ম্যামের সাহায্য কে না বলা মানে পত্রিকা কে ছোট করা !

বিশেষ দীর্ঘায়িত না করে বলছি উপভোগ করুন পত্রিকা কে ! আর যে দল টা প্রতি টা লেখা তে নিজের তুলির জাদু দেখালো তাদের না বলে গেলে বড় অন্যায় হবে । পরিশেষে এ, বিভাংশু, সৌনক,স্নেহা, সৌমিক , সুপ্রতিম, সার্থক , মেহেলি, প্রতুষা,অনহিতা,অহনা , লিজা , অর্চি বিশ্বরূপ ,সুরজিৎ , বিশ্বম্ভর, শ্রুতি, তনয়া, অনুষ্কা, আকাশদীপ, সব্যসাচী, ঈশিতা , কল্লোল , ভাগ্যশ্রী, সুরতমা , সানিয়া, পৃথা , বিক্রম সহ সব এমবিবিএস স্টুডেন্ট আর নির্মাণ ও অন্যান্য প্যারামেডিকেল ও নার্সিং থেকে যারা আমাদের সাহায্য করেছে।

ডিজিটাল
মুকুন্দর রায়

ম

অভয়া
সংখ্যা



জন্মশতবার্ষিকী

২০২৬ সালের ৩০ জুন নোবেলজয়ী মার্কিন বায়োকেমিস্ট পল বার্গ (Paul Berg) [30 জুন, 1926 – 15 ফেব্রুয়ারি 2023] এর জন্মের ১০০ বছর পূর্ণ হলো। আধুনিক জিনপ্রযুক্তির অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবে তিনি Recombinant DNA (rDNA) প্রযুক্তি উদ্ভাবনে (বিশেষত gene splicing) অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বলা যেতে পারে ওনার হাত ধরেই আসা এই প্রযুক্তি র দ্বারা আজ হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন (hep B vaccine) থেকে ইনসুলিন উৎপাদন সবই সম্ভবপর হয়েছে.....

এই অসামান্য অবদানের জন্য তিনি ১৯৮০ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। পল বার্গের জন্মশতবার্ষিকী কেবল একজন বিজ্ঞানীর প্রতি শ্রদ্ধার্থ্য নয়, বরং আধুনিক জীবপ্রযুক্তির বিকাশে তাঁর অসামান্য অবদানের স্মরণ ও উদ্‌যাপনেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ।





ডিজিটাল সুকুমার রায়

#আবোলতাবোল# মগু ক্লাব #নন সেন্স

প্রথম সংখ্যা,

"এই দেখ পেনসিল্, নোটবুক এ-হাতে,

এই দেখ ভরা সব কিল্‌বিল্ লেখাতে।

ভালো কথা শুনি যেই চটপট্ লিখি তায়—

ফড়িঙের ক'টা ঠ্যাং, আরশুলা কি কি খায় ;...."

যতো রাজ্যের কিলবিল লেখা , "আজগুবি তথ্য" আর হাসির লেখা চাই এই
বারের THEME এ ,শ্রদ্ধেয় লেখকের খাঁচে ;এ ছাড়া সুকুমার রায় কে নিয়ে
প্রবন্ধ বা ওনার লেখার উপর আলোকপাত করে দুটো লেখা জমা পড়লে
মন্দ হয় না।

এখন কেউ যদি লেখা না দাও, হিজ্ বিজ্ বিজ্ কেই চার আনা পয়সা দিয়ে
রাজি করাতে হবে আর কি.....সাক্ষী না দিক, একটা লেখা দিক....বাকি
রুমাল থেকে বেড়াল করার দায়িত্ব তোমাদের ❤️

সূচিপত্র

◆ সম্পাদকীয় (জানিকেউপড়বেনা 😊)

প্রচ্ছদ কাহিনি (প্রবন্ধ)



বাংলা সাহিত্য, সুকুমার এবং অন্য সুকুমার.... ২
মেহেলি প্রামানিক

সুকুমার রায়ের ননসেন্স সৃষ্টি আবোল - এর
আড়ালে ক্ষুরধার বুদ্ধি ও সমাজদর্শন। ৯
ডা: মৃণাল পাল

ক্ষণজন্মা ১১
দেবায়ন রায়

শরতের শেষ বিকেলে: গড়পাড় সুকুমার..... ১৩
কৃষ্ণ কুমার পাল

ছোট গল্প

রাত দুটোর পর চাঁদের চাকরি..... ২২
সালোনি ভট্টাচার্য

পাগলাদাশু ও ননসেন্স রাজ্য..... ৩০
কল্লোল মন্ডল

হারানো জিনিসের স্বাধীন রাজ্য ৩৮
সালোনি ভট্টাচার্য





নাটক

বিদ্যা কাহিনি..... ২৪

প্রভুশা মহন্ত

অন্য স্বাদে..... ৩২

ফুটবল ফুটানি আর

গোলমেলে গোল কথা..... ৩৪

Swan brother



অণু গল্প প্রতিযোগিতা

....৪০

'৮০' তে আসিও (প্রাক্তনী).....৪১

SPECTRA ও BMC

ডা: আশিস মন্ডল

কবিতা৪২

ব্যঙ্গকবির বরদান ৪৪

অনুষ্কা সাহা

স্ক্রলের যুগে সুকুমার ৪৬

সুরজিৎ রায়

ডিজিটাল সুকুমার ৪৬

স্নিতা দাস

পাসওয়ার্ড প্যাঁচাল ৪৭

অব্র কিশোর ভট্টাচার্য

ডিজিটাল বিড়াল-রুমাল ৪৮

লিজা আফসানা

অবাক পরীক্ষা ৪৯

ভাগ্যপ্রী বিষ্টু

আত্মকথা ৫০

প্রত্যাশা মহন্ত

বাক্সবন্দী ৫১

দিকপাল সিং

কাঁচের দেওয়ালে আঙুলের দাগ ৫২

সামিমা আখতার (মুন)

স্ক্রলনগরীর স্ক্রলার ৫৩

অহনা ঘোষ



রায়বাড়ির রূপকথা

তনয়া সামন্ত

৫৪

বুড়োর ঘুরতে যাবার দেশ

বাঙালি রাজপুত

৫৫



ধারাবাহিক উপন্যাস৫৭

বোলপুরের বাড়িটা

৫৮

কল্লোল মণ্ডল

জানা অজানা সুকুমার

সুকুমার রায় এর লেখা

সম্পাদকের দশা (সম্পাদকীয়)

প্রবন্ধের অংশ

২১

মণ্ডা ক্লাবের আমন্ত্রণ পত্র

৬২

সুকুমার, সুখলতা এবং চিকিৎসা সংবাদ

২৯

এক ঝালকে সুকুমার

৫৬

"খাম" খেয়ালে.....৬০

এই মাসের চিঠি

৬৯

প্রচ্ছদ: ঈশিতা সিনহা

মুখ্য সম্পাদক: বাঙালি রাজপুত

“

সম্পাদকের দশা

সম্পাদকীয়-

একদা নিশীথে এক সম্পাদক গোবেচারা,
 পোঁটলা পুটুলি বাঁধি হইলেন দেশছাড়া ।।
 অনাহারী সম্পাদকি হাড়ভাঙা খাটুনি সে।
 জানে তাহা ভুক্তভোগী অপরে বুঝিবে কিসে?
 লেখক পাঠক আদি সকলেরে দিয়া ফাঁকি।
 বেচারি ভাবিল মনে-বিদেশে লুকায়ে থাকি ।।
 এদিকে তো ক্রমে ক্রমে বৎসরেরক হল শেষ।
 'নোটিশ পড়িল কত 'সম্পাদক নিরুদ্দেশ' ।।
 লেখক পাঠকদল রুঘিয়া কহিল তবে।
 জ্যান্ত হোক মৃত হোক ব্যাটারে ধরিতে হবে ।।
 বাহির হইল সবে শব্দ করি 'মার মার'।
 -দৈবের লিখন, হায়, খণ্ডাইতে সাধ্য কার ।।
 একদা কেমনে জানি সম্পাদক মহাশয়।
 পড়িলেন ধরা-আহা দূরদৃষ্ট অতিশয় ।।
 তারপরে কি ঘটিল কি করিল সম্পাদক।
 সে-সকল বিবরণে নাহি তত আবশ্যক ।।
 মোট কথা হতভাগ্য সম্পাদক অবশেষে।
 বসিলেন আপনার প্রাচীন গদিতে এসে ।।
 (অর্থাৎ লেখকদল লাঠৌষধি শাসনেতে।
 বসায়েছে তারে পুনঃ সম্পাদকী আসনেতে ।।)
 ঘুচে গেছে বেচারীর ক্ষণিক সে শান্তি সুখ।
 লেখকের তাড়া খেয়ে সদা তার শুষ্কমুখ ।।
 দিস্তা দিস্তা পদ্য গদ্য দর্শন সাহিত্য প'ড়ে।
 পুনরায় বেচারির নিত্য নিত্য মাথা ধরে ।।
 লোলচর্ম অস্থি সার জীর্ণ বেশ রুক্ষ কেশ।
 মুহূর্ত সোয়াস্তি নাই- লাঞ্ছনার নাহি শেষ ।।

সুকুমার রায়

(‘সন্দেশ’ – ফাল্গুন, ১৩৩৯)

”

সম্পাদকীয়



এখন যেটা কে নিয়ে লিখছি এই বাংলা অংশ টাই হলো পত্রিকার আদিম ও সূচনা বিন্দু।
এখানে দুটো কথা আসবে , এই নাম ও এই বিষয় কোথা থেকে কি ভাবে এলো ?

প্রথম নিলয় মানে ভেন্ট্রিকেল আবার ঘর ও তাই শরীর টা যেমন ওই হৃদপিণ্ডের ধুকুর-পুকুরের উপর দাঁড়িয়ে আছে আমাদের পত্রিকার মধ্যমনি ও চালিকা শক্তি আমি নিলয় মনে করি যেখানে পত্রিকার মনের বাড়ি। সেই বাড়ি তৈরি কতটা করলাম সেটা আপনাদের হাতে না হয় তুলে দিলাম বিচারের আশা তে।

আর বিষয় নিয়ে যা কথা হয়েছিল, সামনে পরীক্ষা; কেউ ভয়তে আছে বা কেউ মন ভাঙ্গার দুঃখে , সেই রুগীদের একটু সারানোর দাওয়ায় বা টোটকা এই সুকুমার রায় না হলে তার থেকে ভালো আর কেই বা হতে পারে !!! তাই চেষ্টা করেছি নিজের ভিতরকার বাচ্চাগুলো কে আরো একবার রঙিন স্বপ্নে ভাসিয়ে দিতে।

সত্যি অদ্ভুত সুন্দর অনুভূতি হচ্ছে এত সুদক্ষ অনুজ দেব দেখে। নীলাঞ্জন, অনুষ্কা , কল্লোল আর ভাগশ্রী একটা স্বপ্ন ,যেটা হয়তো কষ্ট করে ৫ তলা তে চড়তে পারত না তাকে এভারেস্টের স্বপ্ন দেখিয়েছে। আমি কাজটার পর বুঝতে পারি যে এদের জন্য লেখা এভারেস্ট না উঠলেও হিমালয় এর কোনো শৃঙ্গে ঠিক উঠেছে। এতটা ওদের থেকে শিখব ভাবতে পারি নি, এরম একটা টিম থাকলে সত্যি স্বপ্নের উড়ান অনেক দূর পৌঁছাতে পারে। আর আগ্নিক বিশ্বরূপ এর অসাধারণ এডিটিং হাতে আঁকা জীবন্ত ছবি গুলো -কে আরো জীবন্ত করে দিয়েছে।

লেখাগুলো যতটা অসাধারণ তাতে নিলয় যে সফল এতে সন্দেহ নেই। ধন্যবাদ সকল লেখক লেখিকা আর আমাদের প্রিয় পাঠকমন্ডলীদের। এই ভালোবাসা থাকলে সত্যি একটা সুন্দর উদ্যোগ বাচ্চা থেকে জলদি নিজের যৌবনে পৌঁছাবে।

বাঙালি রাজপুত্র
মুখ্য সম্পাদক

সম্পাদকীয়



তনুশা মিত্র
সহকারী সম্পাদক

একটি পত্রিকা কেবল কিছু লেখা বা গল্পের সমষ্টি নয়,,এটি সৃজনশীলতা,সামাজিক মেলবন্ধন ও ঐক্যের প্রতীক।।

একটি পত্রিকার মাধ্যমে আমরা অন্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজকে নতুনভাবে চিনতে শিখি, জানতে শিখি।।

এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই, আমাদের সকল BMCian দের মিলিত প্রচেষ্টায় কলেজের প্রথম পত্রিকা প্রকাশ করতে সফল হতে পেরেছি।। এই পত্রিকার একটি অংশ হতে পেরে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ।।

ছোটবেলা থেকে গল্প পড়তে ভালোবাসি,আর নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী লেখালেখিও করেছি।

তবে সম্পাদক হিসেবে কাজ করার সুযোগ আমার কাছে একেবারেই অভিনব এবং শিক্ষণীয়।।

এই সুন্দর অভিজ্ঞতা আমার স্মৃতির পাতায় চিরকাল একটি বিশেষ অধ্যায় হয়ে থাকবে।।

কলেজের প্রথম ম্যাগাজিনে অংশ হওয়ার এবং বাংলা সাহিত্য ও সৃজনশীলতার সঙ্গে আরো গভীরভাবে যুক্ত হওয়ার এই সুযোগ পেয়ে আমি সত্যিই গর্বিত এবং কৃতজ্ঞ। ম্যাগাজিনে সহ-সম্পাদক হিসেবে কাজ করার এটা আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা আমার জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

“মোদের গরব, মোদের আশা, আ-মরি বাংলা ভাষা।”

বাংলা সাহিত্য ও মাতৃভাষার প্রতি অসীম ভালোবাসা, লেখালেখির ওপর গভীর প্রেম আমাদের এই বিভাগের পরিচয়।

“চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির...”

এই চেতনাকে হৃদয়ে নিয়ে আমাদের পথ চলা। প্রতিটি লেখার আড়ালে লুকিয়ে থাকা চিন্তাভাবনা ও লেখক লেখিকাদের নিষ্ঠাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। অনেক কিছু শিখেছি আরো অনেক কিছু পেশার আকাঙ্ক্ষা রইল। সকলকে জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ।

“সবে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।”

ধন্যবাদান্তে



ভাগ্যঙ্গী বিষ্ট
সহকারী সম্পাদক



কঞ্চান মন্ডল
সহকারী সম্পাদক

বৃষ্টিভেজা এই রাত্রে ; পত্রিকার কাজে আমার অভিজ্ঞতার কথা লিখতে বসে ভীষণ আতান্তরে পড়েছি । আমি নিশ্চিত

জটায়ু কে তার উপন্যাস এর কথা বা কেপ ভান্ড্রে কে তার বিশ্বকাপ যাত্রার কথা বলতে বললেও তারাও এই বিপদে পড়বে । বলার মতো এত কিছু রয়েছে ; যে কোথা থেকে শুরু করবো বুঝে ওঠা দায়।

যেমন এক একটা ইট গেঁথে তৈরি হয় মস্ত দালান ; কুঁড়ি থেকে একদিন গড়ে ওঠে মহীরুহ; ঠিক সেইভাবেই শূন্য থেকে শুরু করে পত্রিকাকে সেজে উঠতে দেখলাম । দেখলাম পত্রিকার প্রতিটা আঁকা ; প্রতিটা গল্প কবিতা প্রবন্ধ ; কেমন আমাদের আবেগ কে ছুঁয়ে জায়গা করে নিয়েছে পাতায় পাতায় । আর তারসঙ্গে চমকপ্রদ ভাবে সাজিয়ে তোলা হলো ডিজিটাল পত্রিকার পাতাগুলো । কত নতুন কিছু শিখলাম তা শুনে হিসেব করা যাবে না । কোনো ফুটবল পাগল শিশু কে যেন টিভি এর সামনে থেকে উঠিয়ে ; নিয়ে এনে ফেলা হয়েছে ন্যূন ক্যাম্প বা লা মাসিহা একাডেমিতে । প্রতিটা দাদা দিদি ; সহপাঠী যেনো হাতে আঙুল দিয়ে শিখিয়ে দিচ্ছে পত্রিকার অ আ ক খ। মুগ্ধ হয়ে শিখেছি আর চেষ্টা করেছি যতটা কাজ করা সম্ভব ।BMC এর এই প্রথম পত্রিকা তে কোনো অবদান রেখে যেতে পারলে এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি ; বড় স্বপ্নপূরণ আর কিছু হয়না । হবেও না ।

ডাক্তার বনাম "কবি"রাজ: গোড়ার কথা

ছোটবেলা থেকে আনন্দমেলা পড়ছি, বড় হয়ে দেশও ধরলাম (সন্ধিক্ষণে অবশ্য দুই-ই চলত, কিন্তু দেশটা লুকিয়ে, সেসব তথ্য গোপন থাকুক)। মোদা কথা, পত্রিকাক্রিষ্ট যৌবনের সাহিত্যপ্রেমে সংযুক্ত হল ডাক্তারি (এই জীবিকাতেও অনেকেই পত্রিকাপ্রেমী আছেন, ওটাকে আবার জার্নাল বলা হয়)... সারি সারি রস-কব্বহীন অক্ষর, তার বাইরের জীবনটা সংকোচন হতে হতে বিন্দুতে পরিণত হয়েছে... খোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি খোড়... কিন্তু শাস্ত্রে বাসুদেব আবার "depressed" অর্জুনকে বলেছেন বিন্দুই ব্রহ্ম, আবার বিশ্বই ব্রহ্ম, সুতরাং আপাতদৃষ্টির বিন্দু যেটা, সেটাই বিশ্ব... সুতরাং ডাক্তারি ছাত্র হিসেবে ডানা মেলে উড়ে বেড়ানোর চেষ্টা এই বিন্দুতে...

মাথায় সেই আগন্তুক সিনেমার মনোমোহন মিত্র (উৎপল দত্ত)-র বলা... "আমি দাদু নই, আমি হলাম ছোটদাদু, অর্থাৎ ছুটে বেড়াই... শুধু ছুটে বেড়াই.. কুপমণ্ডুক হয়ো না, শুধু ছুটে যাও..". এই ঘানি টানা জীবনে কোথায় ছুটি??? ঘানির হাতল ধরে ছোটটাই কি সব?

মোটামুটি বন্ধু-বান্ধব, দাদা-দিদি, ভাই-বোন, স্যার-ম্যাম যাদের পেয়েছি, তারা প্রত্যেকেই কিছু না কিছুতে ভালো... কোনো techপ্রেমী "খুড়োর কল" বানাচ্ছে, গানের তালিম নেওয়া ভীষ্মলোচন শর্মা এবং দিনে-রাতে দুবেলা জিম যাওয়া হাতি লোফা ষষ্ঠীচরণ। —কোনোটাই বাদ যায় না... সুতরাং সেই পথ ধরে লেখকবন্ধুও বিস্তর পেয়েছি...

পত্রিকা বার করা নিয়ে খচখচানি ছিলই... এরম "critical" সময়ে আমার মতো কাকেশ্বর কুচকুচের একখানি "গেছোদাদা" মুখ্য সম্পাদক দরকার ছিল... তবে ব্যাপার কিনা, পত্রিকা মানেই প্রেম-প্রণয় সংবাদ পড়তে পড়তে অরুচি হয়েছে, এবং বিরহের কবিদের দেখেছি পাঠকদের কান্নায় ভাসিয়ে তারাই রেস্টোরাঁগুলিতে প্রেমিকা নিয়ে টুঁ মারছেন... সুতরাং "বাস্তব"বাদী কবিদের একটু বুদ্ধিজীবী ধাক্কা দেওয়ার উপায়টা "গেছোদাদা"ই বাতলে দিলেন...

"Digital সুকুমার রায়".... অনেকদিন আগে একখানা গল্প পড়েছিলাম শিবরাম চক্রবর্তীর, গল্পের নাম "শিবরামের মতো কথা বলার বিপদ"... তো সেই গল্পে লেখকের সামনে বসা এক ছোকরা; লেখককে না চিনেই নিজের দুঃখের কাহিনি বলতে থাকে যে, সে শিবরামের এত বড় ভক্ত যে তাঁর মতো কথা বলার জন্য (যেমন বেদনার সাথে বেদনা খাওয়া, বা টর্চ হাতে টর্চার) গ্রামের লোকেরা তাকে পাগল ভাবে, এবং সেই থেকে তার লেখকের উপর রাগ... তো লেখক আর দুঃখে তাকে বলেন না যে তিনিই সেই শিবরাম... তো যাই হোক, আমরা কিন্তু একটুআধটু সুকুমার হতেই পারি, তাঁর মতো কথা বলার চেষ্টা করতেই পারি, বা সমাজের ছোট ছোট ভুলগুলিকে একটু বাঁকা চোখে দেখতেই পারি...

ভয়েই ছিলাম, সমাজের সমালোচনাতে হয়তো কোনো পাঠক; লেখকদের ও সম্পাদকদের বলে বসবে, "কোনোদিন ফাঁসি যাবে নয় যাবে জেলে"... কিন্তু অনেকের সঙ্গে কথা বললাম এবং ওঁরা অভয় দিলেন, "ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না, তোমায় আমি মারব না..."। অতএব এই "অভয়া" সংখ্যা প্রকাশ পেল সবার থেকে অভয় পেয়ে...

আরেক সমস্যা হলো নাম নিয়ে। কবি বলেছেন, নামে কী যায় আসে, কিন্তু ওনার লেখা Comedy of Errors-কে বিদ্যাসাগর মশাই 'ভ্রান্তি বিলাস' নাম না দিলে কেমন লাগত, আর সেটা তে উত্তম-ভানু বাবু কে ওই সিনেমা এত ভাল লাগত কিনা সেটা ভেবে দেখবেন পাঠকেরা... কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটা রাজশেখর বসুর "নামতত্ত্ব" বলে মজার প্রবন্ধ আছে যে...

"..... উপন্যাসের নায়ক তরুণকুমার হইতে পারেন, কারণ কাহিনী শেষ হইলে তাঁহার বয়স আর বাড়িবে না। কিন্তু জীবন্ত তরুণকুমারের বয়স বাড়িয়া গেলে নামটা আর খাপ খায় না। বালকের নাম চঞ্চলকুমার হইলে বেমানান হয় না, কিন্তু উক্ত নামধারী যদি চল্লিশ পার হইয়া মোটা থপথপে হইয়া পড়েন তবে চিন্তার কথা। জ্যোৎস্নাকুমার কবি বা গায়ক হইলে মানায়, কিন্তু চামড়ার দালালি বা পুলিশ কোর্টে ওকালতি তাহার সাজে না। ..."

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে নামটা একটু বুঝে-শুনে দেওয়া দরকার ছিল। 'MED দর্পণ' এবং 'নিলয়'—দুই নামই সকলের পছন্দ হলো। ...আর অঙ্কনের দলকে কী বলে বাহবা দেব বুঝে পাই না। ভ্যান গঘের starry night এর আকাশে তোমরাই নক্ষত্র। সবাই লেখা দিলো বলে হিজ বিজ বিজ কে পয়সা দিতে হল না তার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আর তোমরা ডাক্তারি ভুলে "কবি"রাজি করো এই পত্রিকার হাত ধরে...

বসন্ত রায়
সহকারী সম্পাদক

“

মানুষের যতরকম রোগ হয়, আজকালকার ডাক্তারেরা বলেন, তার সব গুলিই অতি ক্ষুদ্র জীবাণুর কীর্তি। এই জীবাণু বা 'মাইক্রোব' (Microbe) গুলিই সকল রোগের বীজ। পথেঘাটে বাতাসে মানুষের শরীরের ভিতরের বাহিরে ইহারা ঘুরিয়া বেড়ায়। আজকালকার চিকিৎসাশাস্ত্রে ইহাদের খাতির খুব বেশি। এই জীবাণুগুলির ভালরূপ পরিচয় লওয়া, ইহাদের চালচলনের সংবাদ রাখা এবং এগুলিকে জব্দ করিবার নানাপ্রকার ব্যবস্থা করা, এখনকার ডাক্তারবিদ্যার খুব একটা বড় ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার ফলে চিকিৎসাপ্রণালী আশ্চর্যরকম উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই সমস্ত উন্নতি এবং এই নূতন প্রণালীর মূলে ফরাসি পণ্ডিত লুই পাস্তুর। পাস্তুর একা এ বিষয়ে নূতন আবিষ্কার ও নূতন চিন্তার দ্বারা মানুষের জ্ঞান ও চেষ্টাকে যে কতদূর অগ্রসর করিয়াছেন, ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়।

-সুকুমার রায় ('পাস্তুর' নামক প্রবন্ধ)

”

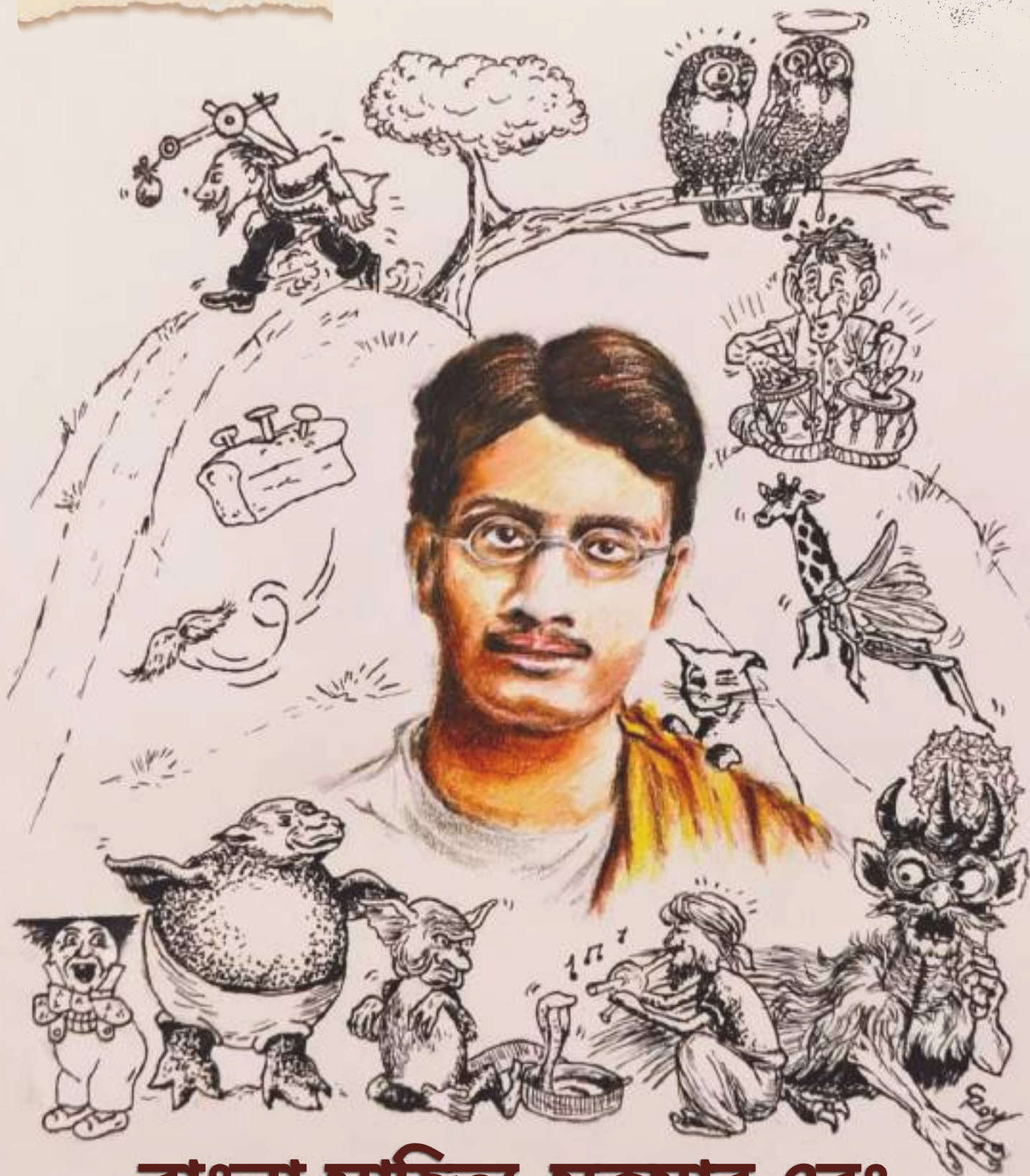
পত্রিকার এই সংখ্যায়

প্রবন্ধ

সুকুমার সরণি বেয়ে

হাতুড়ে বিদ্যে আর খুড়োর কল- এ সওয়ার হয়ে
হলোর গান গাইতে গাইতে শুরু হল 'নিলয় ' এর
সুকুমার পথ চলা। এই সংখ্যা তাঁর স্মরণে যিনি
একুশে আইনকে ছায়াবাজি দেখিয়ে হ য ব র ল
ঠিকানায় আজীবন ভাল ছেলের নালিশ লিপিবদ্ধ
করে গেছেন আর সেই নোটবুক তুলে দিয়েছেন
আমাদের হাতে। তাঁর লেখা কি কেবলই শিশু
সাহিত্য ? কেমন ছিল কবিগুরুর সুকুমারী সম্পর্ক
? সুকুমারের শেষ দিনগুলিই বা কেমন ছিল?
জানা-অজানা সুকুমার রায় কে নিয়ে কলমে
মেহেলি প্রামাণিক, ডা: মৃণাল পাল, দেবায়ন
রায় , কৃষ্ণ কুমার পাল।

প্রচ্ছদকাহিনি



বাংলা সাহিত্য, সুকুমার এবং অন্য সুকুমার

মেহেলি প্রামানিক

বর্ষ : ২৩-২৪

"এ পৃথিবী একবার পায় তারে, পায় নাকো আর"—

কবি জীবনানন্দ দাশের এই চিরন্তন এবং আবেগময় উচ্চারণ আমাকে বারবার মনে করিয়ে দেয় সুকুমার রায় এর কথা। সুকুমার রায় আমার কাছে পৃথিবীতে অল্পদিনের জন্য আসা এক অতিথি 'ভিনগ্রহী' যিনি বাঙালিকে একাই অনেকটা পথ দেখিয়ে গেছেন। যিনি সেই এলিয়েন যে নিজের ক্ষমতা দান করে অন্যের বোধের পরিধি অনেকটা বাড়িয়ে দিয়ে গেছেন।

একটা সহজ কথা কেউ 'ডোন্ট পরোয়া' করতে পারবেন না যে— ছোটদের সব সাহিত্যই বড়োদের, বড়োদের সব কিন্তু ছোটদের জন্য নয়। আর অভ্যাস এমন—ই যে ছোটদের জন্য লেখাকে আমরা সাহিত্যের মূল স্রোতের অন্তর্ভুক্ত করতে চাই না। এগুলি যে গভীর বিশ্লেষণ এবং চিন্তাপূর্ণ ব্যাখ্যানের বিষয় হতে পারে, অনেকেই সে কথা মনে করি না। ওদের ক্ষমা—ঘেন্না করে পিঠ চাপড়ে দেওয়া যায়, পণ্ডিত ভোজনে ডাকা চলে না। সুকুমার রায় শিশু রাজত্বের সেই সম্রাট যাঁর জন্য শিশু-সাহিত্য বড়োদের সাহিত্য কে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বলতে পেরেছে— "অল্ রাইট কামেন ফাইট্!" তাঁর লেখা পড়ে শিশু কিশোররা সমানভাবে মজা পাবে, পেয়ে এসেছে। একথা বলতেও দ্বিধা নেই—বাংলা সাহিত্যকে 'slapstick comedy' র সঙ্গে পরিচয়—ও করিয়েছিলেন সুকুমার রায়। তাই অনেকেই তাঁর ছড়া বা কবিতাকে 'ননসেন্স হিউমার' বা উদ্ভট সাহিত্যের তকমা লাগিয়েছেন। কিন্তু সত্যিই কি তাই ? স্রেফ 'শিশুসাহিত্যিক'ই যদি তাঁকে কেউ বলেন, তাহলে জেনে নিন পুরো বাংলা সাহিত্যের 'গাত্রে হবে ব্যথা'।

সুকুমার রায়—ই প্রথম বাঙালি যিনি শিশু মনকে ধরতে পেরেছিলেন। ছুঁতে পেরেছিলেন। কেননা, তিনি শিশু কিশোরকে নেহাৎ বাচ্চা ভাবেননি। তিনি জানতেন শিশুর জগতে নিয়মভাঙা কল্পনা আছে। যুক্তিহীনতা আছে। পাশাপাশি যুক্তি আর নিঃশর্ত তार्কিক মনও আছে। আর এই নরম জমিতে ব্যক্তি সর্বস্বতাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে সামাজিক মূল্যবোধের বীজ বোনার সব চাইতে ভাল সময়। তাঁর অতি স্বল্প জীবনে এত বিপুল কাজ কি আর কেউ করতে পেরেছেন ?

প্রথমেই আসি তাঁর Main stream কাব্যগ্রন্থ 'আবোল তাবোল' এর কথায়। সত্যিই কি 'সংপাত্র', 'বাবুরাম সাপুড়ে', 'রামগরুড়ের ছানা' বা 'গোঁফ-চুরি'রা খেয়াল রসের ছড়া- অর্থহীন 'ননসেন্স হিউমার' ? দেশ, সমসাময়িক রাজনীতি আর সমাজের বিরুদ্ধে তীব্রতম ব্যঙ্গ কি লুকিয়ে নেই ?

'বাবুরাম সাপুড়ে' আসলে সদ্য প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রপ। অনেকটা বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের মতো 'জয় রাধেকৃষ্ণ ভিক্ষা দাও গো, ইহাই আমাদের পলিটিক্স।'

'হাতুড়ে' আসলে ব্রিটিশ আইসিএস অফিসারদের ব্যঙ্গ করে লেখা, 'ভুতুড়ে' কবিতা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে বিদ্রপ, 'একুশে আইন' ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন আইনকে ব্যঙ্গ করে লেখা। 'কাঠবুড়ো' আসলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয় সৈন্য সংগ্রহ করার হিড়িক এবং 'লড়াই স্ক্যাপা' মহাযুদ্ধের সময় ভারতীয়দের উন্মাদনাকে ব্যঙ্গ করে লেখা।

অতএব বুঝতেই পেরেছেন তিনি একজন পাক্কা বিপ্লবী ! সিস্টেম কে ব্যঙ্গ করেছেন তিনি ! আক্রমণ করেছেন ! ছোটরা হেসে 'লুটোপুটি' খেয়েছে তা ঠিক কিন্তু বড়োরা জ্বলে গেছি অস্বস্তিতে। 'কুমড়োপটাশ' এর কথাই ধরা যাক, ছোটবেলায় হেসে উড়িয়েছি, কিন্তু একটু বড়ো হতেই শুল্ককায় কাউকে 'কুমড়োপটাশ' বললে সে বলবে 'Body Shaming'. ঠিক কিনা ? অতএব, সুকুমার রায়ের সার্থকতা এখানেই যে তাঁর লেখার স্বাদ সব বয়সী পাঠকের জন্য, এক একটা বয়সে এক একরকম ভাবে ধরা দেয় !

বাংলা সাহিত্যে প্রথম 'Portmanteau' বা 'খিচুড়ি' শব্দ ব্যবহারের কৃতিত্ব-ও সুকুমার রায়ের। 'হাঁসজারু', 'হাতিমি' এসব 'কিম্বদন্ত' প্রাণীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় 'আবোল তাবোল' এই। সেই কারণেই সত্যজিত বলেছিলেন 'লুই ক্যারল' না থাকলে হয়তো সুকুমার হতেন না। সুকুমারের 'নিধিরাম পাটকেল' না থাকলে তেমনি 'প্রফেসর শঙ্কু' ও আসতেন কিনা সন্দেহ !

এরপর আমাদের 'ঠিকানা' তাঁর 'হযবরল'।

হযবরল যেন কল্পনার পথে সেই আলো যার আয়নায় 'রিফ্লেক্ট' হয় শত প্রশ্ন, যুক্তি। সেই কারণে সত্যজিৎ রায় নিজে জিনিয়াস হয়েও বাবাকে নস্যাৎ করতে পারেননি ! সাথে কি আর 'হযবরল'র ন্যাড়া (খাজা 'ক্রিয়েটিভ' রাইটার) আর হিজিবিজবিজকে পোরেন সিনেমা জটায়ুর মধ্যে ? তাঁর বাবাকে ভেঙে যে কতদিকে কানেক্ট করা সম্ভব, ছেলে সেটা ঠিকই বুঝেছিলেন।

'আবোল তাবোল', 'হযবরল' আলোচনা করতে গিয়ে যার কথা না বললে বাংলা সাহিত্যের 'মুখখানা ফ্যাকাশে' হবে তা হল- 'সন্দেশ' পত্রিকা। সুকুমার রায়ের পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর শ্রেষ্ঠ কীর্তি নিঃসন্দেহে 'সন্দেশ'। শিশু কিশোর সাহিত্য কে এই পত্রিকা আন্দোলনের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। সুকুমারের সাহিত্যচর্চার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফসলগুলি লেখা-রেখায় 'সন্দেশ' পত্রিকাকে ভরে তুলেছিল। সত্যজিৎ রায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন- 'বাবার সন্দেশের চেহারাটা ঠাকুদার সন্দেশের থেকে অনেক আলাদা হয়ে গেল। শিশুদের পত্রিকা থেকে হঠাৎ কিশোরদের পত্রিকা হয়ে উঠল'।

'আবোল তাবোল' ফেলে দিন, 'হযবরল' লোপাট করে দিন ! এভাবে সব ফেলতে ফেলতে যান- পা হড়কে পড়বেন 'অবাক জলপান' এ ! ভাবুন তো এরম একটা জিনিস আর কখনো পেয়েছেন বা পাবেন ? মানুষ একদিন অন্যগ্রহে যাবে, দেখবেন এই বইটাই বাঙালি বগলদাবা করে নিয়ে যাচ্ছে !

প্রেসিডেন্সি কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের এই ছাত্রের বৈজ্ঞানিক সাহিত্যেও অবদান কম নয়! তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলো পড়ে আনন্দে চোখের জল ফেলবেন ! এভাবেও ভালোবেসে, শেখাতে শেখাতে, নিজে শিখতে শিখতে নোট নিতে নিতেও অন্যকে জানানো যায় ? তার বিরলতম দৃষ্টান্ত হল 'হৈশোরাম হুঁশিয়ারির ডায়েরি'।

তাঁর মৃত্যুর পর একে একে প্রকাশিত 'পাগলা দাশু', 'বহুরূপী', 'খাই খাই' বাংলা শিশু-সাহিত্যের অমর সৃষ্টি হিসেবে বাঙালির হৃদয়ে বেঁচে থাকবে।

আর কী আছে সুকুমারে?

তপন সিংহের 'বাঞ্ছারামের বাগান' চলচ্চিত্রে

বাঞ্ছারামের একটা বিখ্যাত মিষ্টি আছে- প্রথম কামড় যখন দেবেন একরকম লাগবে, দ্বিতীয় কামড়ে আরেকরকম, তৃতীয় কামড়ে...

সুকুমার রায় ঠিক সেরকম ই একজন ! তাঁর জগৎটা আলাদাই ! একটা ধোঁয়াটে জগতে আমাদের খেলিয়ে মেরেছেন তিনি ! সেই জগতের অন্যতম আকর্ষণ তাঁর লেখা অসাধারণ কিছু নাটক- 'লক্ষণের শক্তিশেল', 'ঝালাপালা', 'চলচ্চিত্র চঞ্চরী'।

'লক্ষণের শক্তিশেল' রামায়ণের গল্পকে ব্যঙ্গ করে লেখা একটি হাস্যরসাত্মক নাটক। কিন্তু তাঁর লেখনী কৌশল এতটাই স্বকীয় ও সাবলীল ছিল যে তখনকার ভারতীয় প্রেক্ষাপটেও তাঁকে 'একুশে আইন'-এর মুখোমুখি পড়তে হয়নি।

কারণ আমরা জানি 'দেবী' কে সফল করতে গিয়ে তাঁর ছেলেকে নানান সমালোচনা, বিদ্রূপের মুখে পড়তে হয়েছে। 'Religious Dogmatism' এর বিপক্ষে সত্যজিতকে লড়তে হয়েছে।

এতক্ষণ যা আলোচনা করলাম সেসব নিয়ে অনেক পন্ডিত, অনুসন্ধিৎসু অনেক ইন্টারেস্টিং সব গবেষণা করে গেছেন ! এগুলো বাদ-ই রাখছি, এর বাইরেও আরেক সুকুমার আছেন ! কিন্তু এই সুকুমার পপুলারস্ চয়েস অ্যাওয়ার্ড পাননি। তিনি এক নৃশংস সুকুমার ! 'বাজে গল্প' সিরিজ পড়েছেন ? পড়তে পড়তে বুঝবেন সুকুমার চোখে আঙুল দিয়ে চোখ খুঁচিয়ে গর্ত করে সেই গর্ত দিয়ে হার্ট পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন !

“
সুকুমার রায়ের
সার্থকতা এখানেই
যে তাঁর লেখার স্বাদ
সববয়সী পাঠকের
জন্য...
”

কোথাও এই সিরিজ নিয়ে আলোচনা দেখি না... একটা গল্প তুলে দিচ্ছি... অতি ছোট ! পড়া থাকলেও আরেকবার পড়ুন, তারপর বলুন আমি ভুল বলেছি কিনা ! 'বাজে গল্প ১', 'বাজে গল্প ২'-ও রয়েছে। 'বাজে গল্প ৩' তুলে দিলাম...

বাজে গল্প ৩

কতগুলো ছেলে ছাত্তর উপর হুড়োহুড়ি করে খেলা করছে— এমন সময়ে একটা মারামারির শব্দ শোনা গেল। তারপরেই হঠাৎ গোলমাল থেমে গিয়ে সবাই মিলে "হারু গড়ে গেছে" বলে কাঁদতে কাঁদতে নীচে চলল।

খাবিক বাবুই শুনি একতলা থেকে কারাকারি শব্দ উঠেছে। বাইরের ঘরে বসে বাবা গণেশবাবু ছিলেন—তিনি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে?" শুনতে পেলে ছেলেরা কাঁদছে "হারু গড়ে গিয়েছে।" বাবু তখন দৌড়ে গেলেন ডাক্তার ডাকতে।

পাঁচ মিনিটে ডাক্তার এসে হাজির—কিন্তু হারু কোথায়? বাবু বললেন, "এদিকে ত পড়েনি, তেতর বাড়িতে পড়েছে বোধহয়।" কিন্তু তেতর বাড়িতে মেয়েরা বললেন, "এখানে ত পড়েনি—আমরা ত জানছি হারু-বাড়িতে পড়েছে যুগ্ম।" বাইরেও নেই, ভেতরেও নেই, তবে কি ছেলে উড়ে গেল? তখন ছেলেরা জিজ্ঞাসা করা হ'ল "কোথায় রে? কোথায় হারু?" তারা বললে, "ছাত্তর উপর।" সেখানে গিয়ে তারা দেখে হারুবাবু অতিমান করে বসে বসে কাঁদছেন! হারু কড় আদুরে ছেলে, মারামারিতে সে পড়ে গেছে দেখেই আর সকলে মার খাবার ভয়ে সেখানে থেকে চম্পট দিয়েছে। "হারু গড়ে গেছে" বলে এত যে কাঁরা, তার অর্থ, সকলকে জানার হৃদে যে, "হারুকে আমরা ফেলে দেইনি—সে পড়ে গেছে বলে আমাদের ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে।" হারু তখন সকলের নামে বাবার কাছে নালিশ করবার জন্য মলে মলে অভিমান জমিয়ে তুলছিল—হঠাৎ তার বাবাকে লোকজন আর ডাক্তার শুধু এগিয়ে আসতে দেখে, ভয়ে আর নালিশ করাই হ'ল না। যা হোক, হারুকে আন্ত দেখে সবাই এমন খুশি হল যে, শাদম-টামনের কথা কারও মনেই এল না।

সবচেয়ে বেশি জোরে কাঁদছিলেন হারুর ঠাকুরমা। তিনি আবার কানে শোনে কিছু কম। তাঁকে সবাই জিজ্ঞাসা করল, "আপনি এত কাঁদছিলেন কেন?" তিনি বললেন, "আমি কি অত জানি? দেখলুম কিহারা কাঁদছে, বোমা কাঁদছেন, তাই আমিও কাঁদতে লাগলুম—ভাবলুম একটা কিছু হয়ে থাকবে।"

গায়ক নচিকেতা চক্রবর্তী একটা গল্প বলেছিলেন 'তাসা ফাসা নিয়ে ভোটে জেতার মিছিল বেরিয়েছে— একজন উদম নাচছে— সবাই বলল নাচছিস কেন? সে বলল আরে...নাচব না, লাল্টুদা জিতে গেছে ! - 'তাতে তোর কী?' 'তোর কী মানে... পল্টুদা হেরে গেছে !' তাতেই বা তোর কী !' লোকটা তখন বলল এই অভ্যেসে নাচি মাইরি !'

একবার ভাবুন তো না বুঝে হুল্লাটে যারা তাল মেলায়, অন্যের জগজম্প দেখে তবেই জগজম্প করে... কত বছর আগেই তাঁদের ঠুকেছিলেন সুকুমার !

কী 'ডোন্ট কেয়ার' অ্যাটিচিউড নিয়ে লেখা এই সিরিজ! ছোটবেলায় ছোট বোনদের নিয়ে একবার চলতে চলতে দেখেছিলেন এক ষণ্ডামার্কী লোককে -

দু'হাতে তাঁর রক্তমাখা ! বোনদেরকে আড়াল করে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সেই ছোট দাদা (পরে জানা যায় লোকটা পাশের পুকুরে সবে পাঁঠা কেটে ফিরছিল)। সেই ডেয়ারডেভিল দাদার লেখা এই সিরিজ !

আর 'বাজে গল্প ৩' বোকা তোষামোদ, নিজেদের ভেতরকার সত্তাকে বিকানোর বিরুদ্ধে এক অসামান্য চাকু ! একবার ভাবুন তো এগুলো ভেঙে শর্টফিল্ম বানাতে কতটা ইন্টারন্যাশনাল লেভেল এর হবে !

গোয়েন্দা গল্প তেমন নেই সুকুমারের। হয়তো একটু তাচ্ছিল্যের চোখেই দেখেছিলেন। অথচ তাঁর ছেলে জোয়ার আনলেন !

কবির সুমন যথার্থ-ই বলেছিলেন- 'আমাকে ভাবায় সুকুমার রায়'। এতক্ষণে নিশ্চয় আপনাদেরও উনি ভাবতে শুরু করেছেন ?

বেশ ! আমি আপনাদের ভাবনা কে আরও দীর্ঘায়িত করছি...

তঁার স্কুলের গল্পগুলোর সঙ্গে অনেকেই নিজেদের স্কুলজীবনকে রিলেট করতে পারবেন। কীভাবে তিনি ক্লাসমেট আর টিচারদের সাইকোলজি এতো অসাধারণভাবে দেখালেন !

'নতুন পন্ডিত' পড়লে বুঝবেন আপনিও হয়তো ক্লাসের সেই 'হরিপ্রসন্ন' ছিলেন, কিছু গোলমাল হলেই যাকে এক মাস্টারমশাই 'তবে রে হরিপ্রসন্ন' বলে ছুটে গিয়ে মারতেন ! হরিপ্রসন্ন কিছু করুক আর না করুক, কিছু হলেই টার্গেট হত সে ! আপনিও এরকম ফ্রাস্ট্রেশন আর কমপ্লেক্স এ ভরা টিচারদের নিশ্চয়ই পেয়েছেন যারা নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ ক'জনকেই শুধু বারেবারে চাঁদমারি বানান !

এছাড়াও 'চালিয়াং', 'আজব সাজা' এসব এক একটা মাস্টারপিস। 'দাশুর খ্যাপামি' গল্পের 'আবার সে এসেছে ফিরিয়া' এসব লাইন কি এমনি এমনি অমরত্ব পেয়ে প্রবাদ হয়ে গেছে ? 'হিংসুটি' গল্প আবার ভাইবোনদের রেষারেষি-হিংসা হিংসিকে তুলে ধরেছে।

এরকম ছোটবেলার সব দুর্দান্ত সাইকোলজিক্যাল গল্প লিখতে পেরেছিলেন তঁার যোগ্য বোন লীলা মজুমদার। সুকুমার রায় ছিলেন লীলা-র জীবনে ঈশ্বরের মতো। লীলা মজুমদারের লেখা 'সুকুমার রায়' গ্রন্থটিই তার প্রমাণ।

শুধুই কি সাহিত্য? তা কিন্তু নয়, তঁার ব্যক্তিত্বের অন্যতম 'ম্যাগনেট' ছিল মুদ্রণ শিল্পে তঁার দক্ষতা। তঁার সময়ে ফটো-টেকনলজি ও প্রসেস শিল্পে তিনি ছিলেন প্রতিদ্বন্দ্বীহীন সম্রাট, একমাত্র উপেন্দ্রকিশোরের সঙ্গেই যঁার তুলনা করা যায়। সুকুমার-ই দ্বিতীয় ভারতীয় যিনি ফটো-টেকনিক শাখায় ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ উপাধি F.R.P.S অর্জন করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে ১৩২৩ বৈশাখ সংখ্যার 'সন্দেশ'-এ

'ছাপাখানার কল' রচনাটি লিখেছিলেন।

ইলাস্ট্রেশন এও আরেক জগৎ যেখানে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এটি একটি জটিল বিষয়। কারণ এর কোনো নির্দিষ্ট ব্যাকরণ নেই। আবার একেবারেই নেই যে তাও নয়। আসলে সার্থক ইলাস্ট্রেশনে যা চাওয়া হয় তা ঘটনার আর-এক প্রতিচ্ছবি নয়, ঘটনার পুনর্বিবৃতি নয়, এসবকে উৎরিয়ে এমন এক স্তরে তাকে পৌঁছিয়ে দেওয়া যেখানে তা হয়ে উঠবে লিখিত দৃশ্যের পরিপূরকই নয় শুধু, তার অন্তর্নিহিত সত্য ও তথ্যের যুগ্মতার এক ভিন্ন দৃশ্যরূপ। উদাহরণস্বরূপ নেওয়া যেতে পারে তঁার 'ডানপিটে' কবিতার ইলাস্ট্রেশন। অনেকেই বলেন তার 'ডানপিটে' কবিতা বিশ্বযুদ্ধ, ঠান্ডা লড়াই কে ব্যঙ্গ করে লেখা। কিন্তু কবিতাটার প্রসঙ্গে বিশ্ব রাজনীতি কেন আসছে? সাধারণ একটা মজার কবিতা বলেই তো কাটিয়ে দিলে হত। কিন্তু কেন? সমস্ত প্রশ্ন কিংবা সন্দেহের ভরকেন্দ্রে রয়েছে কবিতার একটি লাইন- 'খুন হ'ত টম চাচা ওই রুটি খেলে!' এতে সুকুমারীয় জ্যাকেট-ও অনুপস্থিত। একদম বাঙালি উপমা ব্যবহারও করেননি। তাহলে এবার কবিতার মূল ইলাস্ট্রেশনের দিকে চোখ রাখা যাক। একজন পাদরীর মতো লম্বা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধকে উৎপাত করছে দুই ডানপিটে। খুব ভালো করে যদি ছবিতে নজর রাখা যায়, দেখা যাবে অঙ্কনশৈলী কিংবা মানুষগুলোর কাঠামোয় ছিটেফোঁটা বাঙালিয়ানা নেই। হয়তো বিশ্ব রাজনীতি নিয়েও এতটাই ওয়াকিবহাল ছিলেন তিনি।

সুকুমার বলেছেন— 'ছবির টানে গল্প লিখি'। এগুলোর মধ্যে কোনটা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল বলা মুশকিল। অনেকেই আবার সুকুমার রায়ের আঁকার সাথে জার্মান কার্টুনিস্ট রুডলফ ডার্কের প্যাটার্নের মিল খুঁজে পান।

আমার তো মনে হয় ওয়াল্ট ডিজনির মতো সুকুমার রায় যদি অ্যানিমেশনের জগতে ঢুকতে পারতেন, তাহলে এ ব্যাপারে ডিজনির সঙ্গে অনায়াসে পাঞ্জা কষতে পারতেন তিনি।

অনেকেই হয়তো সংগীত অনুরাগী সুকুমারের সঙ্গে পরিচিত নন। শুনলে অবাক হবেন- 'লক্ষণের শক্তিশেল' নাটকে তিনি অসাধারণ কয়েকটি গান লিখেছিলেন। এবং এখানে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতেই হয়- সুকুমার রায়ের পরম স্নেহভাজন বন্ধু ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯১১ সালে সুকুমার শান্তিনিকেতন গিয়েছিলেন এবং এই নাটক থেকে 'ঐ আসে ঐ আসে' এই গানটি পরিবেশন করে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের চর্চাও ছিল তাদের পরিবারে। বলা বাহুল্য সাহিত্য আঁকাআঁকি সঙ্গীতের যে আবহ উপেন্দ্রকিশোর গড়ে তুলছিলেন বালক বয়স থেকেই তা সুকুমার কে আচ্ছন্ন করেছিল।

এইসব ক্ষেত্রে পিতামহ ও বাবার জিন আর ব্যাটন সার্থকভাবে বহন করতে পেরেছিলেন সত্যজিৎ রায়। কে ভেবেছিল সুকুমারের 'পাগলা দাশু', 'বহুরূপী', 'ঝালাপালা' এই বইগুলির ইলাস্ট্রেশনের দায়িত্ব পড়বে তাঁর ছেলের ওপর? বিজ্ঞাপনের ডিজাইন থেকে শুরু করে প্রচ্ছদ ও ক্যালিগ্রাফীর অসংখ্য উজ্জ্বল নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে সত্যজিতের প্রত্যেকটি চলচ্চিত্রের লোগোয়। কে বলতে পারে 'ফেলুদা'র থিম সং তৈরি করতে গিয়ে সত্যজিতের বাবার কথা মনে পড়েনি?

কিন্তু সুকুমারীয় ভাবনা কি সত্যজিতেই থেমে গেছে, আজও বাঙালিকে ভাবায় না? আমরা যারা বাংলা ব্যান্ডের গান ভালোবাসি তাদের কাছে অত্যন্ত সুপরিচিত একটি ব্যান্ড 'চন্দ্রবিন্দু'। আচ্ছা, আপনাদের একবারও কি মনে হচ্ছে না ব্যান্ডের

নাম হয়তো 'হযবরল'র 'চন্দ্রবিন্দু' থেকেই অনুপ্রাণিত? এই ব্যান্ডের বিভিন্ন গানে যেমন 'তা না না' গানে 'ট্যাশ' শব্দের ব্যবহার কিংবা 'জুজু' এগুলো সবই তো আমরা 'আবোল তাবোল' এ পাই! আবার 'চন্দ্রবিন্দু'র বহু গানের যে rhythm, satire আমার তো মনে হয় সুকুমার রায়ের ছড়া থেকেই প্রভাবিত!

শুধু তাই নয়, বিখ্যাত পরিচালক অনীক দত্ত যিনি সদ্য প্রয়াত হয়েছেন তাঁর 'ভূতের ভবিষ্যৎ', 'আশ্চর্য প্রদীপ'— এই চলচ্চিত্রগুলিতে সত্যজিতের ছোঁয়া তো রয়েছেই, সুকুমারীয় ছোঁয়াও কিন্তু স্পষ্ট!

তাই বলা যেতেই পারে এই হালফিলের দুনিয়ায় সুকুমারীয় দর্শন আজও বাঙালির হৃদয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে 'চন্দ্রবিন্দু'র মতো ব্যান্ড, অনীক দত্তের মতো পরিচালকরা।

আসলে absurdity (অযৌক্তিকতা), incongruity (অসংগতি) আর laughter (হাস্যরস) এই তিনটির অন্তর্চ্ছেদনে বাস্তবতাকে তুলে ধরার যে ভিত্তিপ্রস্তর সুকুমার রায় স্থাপন করে দিয়ে গেছেন, তার ওপর ভর করেই বাঙালিকে সত্যের ধ্রুববিন্দুতে পৌঁছাবার হৃদিশ খুঁজতে হবে...

এই নিরন্তর কর্মময় জীবনে মৃত্যু যে ধীরে ধীরে যবনিকা টেনে দেবে, সে সময় তা কেউ প্রবল প্রাণশক্তিপরায়ণ এই যুবককে দেখে ভাবতে পারেননি। ১৯২১ সালে তিনি আক্রান্ত হন কালাজ্বরে; ডাক্তারির ভাষায়- 'ভিসেরাল লিসমানিয়াসিস্'। অসুস্থ অবস্থার মধ্যেও সাহিত্যচর্চা, ছবি আঁকা- ইত্যাদির কাজকর্ম ছিল অব্যাহত। 'একুশে আইন', 'বোম্বাগড়ের রাজা', 'বিষম কান্ড', 'পালোয়ান' ইত্যাদি বিখ্যাত কবিতা তাঁর মৃত্যুর ঠিক আগের বছরে 'সন্দেশ' এ প্রকাশিত হয়। 'আবোল তাবোল' প্রথম প্রকাশের তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৩ অর্থাৎ তার মৃত্যুর ঠিক নয় দিন পর। ছাপা বই না দেখে গেলেও তার তিনরঙা মলাট, তার অঙ্গসজ্জা, টেলপিসের ছবি ইত্যাদি সবই তিনি করে গিয়েছিলেন শয্যাশায়ী অবস্থায়।

“
**সুকুমারীয় দর্শন
আজও বাঙালির
হৃদয়ে বাঁচিয়ে
রেখেছে 'চন্দ্রবিন্দু'র
মতো ব্যান্ড...**
”

আহা ! জীবনের প্রতি কি ভালোবাসা। তাই না ? মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনেও তাঁর গভীর মানসিক ধৈর্য, মনের দীপ্তি, শক্তি ও চরিত্রবল ; বিস্মিত ও মুগ্ধ করার মতো।

মাত্র ৩৬ বছর বয়সেই চলে গিয়েছেন ভদ্রলোক। একমাত্র 'আবোল তাবোল' কবিতাটিতেই আছে মৃত্যুর ছায়া- কিন্তু কৌতুকের ছোঁয়ায় মৃত্যুর অমোঘ নির্মমতা-বিচিত্র রঙিন বর্ণালীতে বিস্মিষ্ট হয়ে গেছে। লিখলেন- 'ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর/ গানের পালা সাঙ্গ মোরা।' মাত্র ৩৬ এই এরকম ম্যাচিয়োরিটি! মনে হয় 'হযবরল'র টেকোবুড়োর মতোই তিনি স্কেলের তো বটেই, স্রোতেরও উল্টোদিকে শিশুর মতো একটা বেপরোয়া মানসিকতা নিয়ে নিজের বয়স বহু বহু বাড়িয়ে রেখেছিলেন ! তাই আমরা ভাবি মাত্র ৩৬ এই তিনি ফুরিয়েছিলেন ! আদপে কিন্তু তা নয় ই !

তিনি পারতেন !

উজ্জ্বল হাস্যরসের এই দার্শনিক শিল্পী-ই পারতেন মৃত্যুকে নিয়ে এরম কৌতুক করতে !

হিমালীশ গোস্বামী ঠিক বলেছিলেন যে বাংলায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুকুমার রায় আর শিবরাম চক্রবর্তী এই তিনজন লেখকের কোনো বিকল্প আর কখনো তৈরি হবে না ! ভয়ংকর সত্যি কথা ! নির্মম ও !

সুকুমার রায় দুনিয়া চষেছেন একটি তিন-থাক কামরায় চেপে:

ছোটোদের অমলচোখ আয়ত্ত করে নিয়ে বড়োদের দুনিয়াদারি নিয়ে মাতব্বরির আর মজা করেছেন; ঔপনিবেশিক বাস্তবতার সঙ্গে আধুনিক বিশ্বজননী বিজ্ঞানের তির্যক সম্পর্কবিচার করেছেন; সামাজিক ও নৈতিক আশা-আশাভঙ্গ, সমালোচনা-আত্মসমালোচনা- সংশয়-বিদ্রোহকে খেয়ালরসের শিল্পিত ভিয়েনে ভেজে নিয়ে কখনো কড়া, কখনো নরম, কখনো দানাদার পাক দিয়েছেন।

কবির সুমন ঠিক বলেছিলেন- সুকুমার রায়ের মতো একজন জিনিয়াসের জন্য মন্দির বানানো উচিত।

সাহিত্যস্রষ্টা, চিত্রশিল্পী, পত্রিকা সম্পাদক ও কারিগরী বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ সুকুমার ছিলেন বহুমুখী, স্বতন্ত্র এবং অসামান্যতায় বিশিষ্ট। সুকুমার রায়ের ছেলে-ভুলানো ছদ্ম আবরণ, যার মোহ যুগ যুগ ধরে আশৈশব আবিষ্ট করে রেখেছে সিংহভাগকে, সেটি সরিয়ে ভেতরের প্রজ্জ্বলকে প্রবেশের সিঁড়ি গড়ে দেওয়াই হবে সাহিত্যপ্রেমী সচেতন বাঙালির কাজ। প্রতিটি বাঙালির মননে ও চিন্তায় সুকুমার রায় আরও সংক্রামিত হোক, আলোক শিখার মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠুক। কারণ সুকুমার রায় কোটি কোটি শতাব্দীতে (কোটি-র সংখ্যা কম পড়ছে বোধ হয়) একটাই জন্মায় রে, বাঙালি !

অঙ্কন: সুপ্রতিম রায়

সুকুমার রায়ের ননসেন্স সৃষ্টি আবোল তাবোল-এর আড়ালে ক্ষুরধার বুদ্ধি ও সমাজদর্শন

ডা: মৃণাল পাল

অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগ, বর্ধমান মেডিকেল কলেজ

দূরভাষ: ৯০০৭৫৯৩৫৪৫

"ঘ" নিয়ে এল ঘুমের ঘোর, গানের পালা সাঙ্গ মোর।" বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই কয়েকটি পঙ্ক্তি এক অনির্বচনীয় বেদনার প্রতীক। নিজের প্রথম কাব্যগ্রন্থ আবোল তাবোল প্রকাশের আগেই, ১৯২৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে পৃথিবী ছেড়ে চলে যান সুকুমার রায়। কিন্তু তাঁর সৃষ্টি আজও ততটাই জীবন্ত, যতটা ছিল একশো বছর আগে।

শিশুদের কাছে তিনি হাসির জাদুকর, আর প্রাপ্তবয়স্কদের কাছে তিনি সমাজ-সমালোচক, ভাষার জাদুকর এবং অসাধারণ চিন্তাবিদ।

"ননসেন্স" শব্দের আক্ষরিক অর্থ- অর্থহীন বা উদ্ভট। কিন্তু সাহিত্যিক অর্থে ননসেন্স কখনও অর্থহীন নয়। বরং তা এমন এক শিল্পরীতি, যেখানে অসম্ভব, অযৌক্তিক ও কল্পনাসূত্রে গড়া ঘটনাকে ব্যবহার করে বাস্তব সমাজের অসংগতি, ভণ্ডামি এবং মানুষের দুর্বলতাকে ব্যঙ্গ করা হয়।

ইংরেজি সাহিত্যে এডওয়ার্ড লিয়র ও লুইস ক্যারল এই ধারার পথিকৃৎ হলেও বাংলা ভাষায় ননসেন্স সাহিত্যের স্বতন্ত্র রূপ নির্মাণ করেছেন একমাত্র সুকুমার রায়। তিনি বিদেশি ভাবধারা গ্রহণ করলেও তার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন বাংলা ভাষার নিজস্ব ছন্দ, রসবোধ, লোকরীতি এবং সামাজিক বাস্তবতা। ফলে তাঁর ননসেন্স সম্পূর্ণ মৌলিক এক সাহিত্যভুবনে পরিণত হয়েছে।

অনেকেই মনে করেন আবোল তাবোল কেবল শিশুদের হাসানোর বই। কিন্তু একটু গভীরভাবে পড়লেই বোঝা যায়, প্রতিটি কবিতাই যেন সমাজের এক একটি আয়না।

'একুশে আইন' কবিতায় অদ্ভুত সব নিয়মের মাধ্যমে তিনি আমলাতন্ত্র ও অযৌক্তিক শাসনব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ করেছেন। 'বাবুরাম সাপুড়ে' কবিতায় সমাজের ভণ্ড বীর এবং আচারবাদের সমালোচনা করেছেন।

'গোঁফচুরি' বা 'গন্ধবিচার'-এ মানুষের অহংকার, আত্মপ্রবঞ্চনা এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সূক্ষ্ম চিত্র ফুটে উঠেছে। আবার 'বুড়ির বাড়ি' কবিতায় ননসেন্সের আবরণ সরিয়ে উঠে আসে এক দরিদ্র, নিঃসঙ্গ বৃদ্ধার জীবনের কঠোর বাস্তবতা। অর্থাৎ, সুকুমারের হাসি কখনও নির্মল, কখনও তীক্ষ্ণ, কখনও গভীর মানবিক। সুকুমার রায়ের সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল ভাষা। তিনি বাংলা ভাষাকে এমনভাবে ব্যবহার করেছেন, যা আগে দেখা যায়নি। "ট্যাশগরু", "কুমড়োপটাশ", "হুকোমুখো হ্যাংলা", "হিজিবিজবিজ" কিংবা "রামগরুড়ের ছানা" কেবল চরিত্র নয়, বাংলা ভাষার সাংস্কৃতিক সম্পদে পরিণত হয়েছে। তিনি নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি করেছেন, নিরর্থক শব্দকেও অর্থের সমান আনন্দ দিয়েছেন এবং ছন্দকে এমন খেলায় পরিণত করেছেন, যা পড়তে পড়তেই পাঠকের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। তাঁর কবিতায় শব্দ নিজেই আনন্দের উৎস হয়ে ওঠে; কেবল অর্থ বহন করে না।

“
তাঁর কবিতার শব্দ
নিজেই আনন্দের
উৎস হয়ে ওঠে
;কেবল অর্থ বহন
করে না

”

অনেকেই ভুলে যান, সুকুমার রায় ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র এবং মুদ্রণ প্রযুক্তির বিশেষজ্ঞ। প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞান অধ্যয়ন এবং ইংল্যান্ডে আধুনিক মুদ্রণ প্রযুক্তির শিক্ষা তাঁর চিন্তাকে যুক্তিবাদী করে তুলেছিল। তাই তাঁর উদ্ভট প্রাণী বা অসম্ভব ঘটনাগুলি নিছক কল্পনা নয়; বরং বাস্তব জীবনের অসংগতিকে নতুনভাবে দেখার কৌশল। তাঁর বিজ্ঞানবিষয়ক লেখাগুলিতেও একই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। কঠিন বিষয়কে সহজ, মজাদার ও কৌতূহলোদ্দীপক করে তোলার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর।

সুকুমার রায়ের সাহিত্যই সম্ভবত বাংলা সাহিত্যের বিরল উদাহরণ, যেখানে একই লেখা বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন অর্থ বহন করে। শিশু পড়ে হাসে, কিশোর পড়ে বিস্মিত হয়, প্রাপ্তবয়স্ক পাঠক সমাজকে নতুন চোখে দেখতে শেখে। এই বহুমাত্রিক অর্থই তাঁর সাহিত্যকে কালোত্তীর্ণ করেছে। যেমন চার্লি চ্যাপলিনের চলচ্চিত্র প্রথমে হাসায়, পরে ভাবায়; তেমনি সুকুমারের ননসেন্স প্রথমে বিনোদন দেয়, পরে আত্মসমালোচনার সুযোগ করে দেয়।

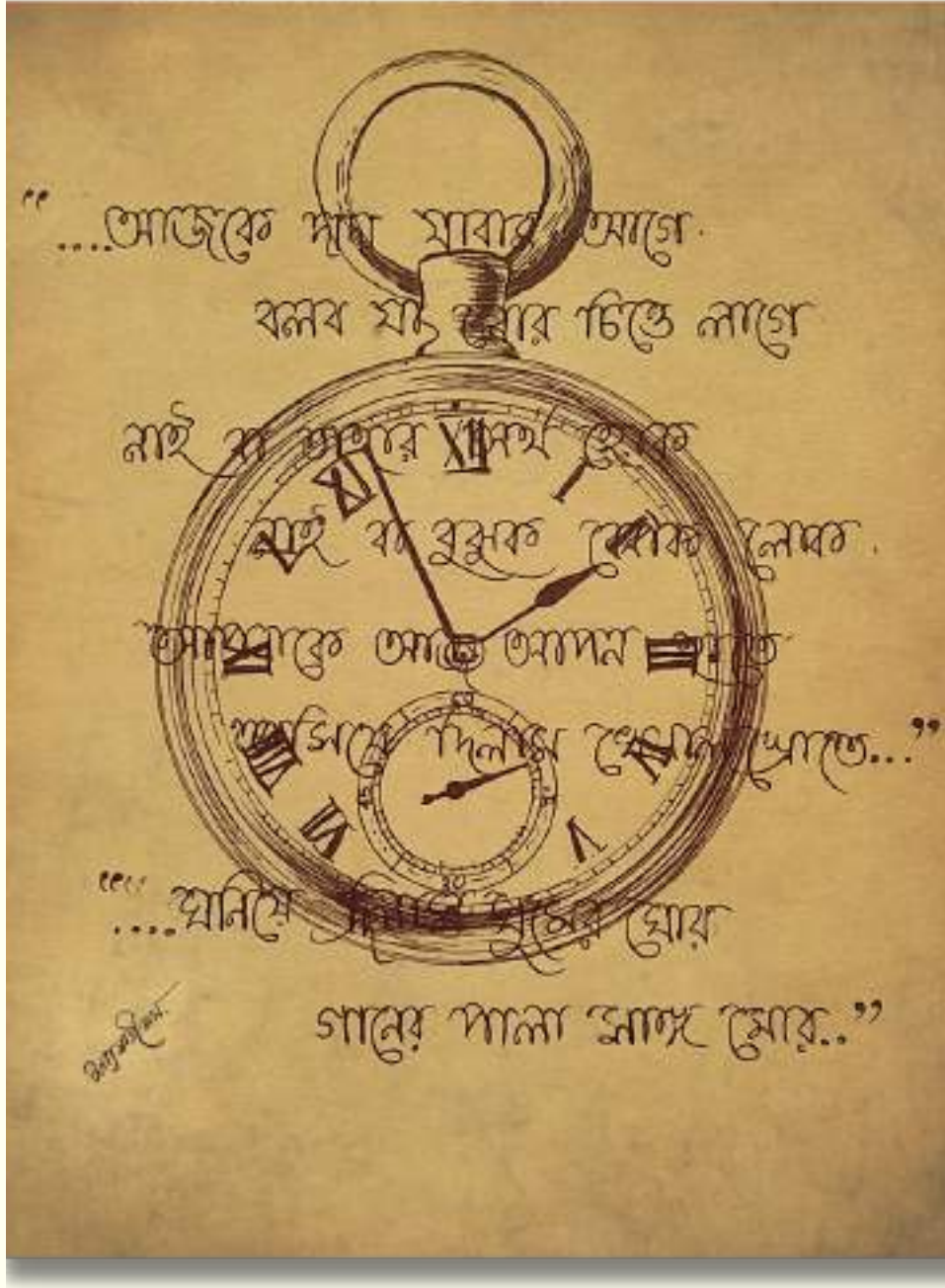


আজকের পৃথিবী যেন নিজেই এক বিশাল "আবোল তাবোল"। সামাজিক মাধ্যমে ভুয়ো খবর, রিল-সংস্কৃতি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অদ্ভুত ব্যবহার, ভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং ভার্চুয়াল বাস্তবতা আমাদের প্রতিদিন নতুন নতুন "ননসেন্স"-এর মুখোমুখি করছে। হয়তো আজ সুকুমার রায় বেঁচে থাকলে লিখতেন "হোয়াটসঅ্যাপ-ভূত", "রিল-রাক্সস" কিংবা "অ্যালগরিদম পট্যাশ"। তাঁর ব্যঙ্গের লক্ষ্য বদলাত, কিন্তু ব্যঙ্গের ধার কমত না। তাই তাঁর সাহিত্য শুধু অতীতের নয়, বর্তমানেরও ভাষ্য। মাত্র ছত্রিশ বছরের জীবনে এবং প্রায় এক দশকের সাহিত্যসাধনায় সুকুমার রায় এমন এক জগৎ নির্মাণ করেছেন, যার তুলনা বাংলা সাহিত্যে বিরল। তিনি প্রমাণ করেছিলেন, হাসি কখনও হালকা বিষয় নয়; হাসির মধ্য দিয়েও গভীরতম সত্য বলা যায়। তাঁর ননসেন্স আসলে অর্থহীন নয়, বরং অর্থের নতুন সম্ভাবনা। এই কারণেই একশো বছর পরেও আবোল তাবোল কেবল একটি বই নয়; বাংলা ভাষার কল্পনাশক্তি, স্বাধীন চিন্তা এবং সৃজনশীলতার এক চিরন্তন উৎস।

যতদিন বাংলা ভাষা বেঁচে থাকবে, ততদিন ট্যাগগরু, কুমড়োপট্যাশ, ইঁকোমুখো হ্যাংলা কিংবা হিজিবিজবিজ আমাদের কল্পনায় বেঁচে থাকবে; আর সুকুমার রায় থাকবেন বাংলা ননসেন্স সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট।

তথ্যসূত্র

১. রায়, সুকুমার। আবোল তাবোল। ইউ. রায় অ্যান্ড সন্স, ১৯২৩।
২. রায়, সুকুমার। হ-য-ব-র-ল।
৩. রায়, সুকুমার। পাগলা দাশু।
৪. রায়, সত্যজিৎ (সম্পা.)। সুকুমার সাহিত্য সমগ্র। আনন্দ পাবলিশার্স।
৫. Lear, Edward. A Book of Nonsense. 1846.
৬. Carroll, Lewis. Alice's Adventures in Wonderland. 1865.



ক্ষণজন্মা

দেবায়ন রায়

বর্ষ : ২০২২-২৩

শৈশবের রঙতুলি:

বাঙালি সমাজে যেকজন মনীষী আছেন, যাদেরকে 'ক্ষণজন্মা' শব্দে অলংকৃত করা যায়, তাদের মধ্যে সুকুমার অগ্রগণ্য। (১৮৮৭-১৯২৩)—এই ৩৬ বছর বয়সকালেই তিনি বাংলা সাহিত্যে যে 'গুঁতো' দিয়েছেন, তা সামলাতে বাঙালি আজও হিমশিম। ১৮৮৭ সালে রবি ঠাকুরের লেখা 'রাজর্ষি' উপন্যাসের এক চরিত্রের নামানুসারে

তঁার ডাক নাম রাখা হয় 'তাতা'। প্রবল চঞ্চল ও স্ফুর্তিবাজ 'তাতা' খেলাধুলোর পান্ডা ছিল তঁার পাড়ায়। সেই ছোটবয়স থেকেই চমৎকার গল্প বলতে পারত। 'রাগ বানাই' বলে অদ্ভুত এক খেলা ছিল ছোট তাতার। হয়তো কারও উপর রাগ হয়েছে কিন্তু শোধ নেবার উপায় নেই, তখনই সে লোকটির সম্পর্কে অদ্ভুত অদ্ভুত সব গল্প বানিয়ে বলতে থাকত। তাতার মধ্যে দিয়েই রাগটাগ গলে জল হয়ে যেত।

খেয়ালের আসর:

তবে সুকুমার রায় শুধুই হাসির যাদুকরই ছিলেন না, করতেন বিজ্ঞানচর্চাও। অবদান রেখেছিলেন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে। ভীষণভাবে ভালোবাসতেন আড্ডা মারতে। এজন্য প্রেসিডেন্সী থেকে পাশ করার আগেই ১৯০৭ সালে বন্ধুদের পাশে নিয়ে গড়ে তোলেন 'ননসেন্স ক্লাব', যার সভ্য ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো বিদগ্ধ লোকেরা। এই ক্লাবের জন্যই তিনি লেখেন 'ঝালাপালা' ও 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' নাটক দুটি।

“
তখন রবি ঠাকুরের
কাছে তিনি শুনতে চান
'দুঃখ এ নয়, সুখ এ গো',
যেটি কবিগুরু তাঁকে দু-
বার গেয়ে শোনান।
”

১৯১১ সালে পড়াশোনার জন্য বিলেত যান সুকুমার। ফেরেন ১৯১৩ তে। এর পর ১৯১৫ তে 'ননসেন্স ক্লাব' এর এক পরিবর্ধিত রূপে শুরু করেন 'Monday club'(প্রতি সোমবার এর আসর বসত তাই এই নাম), যা পরবর্তীতে হয় 'মণ্ডা ক্লাব'। সদস্যরা ও ছিলেন হোমরা-চোমরা —সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, অতুল প্রসাদ সেন, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ প্রমুখ।

কবিগুরুর সান্নিধ্যে:

১৯১৭ সালের জুলাই মাসে এই মন্ডা ক্লাবের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তবে সুকুমার ও কবিগুরুর সম্পর্ক এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সুকুমার রায় যখন মৃত্যুশয্যা, তখন তাঁকে দেখতে

যান রবীন্দ্রনাথ। তখন রবি ঠাকুরের কাছে তিনি শুনতে চান 'দুঃখ এ নয়, সুখ এ গো', যেটি কবিগুরু তাঁকে দু-দুবার গেয়ে শোনান। গুরুদেব সুকুমার রায়কে সম্বোধন করতেন 'বালক বন্ধু' বলে। এও শোনা যায়, মৃত্যুর পর রবি ঠাকুর তাঁকে প্ল্যানচেটে ডাকলে তিনি তাঁর পুত্র (সত্যজিৎ রায়) কে তাঁর আশ্রম শান্তিনিকেতনে নিতে বলেন।

সৃজনের দীপশিখা:

রবি-নজরুল-বঙ্কিম-শরৎ-দ্বারা লালিত বঙ্গ সাহিত্য জগতে কৌতুক সম্রাট সুকুমারের নামও স্বমহিমায় উজ্জ্বল। তিনিই বাঙালিকে শিখিয়েছেন, জীবনে কিছু 'আবোলতাবোল' হলেও ক্ষতি নেই। তিনিই বলেছেন, 'খুঁড়োর কল' এ আটকে না থেকে একটু 'হ য ব র ল' ভাবতে। জীবনকে তাঁর সাহিত্যেই পাওয়া যায়, কোনও দিন আশা হারাতে নেই, হয়তো কোনও দিন তোমার 'রুমাল' টাও হঠাৎ 'বেড়াল' হয়ে যাবে। এগুলোর সঙ্গে বাঙালি তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছে দাশুর পাগলামো, শিখেছে ৪০ হলেই বয়স কি করে উল্টো দিকে গুণতে লাগতে হয়। তবে এ হেন ব্যক্তিত্বও হয়তো শুনতে পেয়েছিলেন মৃত্যুদেবতার পদধ্বনি, নইলে 'আবোল তাবোল' কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতায় কেনই বা তিনি লিখবেন—

"ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর
গানের পালা সাঙ্গ মোর।"



শরতের শেষ বিকেলে : গড়পাড়-সুকুমার

কৃষ্ণ কুমার পাল

বর্ষ : ২০২২-২৩ (বি. এম. এল. টি)

সেপ্টেম্বর, ১৯২২।

বর্ষা তখন বিদায়ের দ্বারপ্রান্তে। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে সকালবেলায়। ভেজা মাটির গন্ধে কলকাতার অলিগলি স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। গাছের পাতায় এখনও বৃষ্টির ফোঁটারা ঝুলে আছে, মাঝে মাঝে হালকা বাতাসে টুপটাপ করে ঝরে যাচ্ছে ওরা। মেঘের আড়াল ভেঙে শরতের কোমল রোদ ধীরে ধীরে শহরের পুরোনো বাড়িগুলোর কার্নিশ, গম্বুজ আর বারান্দায় এসে পড়ছে। কলকাতার বাতাসে তখন ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে দুর্গাপুজোর আগমনী বার্তা।

কুমোরটুলির সরু গলিতে মৃৎশিল্পীদের হাতের স্পর্শে দেবী দুর্গা প্রাণ পাচ্ছেন ক্রমশ। কোথাও খড়ের কাঠামোয় মাটি লেপা হচ্ছে, কোথাও শিল্পীর তুলি দেবীর চোখের রেখা আঁকার প্রস্তুতি নিচ্ছে। গঙ্গার পাড় থেকে আনা পবিত্র মাটি শুকোচ্ছে উঠোনে।

জোড়াসাঁকো, বাগবাজার, ভবানীপুর, শ্যামবাজার সবখানেই যেন উৎসবের প্রতীক্ষা। সন্ধ্যা নামলেই কোনো না কোনো পাড়ায় ঢাকিরা তাল মিলিয়ে ঢাকের চামড়া কষে দেখছে। দূর থেকে ভেসে আসা সেই মৃদু ঢাকের শব্দ যেন ঘোষণা করছে—“মা আসছেন।”

গড়পাড় লেনের ১০০ নম্বর বাড়ি, রায়বাড়ি। উৎসবের সেই আনন্দের কোনো ছোঁয়াই নেই বাড়ির কার্নিশে। জানালাগুলো খোলা, হাসির শব্দ নেই কোথাও। উঠোনে লোকজনের যাতায়াত আছে, কিন্তু কারও মুখে উচ্ছ্বাস নেই। আত্মীয়স্বজন, চিকিৎসক, বন্ধু—নিঃশব্দে আসছেন, নিঃশব্দেই চলে যাচ্ছেন। সকলের চোখে এক অদৃশ্য উদ্বেগ।

দোতলার দক্ষিণমুখী ঘরে শয্যাশায়ী বাংলা সাহিত্যের এক অসামান্য প্রতিভা—সুকুমার রায়।

কালাজ্বর তাঁর দেহকে ধীরে ধীরে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। একসময়ের চঞ্চল, প্রাণবন্ত, অমলিন হাসির মানুষটি আজ কঙ্কালসার। তবুও তাঁর শয্যার পাশে ছড়িয়ে রয়েছে কাগজ, কলম, তুলি, অর্ধসমাপ্ত অলঙ্করণ আর 'সন্দেশ'-এর প্রুফ। রোগ শরীরকে বেঁধে ফেলেছে, কিন্তু তাঁর কল্পনার ডানায় এখনও কোনো ক্লাস্তি নেই। ঘরের বাইরে শরৎ আসার প্রস্তুতি। আর ঘরের ভিতরে সময় যেন নিঃশব্দে বিদায়ের দিন গুনছে।

ঠিক এই সময়েই কলকাতার অন্য প্রান্তে, অ্যালফ্রেড ও ম্যাডান থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শারদোৎসব' মঞ্চস্থ হওয়ার প্রস্তুতি চলছে। শহর একদিকে উৎসবের আলোয় সেজে উঠছে, আর অন্যদিকে গড়পাড়ের এক নিভৃত ঘরে বাংলা সাহিত্যের আর-এক উজ্জ্বল নক্ষত্র জীবনের শেষ অধ্যায়ের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন।

১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯২২। কলকাতার অ্যালফ্রেড থিয়েটার সেদিন জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল। দর্শকাসনের একটিও খালি নেই। অভিজাত সমাজ, সাহিত্যিক, শিল্পী, শিক্ষাবিদ, ছাত্র-সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। শুধু একটি নাটক দেখার জন্য নয়, বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবিকে মঞ্চে দেখার জন্য।

মঞ্চে শুরু হয়েছে 'শারদোৎসব'। আলো-আঁধারির আবহে একে একে চরিত্রেরা প্রবেশ করছে। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র রাজা বিজয়াদিত্য, যিনি রাজবেশ ত্যাগ করে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে মানুষের মাঝে বিচরণ করছেন। আর সেই সন্ন্যাসীর ভূমিকায় অভিনয় করছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর শুভ্র দাড়ি, গম্ভীর অথচ শান্ত মুখমণ্ডল, সংযত অভিনয় এবং কণ্ঠস্বর দর্শকদের যেন মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল। নাটকের সংলাপের সঙ্গে সঙ্গে হলঘরে নেমে আসছে নিস্তব্ধতা। এই অনুষ্ঠানের জন্যই কবি তাঁর নির্ধারিত বোম্বাই সফর স্থগিত করেছিলেন। শান্তিনিকেতনের বর্ষা-উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান ছিল মূলত তাঁকে সংবর্ধনা জানানোর উপলক্ষ। বাংলার সাংস্কৃতিক সমাজ যেন একত্রিত হয়েছিল তাঁদের প্রিয় কবিকে সম্মান জানাতে।

নাটক এগিয়ে চলেছে। ঠিক সেই সময়ে পর্দার

আড়ালে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালেন এক পরিচিত ব্যক্তি। তাঁর মুখে উদ্বেগের ছাপ। অভিনয়ের এক ফাঁকে তিনি রবীন্দ্রনাথের হাতে একটি সংবাদ পৌঁছে দিলেন—

“গড়পাড়ের রায়বাড়ি থেকে খবর এসেছে। সুকুমার রায়ের অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক। দীর্ঘদিনের কালাজ্বর তাঁর শরীরকে সম্পূর্ণ ভেঙে দিয়েছে। রোগ এতটাই প্রকট হয়েছে যে তিনি আর স্পষ্ট করে কথা বলতে পারছেন না। চিকিৎসকেরা প্রায় আশা ছেড়ে দিয়েছেন”।

খবরটি পড়ে কবিগুরুর মুখ মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে উঠল।

কয়েক মুহূর্ত তিনি নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। মঞ্চের আলো তখনও তাঁর ওপর পড়ছে, কিন্তু তাঁর মন যেন ছুটে গেছে গড়পাড়ের সেই অসুস্থ তরুণ সাহিত্যিকের কাছে—যার প্রতিভাকে তিনি বাংলা সাহিত্যের এক বিরল সম্পদ বলে মনে করতেন। কিন্তু নিয়তির নির্মমতা সেদিন এখানেই থামেনি। সেই ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯২২-এই শান্তিনিকেতন থেকে আর-একটি দুঃসংবাদ এসে পৌঁছাল। কবিগুরুর জ্যেষ্ঠ আত্মীয় দ্বীপেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরলোকগমন করেছেন। একদিকে পরিবারের শোক, অন্যদিকে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করা প্রিয় সুকুমার। একই দিনে দুটি আঘাত এসে আছড়ে পড়ল। তবু তিনি নিজের বেদনা অন্তরে ধারণ করলেন। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার অপেক্ষা করলেন, কারণ শত শত মানুষ তাঁর জন্য সমবেত হয়েছেন। কিন্তু অন্তরে তখন একটাই সংকল্প দৃঢ় হয়ে উঠছিল—

"সুকুমারের কাছে আমাকে যেতেই হবে।"

সময় খুব কম। হয়তো এই সাক্ষাৎই হবে তাঁদের শেষ সাক্ষাৎ।

বিকেলের আলো তখন ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসছে। শরতের আকাশে সোনালি রোদের শেষ রেখাগুলো গড়পাড়ের পুরোনো বাড়িগুলোর ছাদের ওপর ঝরে পড়ছে নীরবে। শহরের কোলাহল যেন এই বাড়ির সামনে এসে থমকে গেছে। রায়বাড়ির প্রধান ফটকে আজ কোনো অতিথির কোলাহল নেই, নেই হাসির শব্দ। সিঁড়ির ধাপে, বারান্দার কোণে, উঠানের

একপাশে নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীরা। সবার চোখে একই প্রশ্ন—আর কতক্ষণ?

এই নিস্তব্ধতার মাঝেই একটি ঘোড়ার গাড়ি এসে থামল বাড়ির সামনে। গাড়ি থেকে ধীরে ধীরে নামলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দীর্ঘ শুভ্র দাড়ি, সাদা পোশাক, মুখে গভীর বিষাদের ছাপ। কয়েকদিন আগেই নিজের পরিবারের শোক তাঁকে আঘাত করেছে; তবুও আজ তিনি এসেছেন আর—এক প্রিয় মানুষের ডাকে সাড়া দিতে। তাঁর সন্তানসম সুকুমারের কাছে, যুব-বান্ধবের কাছে।

বাড়ির প্রবীণ সদস্যরা এগিয়ে এসে তাঁকে প্রণাম করলেন। কেউ কিছু বলতে পারলেন না। শুধু নিঃশব্দে তাঁকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। করিডোর জুড়ে ওষুধের গন্ধ, ধূপের মৃদু ধোঁয়া আর চাপা কান্নার আবহ। প্রতিটি পদক্ষেপ যেন আরও ভারী হয়ে উঠছিল।

জানালায় ফাঁক দিয়ে আসা কোমল আলো শয্যার ওপর পড়েছে। দীর্ঘদিনের কালাজ্বর তাঁর সুঠাম দেহকে ভেঙে দিয়েছে। একসময়ের প্রাণবন্ত, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, হাস্যরসিক যুবকটি আজ শীর্ণ, ক্লান্ত। গালের হাড় স্পষ্ট, চোখের কোটর গভীর। শ্বাসপ্রশ্বাস ধীর, কিন্তু চোখ দুটি এখনও সচেতন।

দরজার কাছে রবীন্দ্রনাথকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সুকুমারের চোখে যেন এক অপূর্ব দীপ্তি জ্বলে উঠল। রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে শয্যার পাশে এসে বসলেন। কিছুক্ষণ কোনো কথা বললেন না। শুধু স্নেহভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সেই প্রিয় তরুণ সাহিত্যিকের মুখের দিকে। মনে পড়ে গেল বহু বছরের পরিচয়, উপেন্দ্রকিশোরের পরিবার, সন্দেশ পত্রিকার দিনগুলি, আর বাংলা সাহিত্যে সুকুমারের অদ্ভুত প্রতিভার কথা।

কবিগুরু আলতো করে সুকুমারের কপালে হাত রাখলেন।

— "সুকুমার, কেমন আছ বাবা?"

সুকুমার হেঁট নাড়ানোর চেষ্টা করলেন। শব্দ বেরোল না। শুধু একটি ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল মুখে। সেই হাসিতে যেন বলা ছিল—"আপনি এসেছেন, এ-ই আমার পরম প্রাপ্তি।"

রবীন্দ্রনাথ মৃদুস্বরে বললেন,

— "অনেক কষ্ট হচ্ছে?"

সুকুমার ধীরে মাথা নাড়লেন। তারপর কাঁপতে থাকা ডান হাতটি সামান্য তুললেন। পাশে রাখা টেবিলে একটি রবীন্দ্রসংগীতের বই। সুকুমার ধীরে ধীরে বইটি নিজের দিকে টেনে নিলেন। কাঁপা আঙুলে বহু কষ্টে একটি পৃষ্ঠা খুললেন। তারপর বইটি রবীন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিলেন। তাঁর চোখে তখন এক গভীর আকুতি—যে আকুতি ভাষার চেয়েও শক্তিশালী।

কবিগুরু বইটির দিকে তাকিয়ে সব বুঝলেন। তাঁর চোখও সজল হয়ে উঠল।

— "কথা বলতে হবে না, সুকুমার। তোমার মনের কথা আমি বুঝেছি। তুমি গান শুনতে চাও—তাই তো?"

সুকুমার নিঃশব্দে চোখ বন্ধ করে সম্মতি জানালেন।

ঘরে উপস্থিত সকলেই নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগলেন। বাইরে শরতের হাওয়ায় গাছের পাতা মৃদু শব্দ করছে। আর সেই নীরবতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বইটি খুলে ধীরে ধীরে সুর ধরলেন—

"আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে..."। একবার নয়, দু-দুবার।

সেই মুহূর্তে যেন মৃত্যু নয়, সঙ্গীতই ঘরটিকে পূর্ণ করে তুলল। নিস্তব্ধতার বুক চিরে কবিগুরুর কণ্ঠে ভেসে উঠল জীবনের চিরন্তন সত্য, আর সুকুমার রায় চোখ বুজে সেই সুরকে অস্তিম আশীর্বাদের মতো হৃদয়ে ধারণ করলেন। মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটির সামনে ভাষা যেন তার সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

কিন্তু অন্তরে তখন
একটাই সংকল্প দৃঢ়
হয়ে উঠছিল—
"সুকুমারের কাছে
আমাকে যেতেই হবে।"

কবিগুরু কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইলেন। তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ সুকুমারের মুখে। সেই মুখে যন্ত্রণার রেখা স্পষ্ট, তবু তার আড়ালে ফুটে উঠেছে এক আশ্চর্য প্রশান্তি। সুকুমারের চোখদুটি আধখোলা; সেখানে আর মৃত্যুভয় নেই, আছে যেন এক অচঞ্চল প্রত্যাশা। রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে আবার গানের বইটি খুললেন। তাঁর কণ্ঠ আরও কোমল, আরও গভীর হয়ে উঠল।

তিনি গাইতে শুরু করলেন—

"দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো..."

জানালার বাইরে শরতের আকাশে তখন সন্ধ্যার প্রথম তারা জ্বলে উঠেছে। বাতাসে কাশফুলের মৌসুমের শীতল স্পর্শ। দূরে কোথাও শঙ্খধ্বনি ভেসে এল। মনে হলো, প্রকৃতিও যেন এই মুহূর্তে নীরব শ্রোতা।

শয্যার এক পাশে বসে আছেন সুকুমারের স্ত্রী সুপ্রভা দেবী (টুলু)। দীর্ঘ এক বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি অক্লান্ত সেবায় স্বামীর পাশে থেকেছেন। অনিদ্রা, উদ্বেগ, চিকিৎসকদের আসা-যাওয়া—সবকিছুর ভার বহন করেও আজ তিনি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। আঁচলের কোণে মুখ লুকিয়ে তাঁর চোখ বেয়ে অশ্রুধারা নেমে এল। ঘরের অন্য প্রান্তে বসেছিলেন সুকুমারের মা বিধুমুখী দেবী। তিনি ছিলেন সমাজসংস্কারক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা। জীবনে বহু সংগ্রাম, বহু শোক তিনি দেখেছেন। কিন্তু সন্তানের এমন অসহায় অবস্থা একজন মায়ের হৃদয়ের সমস্ত দৃঢ়তাকেও ভেঙে দেয়। তাঁর দুই হাত জোড় করা। ঠোঁট নীরবে ঈশ্বরের নাম জপছে। আর চোখ নিবদ্ধ সেই মানুষটির দিকে, যিনি তাঁর মৃত্যুপথযাত্রী পুত্রকে শেষ আশীর্বাদের মতো গান শুনিতে চলেছেন। এক কোণে দাঁড়িয়ে

ছিল একটি ছোট্ট শিশু। বয়স তার মাত্র আড়াই বছর। নাম মানিক— ভবিষ্যতের সত্যজিৎ। সে এখনও মৃত্যুর অর্থ বোঝে না। বোঝে না কেন বাড়ির সবাই এত চুপচাপ। কেন তার মা কাঁদছেন। কেন সবাই ওই লম্বা শুভ্রদাড়িওয়ালা মানুষটির দিকে এত শ্রদ্ধাভরে তাকিয়ে আছে।

গান শেষ হলো। শেষ সুরটি ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল সন্ধ্যার নীরবতায়। রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে বইটি বন্ধ করলেন। তাঁর চোখও সজল। তিনি সুকুমারের কপালে স্নেহভরে হাত রাখলেন। সুকুমার ধীরে ধীরে চোখ খুললেন। কবিগুরুর দিকে একবার তাকালেন। ঠোঁট সামান্য নড়ল। কোনো শব্দ শোনা গেল না। কিন্তু উপস্থিত সকলেরই মনে হলো, যেন তিনি নীরবে বলছেন —

"আজ আমার আর কোনো আক্ষেপ রইল না।"

রবীন্দ্রনাথের সেই আগমনের পর কয়েকদিন যেন রায়বাড়ির পরিবেশ বদলে গিয়েছিল। মৃত্যুর ছায়া তখনও ঘন, কিন্তু সেই ছায়ার মধ্যে রবীন্দ্রসংগীতের সুর যেন এক অনির্বচনীয় শান্তি রেখে গিয়েছিল।

চিকিৎসকেরা বলেছিলেন, বিশ্রাম ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। শরীরের প্রতিটি অঙ্গ তখন কালাজ্বরের বিধে ক্ষয়ে যাচ্ছে। জ্বর কখনও কমে, আবার কখনো বেড়ে যায়। রাত্রিবেলা শ্বাসকষ্ট বাড়ে, শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। তবুও এক জায়গায় রোগের কোনো অধিকার ছিল না— সুকুমার রায়ের কল্পনাশক্তিতে।

তিনি বলতেন,

— "শরীর অসুস্থ হতে পারে, কল্পনা তো অসুস্থ হয় না।"

শয্যার পাশেই রাখা থাকত একটি ছোট কাঠের টেবিল। তার উপর কাগজ, কালি, কলম, পেন্সিল, তুলি আর আঁকার খাতা। চিকিৎসকেরা বিশ্রাম নিতে বললে তিনি হেসে উত্তর দিতেন,

— "আর একটু লিখি। এই লেখাটা শেষ না করলে ছেলেগুলো পড়বে কী?"

সেই সময়েও তাঁর সবচেয়ে বড় চিন্তা ছিল 'সন্দেশ'।

“
গান শেষ হলো।
শেষ সুরটি ধীরে
ধীরে মিলিয়ে গেল
সন্ধ্যার নীরবতায়।
”

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর মৃত্যুর পর যে পত্রিকার ভার তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন, অসুস্থ শরীর নিয়েও সেটিকে থামতে দেননি। বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় কখনও প্রুফ দেখছেন, কখনও লেখার সংশোধন করছেন, কখনও নতুন ছবির খসড়া আঁকছেন। মাঝেমধ্যে প্রবল জ্বরের মধ্যেও হঠাৎ উঠে বসে বলতেন,

— "ওই ছবিটার নাকটা একটু বেশি বড় হয়ে গেছে। পেন্সিলটা দাও।"

তারপর কাঁপা হাতে ছবির রেখা বদলে দিতেন।

স্ত্রী সুপ্রভা দেবী উদ্বিগ্ন হয়ে বলতেন,

— "এভাবে আর কত? একটু বিশ্রাম নাও।"

সুকুমার মৃদু হেসে উত্তর দিতেন,

— "বিশ্রাম তো পরে অনেক হবে, টুলু। এখন কাজটা শেষ হোক।"

টেবিলের উপর ধীরে ধীরে জমা হতে লাগল অদ্ভুত সব ছড়া, অচেনা সব প্রাণী, অসম্ভব সব কল্পনা। কেউ তখনও জানত না, এই লেখাগুলিই একদিন 'আবোল তাবোল' নামে বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হয়ে উঠবে। অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখা যেত। এক হাতে ওষুধের শিশি, অন্য হাতে কলম। মাঝে মাঝে কাশির দমকে থেমে যেত লেখা। কাগজের উপর কালি যেত শুকিয়ে। একটু পরে আবার তিনি লিখতে শুরু করতেন, যেন সময়ের সঙ্গে তাঁর এক নীরব প্রতিযোগিতা চলছে। তিনি যেন অনুভব করছিলেন—সময় খুব বেশি নেই। তাই যতদিন প্রাণ আছে, ততদিন সৃষ্টি থামানো যাবে না।

চিকিৎসকদের পরামর্শে একসময় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো সোদপুরে। তখনকার সোদপুর ছিল কলকাতার কোলাহল থেকে অনেক দূরে, নির্জন ও শান্ত। গঙ্গার ধারে একটি বাড়ি ভাড়া নেওয়া হলো। সকলের আশা, নির্মল বাতাস ও নদীর পরিবেশে হয়তো শরীর কিছুটা সুস্থ হবে।

ভোরবেলায় গঙ্গার উপর কুয়াশা নেমে আসত। সূর্যের প্রথম আলো নদীর জলে পড়ে রূপালি রেখা আঁকত। দূরে মাঝিদের বৈঠার ছলাং ছলাং শব্দ, কখনও ভেসে আসত স্টিমারের হুইসেল।

সুকুমারের ঘরের জানালাটি সরাসরি গঙ্গার দিকে খোলা। তিনি প্রায় প্রতিদিন সেই জানালার পাশে বসে থাকতেন। সামনে নদী, হাতে একটি খাতা।

কখনও কিছু লিখছেন, কখনও শুধু নদীর দিকে তাকিয়ে আছেন।

সেদিনও তেমনই এক সকাল। জানালার পাশে একটি আরামকেদারায় বসে আছেন সুকুমার। শরীর অত্যন্ত দুর্বল, তবুও চোখে সেই চিরচেনা দীপ্তি। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছোট্ট মানিক। আড়াই বছরের শিশুটি বাবার হাঁটুতে হাত রেখে বাইরের পৃথিবী দেখছে। নদী, নৌকা, আকাশ—সবই তার কাছে নতুন। হঠাৎ দূরে গঙ্গার বুকে কালো ধোঁয়ার একটি রেখা দেখা দিল। তারপর ভেসে এল দীর্ঘ এক হুইসেল। সুকুমারের মুখে শিশুসুলভ হাসি ফুটে উঠল।

তিনি ধীরে ধীরে ছেলের কাঁধে হাত রেখে বললেন,

— "দেখো মানিক... ওদিকে দেখো।"

মানিক বিস্মিত চোখে তাকাল।

— "ওটা কী, বাবা?"

সুকুমার নদীর দিকে আঙুল তুলে বললেন,

— "ওটা স্টিমার। নদীর বড় জাহাজ। দেখো, কী সুন্দর ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে যাচ্ছে!"

ছোট্ট মানিক মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। ধোঁয়া, শব্দ, বিশাল দেহ নিয়ে স্টিমারটি ধীরে ধীরে গঙ্গার বুকে এগিয়ে চলেছে। তার চোখ বড় বড় হয়ে গেল।

সে হয়তো কিছুই বুঝতে পারছিল না, কিন্তু দৃশ্যটি তার শিশুমনে গভীর ছাপ ফেলে দিল।

সুকুমার ছেলের বিস্ময়ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন,

— "মনে রাখবে, পৃথিবী খুব বড়। শুধু এই বাড়ি নয়, এই নদীরও ওপারে কত দেশ, কত মানুষ, কত গল্প আছে। একদিন তুমি সব দেখবে।"

মানিক বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু হাসল। সেদিন ছিল ছোট্ট সত্যজিৎ রায়ের জীবনে প্রথম স্টিমার দেখা। আর সুকুমার?

তিনি জানালার বাইরে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। গঙ্গার স্রোত বয়ে চলেছে অবিরাম। স্টিমারটি ধীরে ধীরে দিগন্তে মিলিয়ে গেল।

১৯২৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর। ভাদ্র মাসের সকাল। কলকাতার আকাশে সেদিন মেঘের আনাগোনা। গড়পাড়ের রায়বাড়িতে বহুদিন

ধরেই সবাই জানতেন—সময় আর বেশি নেই। দীর্ঘ দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে কালাজ্বরের সঙ্গে লড়াই করতে করতে সুকুমার রায়ের শরীর প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে। চিকিৎসা, প্রার্থনা, আশা—সবই যেন ধীরে ধীরে বাস্তবের কাছে পরাজিত হচ্ছে। তবু মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত তাঁর টেবিলে কাগজ ছিল, কলম ছিল, আঁকার তুলি ছিল। অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপির স্তুপের পাশে পড়ে ছিল তাঁর স্বপ্ন — "আবোল তাবোল"।

সেদিন সকাল থেকেই তাঁর শ্বাসকষ্ট কিছুটা বেড়েছিল। মাঝে মাঝে চোখ বন্ধ করছিলেন, আবার খুলছিলেন। ঘরের ভেতর নিস্তব্ধতা। স্ত্রী সুপ্রভা দেবী মাথার পাশে বসে আছেন। মা বিধুমুখী দেবী জপমালা হাতে প্রার্থনায় নিমগ্ন। ছোট্ট মানিক সবকিছু বুঝতে না পারলেও অস্বাভাবিক নীরবতা অনুভব করছিল।

দুপুরের দিকে হঠাৎ পৃথিবী যেন কেঁপে উঠল। প্রথমে মৃদু। তারপর আরও প্রবল। আলমারির কাঁচ কেঁপে উঠল। জানালার পাল্লা শব্দ করে নড়ে উঠল। ঝাড়বাতি দুলতে লাগল। বাড়ির ভেতর থেকে কেউ চিৎকার করে উঠলেন—

— "ভূমিকম্প!"

গড়পাড়ের সেই পুরোনো বাড়িটিও কেঁপে উঠল যেন। দোতলার সেই ঘরে, যেখানে শুয়ে ছিলেন সুকুমার, বিছানার কাঠও যেন মৃদু কম্পনে কেঁপে উঠল। ঘরের সবাই কিছুক্ষণের জন্য বিচলিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সুকুমারের মুখে কোনো ভয় ছিল না। তিনি ধীরে ধীরে চোখ খুললেন। একবার জানালার দিকে তাকালেন। তারপর সুপ্রভা দেবীর দিকে। মৃদু হাসলেন।

তিনি খুব আন্তে বললেন—

"টুলু... এবার চলি। প্রস্তুত হও।"

সুপ্রভা দেবী তাঁর হাত শক্ত করে ধরে রাখলেন। চোখের জল আর আটকে রাখতে পারলেন না। তিনি শুধু বললেন—

— "এভাবে বলো না..."

সুকুমার উত্তর দিলেন না। তাঁর দৃষ্টি যেন অনেক দূরে, দৃশ্যমান পৃথিবীরও ওপারে।

আরও ধীর হয়ে গেল। ঘরের সবাই নীরবে দাঁড়িয়ে। কেউ কাঁদছেন। কেউ প্রার্থনা করছেন। ছোট্ট মানিক অবাক হয়ে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে। একসময় সুকুমারের শ্বাস থেমে গেল। মুখে তখনও সেই চিরচেনা মৃদু হাসি। যেন তিনি কোনো অজানা দেশের দিকে যাত্রা করলেন— যেখানে অসুখ নেই, যন্ত্রণা নেই; আছে শুধু কল্পনা, আলো আর অনন্ত শান্তি।

মাত্র ছত্রিশ বছরেরও কম এক জীবনে তিনি বাংলা ভাষাকে দিয়ে গেলেন এমন এক বিস্ময়ের ডুবন, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও উজ্জ্বল হয়েছে। গড়পাড়ের সেই ঘরে সেদিন এক মানুষের জীবনাবসান ঘটেছিল। কিন্তু জন্ম নিয়েছিল এক অমর উত্তরাধিকার।

সুকুমার রায় চলে গেলেন; রেখে গেলেন "আবোল তাবোল", "হযবরল", "পাগলা দাশু", "সন্দেশ"—আর রেখে গেলেন ছোট্ট মানিককে, যিনি একদিন সত্যজিৎ রায় হয়ে পিতার অসমাপ্ত সৃজনের দীপ্তিকে অন্য এক শিল্পমাধ্যমে বিশ্বমঞ্চে পৌঁছে দেবেন। সেদিনের ভূমিকম্পের কম্পন থেমে গিয়েছিল কয়েক মুহূর্তে। কিন্তু সুকুমার রায়ের প্রয়াণে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল, তার অনুরণন বাংলা সাহিত্য আজও অনুভব করে।

গড়পাড়ের রায়বাড়িতে শোকের আবহ তখনও কাটেনি। সুকুমারের ব্যবহৃত টেবিলটি যেমন ছিল, তেমনই পড়ে আছে। কালি-দোয়াতের

“
সুকুমার উত্তর দিলেন
না। তাঁর দৃষ্টি যেন
অনেক দূরে, দৃশ্যমান
পৃথিবীরও ওপারে।
”

বিকেলের আলো ক্রমে ফিকে হয়ে এলো। শ্বাস

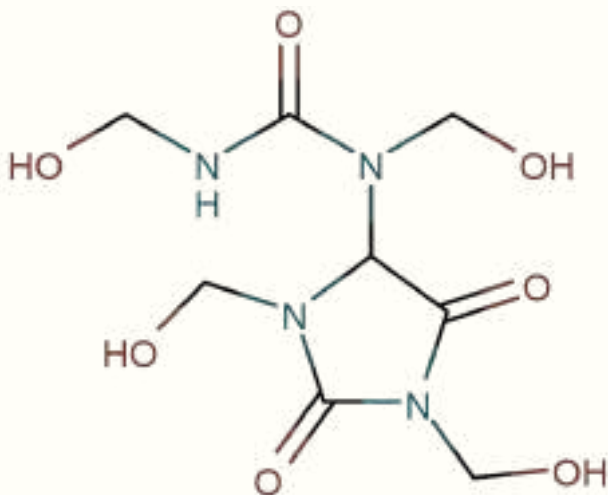
পাশে শুকিয়ে যাওয়া কলম, ছড়িয়ে থাকা আঁকার খাতা, সংশোধন করা প্রুফের পাতা—সব যেন অপেক্ষা করছে সেই মানুষটির জন্য, যিনি আর কখনও ফিরে এসে সেগুলো স্পর্শ করবেন না। দেয়ালের কোণে ঝুলছে তাঁর আঁকা কয়েকটি নকশা। টেবিলের ওপর স্তূপ করে রাখা পাণ্ডুলিপির মধ্যে সবচেয়ে যত্নে বাঁধাই করা রয়েছে একটি বই—“আবোল তাবোল”। এই বইটির প্রতিটি কবিতা, প্রতিটি ছবি, প্রতিটি অদ্ভুত চরিত্র সুকুমারের অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণার মধ্যেও সৃষ্টি হয়েছিল। কালাজ্বর তাঁর শরীরকে পরাজিত করেছিল, কিন্তু তাঁর কল্পনাকে নয়।

অবশেষে এল ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯২৩। মৃত্যুর মাত্র নয় দিন পরে কলকাতার মুদ্রণযন্ত্র ইউ. রায় অ্যান্ড সন্স থেকে বেরিয়ে এল বহু প্রতীক্ষিত গ্রন্থ—“আবোল তাবোল”।

নতুন বইয়ের পাতায় তখনও ছাপার কালির গন্ধ। প্রচ্ছদে সুকুমারের নিজের আঁকা অলঙ্করণ। ভেতরের প্রতিটি পাতায় তাঁর অদ্ভুত রসবোধ, ব্যঙ্গ, কল্পনা আর ভাষার জাদু। কিন্তু সেই বইটি হাতে তুলে নেওয়ার জন্য যার অপেক্ষায় সবাই ছিল, তিনি আর নেই। নিজের জীবনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি প্রকাশিত হতে তিনি দেখে যেতে পারলেন না। বইটির শেষে যেন তাঁরই কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হতে থাকে—

"আজকে দাদা যাবার আগে
বলব যা মোর চিন্তে লাগে...
নাইবা তাহার অর্থ হোক
নাইবা বুঝুক বেবাক লোক..."

ইতিহাস বড়ো নির্মম। ইতিহাস কখনও কখনও এমন নিষ্ঠুর পরিহাস রচনা করে, যার উত্তর খুঁজে পাওয়া



ইউরিয়া স্টিবামিন

যায় না। সুকুমার রায় যখন কালাজ্বরের সঙ্গে প্রতিদিন মৃত্যুর লড়াই লড়ছেন, তখন সেই কলকাতাতেই আর-এক বাঙালি মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী আবিষ্কারের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে। তিনি ডা. উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

কলকাতা জুড়ে তখন মহমারী, কালাজ্বর। ১৯২০ সালে তৎকালীন ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুল ও হাসপাতাল—আজকের নীলরতন সরকার (এন. আর. এস.) মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল—এর গবেষণাগারে অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে তিনি আবিষ্কার করেন ইউরিয়া স্টিবামিন (Urea Stibamine)। কালাজ্বরের বিরুদ্ধে এটিই ছিল প্রথম কার্যকর ভারতীয় ওষুধ। পরীক্ষাগারে সাফল্যের পর তিনি ধাপে ধাপে রোগীদের ওপর এই ওষুধ প্রয়োগ করেন। বিভিন্ন অঞ্চলের কালাজ্বরে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় অভাবনীয় ফল মিলতে শুরু করে। বহু রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরেন। সমসাময়িক চিকিৎসা-রিপোর্টে এই ওষুধের সাফল্যের হার প্রায় নব্বই শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছায় বলে উল্লেখ করা হয়। উত্তরবঙ্গের চা-বাগান ও কৃষিশ্রমিকদের মধ্যেও এই ওষুধ উল্লেখযোগ্য সাফল্য এনে দেয়।

কিন্তু বিজ্ঞান যেমন আবিষ্কারের ওপর দাঁড়ায়, তেমনি তার পথ আটকে দেয় প্রশাসন, সন্দেহ এবং উপনিবেশিক মানসিকতা। তৎকালীন ব্রিটিশ চিকিৎসা প্রশাসনের একাংশ নতুন ভারতীয় আবিষ্কারটিকে সহজে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। ওষুধটির ব্যাপক সরকারি অনুমোদন ও প্রয়োগে নানা প্রশাসনিক বিলম্ব ও সংশয় দেখা দেয়। ফলে বহু রোগীর কাছে এই নতুন চিকিৎসা সময়মতো পৌঁছাতে পারেনি। এই প্রশ্নেই ইতিহাস আজও নীরবে ফিরে তাকায়।

সুকুমার রায়ের চিকিৎসক ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ ডা. দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র। তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের অন্যতম দক্ষ চিকিৎসক এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠজন। তবু প্রশ্নটি থেকে যায়—কেন সুকুমার রায়ের চিকিৎসায় ইউরিয়া স্টিবামিন ব্যবহার করা হলো না? এর নিশ্চিত উত্তর আজও ইতিহাসের কাছে নেই।

সম্ভবত ওষুধটি তখনও সর্বত্র সহজলভ্য ছিল

না। হয়তো সরকারি অনুমোদনের জটিলতা ছিল। হয়তো চিকিৎসক মনে করেছিলেন রোগ ইতিমধ্যেই এমন জটিল পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে ফল পাওয়ার সম্ভাবনা কম। হয়তোবা....! আবার এটিও সম্ভব, তৎকালীন চিকিৎসাব্যবস্থায় নতুন ওষুধ ব্যবহারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছিল। এসবই অনুমান।

তবে ইতিহাসের আর-একটি ঘটনাও বিস্ময় জাগায়। সুকুমার রায়ের মৃত্যুর মাত্র দশ দিন পরে, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯২৩, ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজের বার্ষিক অধিবেশনে ডা. নীলরতন সরকার ডা. উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর ইউরিয়া স্টিবামিন-এর অসাধারণ সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। চিকিৎসাবিজ্ঞান তখন স্বীকার করতে শুরু করেছে—কালাজ্বরের বিরুদ্ধে ভারতীয় বিজ্ঞানীর এই আবিষ্কার এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। কিন্তু সেই স্বীকৃতির আলো পৌঁছানোর আগেই নিভে গেছে সুকুমার রায়ের জীবনপ্রদীপ।

আজ, এক শতাব্দী পরে দাঁড়িয়ে আমরা শুধু একটি প্রশ্নই করতে পারি—যদি সুকুমার রায় সময়মতো ইউরিয়া স্টিবামিনের চিকিৎসা পেতেন, তবে কি তিনি আরও কয়েক বছর বেঁচে থাকতেন? এর উত্তর ইতিহাসের কাছে নেই। কিন্তু এই প্রশ্নের মধ্যে লুকিয়ে আছে এক গভীর বেদনা। হয়তো বাংলা সাহিত্য আরও কয়েকটি "আবোল তাবোল", আরও কিছু "হ-য-ব-র-ল" ও আরও কিছু বিস্ময়কর সৃষ্টি পেত। হয়তো ছোট্ট মানিক আরও কিছুদিন বাবার সান্নিধ্য পেত। হয়তো বাংলা শিশুসাহিত্য ও ননসেন্স সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হতো আরও। নিয়তি সেই সুযোগ দেয়নি।

তাই সুকুমার রায়ের জীবনকাহিনি শুধু এক সাহিত্যিকের অকালপ্রয়াণের ইতিহাস নয়; এটি সেইসব সম্ভাবনারও ইতিহাস, যেগুলি জন্ম নেওয়ার আগেই সময়ের নির্মম হাতে হারিয়ে গিয়েছিল; হারিয়ে যায়। আর হারিয়ে যাচ্ছে বারবার....। তবু হারিয়ে যাবে কি ইতিহাস, আজও ?



“

আমরা মহাভারতে পড়িয়াছি, বিরাট রাজার গৃহে অজ্ঞাতবাসের শেষদিকে অর্জুন কৌরবদলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যুদ্ধের মধ্যে তিনি সম্মোহন অস্ত্র মারিয়া শত্রুদলকে অজ্ঞান করিয়া ফেলেন। সম্মোহন অস্ত্রটা কিরূপ তাহা জানি না-কিন্তু আজকালকার ডাক্তারেরা এই বিদ্যাটি রোগীদের উপর অনেক সময়ই প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইহার ফলে, রোগীকে অজ্ঞান করাইয়া তাহার হাত-পা কাটিয়া ফেলা হয়, অথচ রোগী তাহার কিছুই জানিতে পারে না। ব্যাপারটি অতি সহজ! রোগীর নাকের কাছে খানিকটা ঔষধ ধরিয়া তাহাকে শুঁকিতে দেওয়া হইল-রোগী সেই মিষ্ট গন্ধ শুঁকিতে শুঁকিতে বেহুঁশ হইয়া গেল। ব্যস, তারপর চটপট ছুরি চালাইয়া কাজ সারিয়া লইলেই হয়!

আফিং খাইলে বা অন্য নানারকম নেশা করিলে মানুষের জ্ঞান থাকে না। একবার একটা মাতাল নেশার ঘোরে খানায় পড়িয়া পা ভাঙিয়া ফেলে, ডাক্তার সেই নেশার অবস্থাতেই তাহার পায়ের উপর অস্ত্র-চিকিৎসা করেন-মাতাল তাহার কিছুমাত্র বুঝিতে পারে নাই। কোনও অসুখের যন্ত্রণা যখন রোগীর পক্ষে অসহ্য হইয়া পড়ে, ডাক্তারেরা তখন আফিং জাতীয় ঔষধ খাওয়াইয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া রাখেন- সে ঘুমে শরীরের সমস্ত বেদনাকে এমন অবশ করিয়া ফেলে যে, রোগী আর কোনওরূপ যন্ত্রণা টের পায় না।

– সুকুমার রায় ('ক্লোরোফর্ম' নামক প্রবন্ধ)



”

ছোট গল্প ১



রাত দুটোর পূর চাঁদের চাকরি

সালোনি ভট্টাচার্য
বর্ষ : ২০২৫-'২৬

সবাই জানে, চাঁদ আকাশে ওঠে।

কিন্তু খুব কম লোকই জানে, ওটা চাঁদের আসল কাজ নয়।

চাঁদের আসল চাকরি শুরু হয় রাত দুটোর পর।

রাত দুটো বাজলেই চাঁদ তার সাদা আলো গুটিয়ে নিয়ে পৃথিবীর সব স্বপ্নের অফিসে হাজিরা দেয়।

হ্যাঁ, স্বপ্নেরও অফিস আছে।

সেখানে সারি সারি আলমারি। একটাতে রোমাঞ্চকর স্বপ্ন, একটাতে ভয়ের স্বপ্ন, একটাতে পরীক্ষার আগের রাতের সেই বিখ্যাত স্বপ্ন—যেখানে প্রশ্নপত্র খুলে দেখা যায়, সব প্রশ্নই মঙ্গোলিয়ান ভাষায়।

চাঁদের কাজ হলো সারা রাত স্বপ্ন বিলি করা।

একদিন বড় বিপদ হয়ে গেল।

চাঁদ ভুল করে সব স্বপ্নের লেবেল গুলিয়ে ফেলল।

ফলে পরদিন সকালে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে লাগল।

পাড়ার এক গণিত শিক্ষক ঘুম থেকে উঠে ঘোষণা করলেন,

—আমি আজ থেকে জলদস্যু হব!

একজন জলদস্যু সমুদ্রে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল,

—দ্বিঘাত সমীকরণ ছাড়া আমার জীবন অর্থহীন!

একটি বিড়াল জেগে উঠে বিশ্বাস করতে লাগল যে সে আসলে একটি আলু।

সে সারাদিন রান্নাঘরের বুড়িতে বসে ছিল।

এদিকে একটি আলু দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করল যে সে বিড়াল।

সে তিনবার "ম্যাও" করার চেষ্টা করেছিল।

সন্ধ্যা নাগাদ পৃথিবীতে এমন অবস্থা হল যে কেউ আর কাউকে বুঝতে পারছে না।

চাঁদ অফিসে ফিরে ধরা পড়ল।

স্বপ্নমন্ত্রী খুব রেগে গেলেন।

—এ কী কাণ্ড করেছে?

চাঁদ মাথা নিচু করে বলল,

—স্যার, কাল রাত্তিরে একটা কবিতা পড়ছিলাম...

—তারপর?

—হাসতে হাসতে লেবেলগুলো উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে।

মন্ত্রী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

—ঠিক আছে। শাস্তি হিসেবে আজ রাতের সব শিশুর স্বপ্নে তোমাকে নিজে উপস্থিত থাকতে হবে।

সেই থেকে মাঝেমধ্যে কোনো কোনো শিশু স্বপ্নে দেখে—

চাঁদ তার বিছানার ধারে বসে আছে।

হাতে একটা মোটা খাতা।

সে জিজ্ঞেস করছে,

—আজ কী স্বপ্ন দেখতে চাও? ড্রাগন? উড়ন্ত হাতি? না কি এমন একটা স্কুল যেখানে পরীক্ষায় শিক্ষকরা নকল করে?

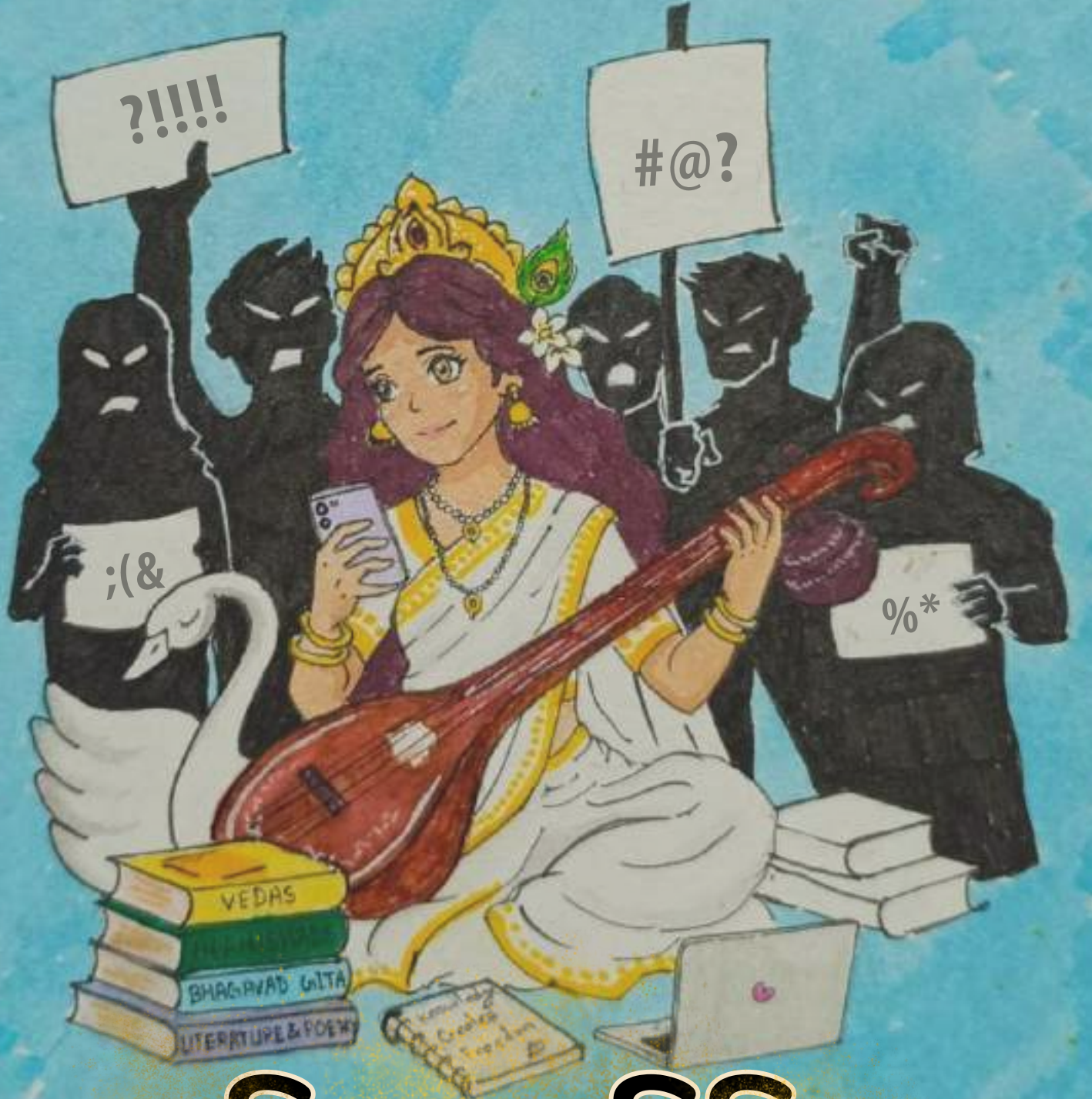
আর শিশুরা যতই বড় হোক, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতেই হয়তো গল্প লিখতে শেখে।

কারণ পৃথিবীর সব গল্পই আসলে কোনো এক ভুলোমনা চাঁদের অফিস থেকে ফসকে বেরিয়ে আসা স্বপ্ন।

ছবি: কাজী রাইসা নাজনীন

ব্যাচ: ২০২৪-'২৫

নাটক



বিদ্যাকাহিনি

প্রভুষা মহন্ত

অঙ্কন: নির্মাণ আচার্য

স্থান— কৈলাস পর্বতের সরস্বতীর
লাইব্রেরি কাম ড্রেসিং রুম। আজ সরস্বতী
রাত থাকতে উঠে পড়েছে। মানস
সরোবরে স্নান করেছে, গায়ে হলুদ মেখে।
সে শ্বেতশুভ্র একটি শাড়ি পরে আয়নার
সামনে বসে মৃদু প্রসাধন সেরে নিচ্ছে।

সরস্বতী:

(মৃদু স্বরে) লা লা লা লা... নাহ, চুলটা
কিছুতেই বাঁধতে পারছি না মনের মতো।
মর্ত্যে আজকাল যা পলিউশন, মোটেই
চুল ছেড়ে যাওয়া যাবে না। আগেরবার মা
যা বকেছিল রক্ষ চুলের অবস্থা দেখে।

পঁয়াক পঁয়াক... পঁয়াক পঁয়াক পঁয়াক।

হাঁসু:

আহ, হাঁসু, কী হচ্ছে টা কী? দেখছিস না
রেডি হচ্ছি। GET READY WITH
ME করতে চাইলে চলে আয়।

সরস্বতী:

আমায় দুর্গা সাজিয়ে দিয়েছেন, আর
তাহাড়া তুমি থাকতে আমায় কেই-ই বা
দেখছে!

হাঁসু:

সরস্বতী:

ন্যাকামি করিস না। যা বলতে এসেছিস, বল...

হাঁসু:

বলছি মা, একটা ভালো SPF-এর সানস্ক্রিন
নিতে ভুলো না যেন। আগের বার তো ডি-
ট্যান করতে মা ঠাকরুন তোমায় নন্দীর বিষ্ঠা
মাখালেন... কী বিস্তী কাণ্ড! বাবা রে বাবা!

সরস্বতী:

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। ফলাও করে মনে করাতে
হবে না। এই মর্ত্যের ছা গুলো ফাল্গুনেই
বৈশাখের সূর্যদাদুকে ডেকে নেবে, নামেই
বসন্ত— যত সব ফন্দিবাজি! এদিকে
ছোড়াগুলো সকাল-বিকেল চিৎকার করছে,
"ছ-এ ঋতু সাত-এ সমুদ্র!" ঝালাপালা হয়ে
গেলুম!

হাঁসু:

ঠিক আছে মা, তুমি রেডি হও। দু-একটা
বামুন অলরেডি ডাকাডাকি শুরু করে
দিয়েছে।

সরস্বতী:

সে ডাকুক গো। একটু সকাল না হলে
তোকে নিয়ে আমি মর্ত্যে একা যেতে
ভরসা পাই না।

হাঁসু:

বেশ মা, আমি ভ্যানিটি ব্যাগ গুছিয়ে নিই...
তিন দিনের ঝঙ্কি এখন।

[হাঁসুর প্রস্থান]

সরস্বতী:

আমি মেকআপটা সেরে নিই।

(স্বগত) পরের বার মাকে বলে একটা
মেকআপ আর্টিস্ট আর হেয়ার স্টাইলিস্ট
বুক করে রাখতে হবে। আজকাল
মেকআপের এত স্টেপ! এত ঝঙ্কি আর
ভালো লাগে না বাপু! উফ... এই
কনসিলারটা কোথায় গেল?...
(নেপথ্যে ডাক) হাঁসু-উ-উ!

স্থান - নলিনীবালা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের
হলঘর, যেখানে বাণীবন্দনা থেকে বিতর্ক সভা
সবার আসর বসে।

অঞ্জলী আর ভোগের পালা সবে শেষ হয়েছে।
ইতিউতি মেয়েদের ছোটো ছোটো জটলা।

দেবযানী:

উফ! বাবা বাঁচলাম কখন থেকে পেটে ছুঁচো
ডন মারছে। আর গরম যেন 'এস হে বৈশাখ
'এর রিপ্লাই দিচ্ছে উপর থেকে।

মালিনী:

তুই উপোষ করেছিস! কি দিনকাল এল! কী
অত বিড়বিড় করছিলি অঞ্জলীর সময়, মন্ত্র
তো নয়? আর আজকাল এত গরম কেন হুঁ
! এই তো সবে বসন্ত...

স্বাতী:

হ্যাঁ হ্যাঁ ঝেড়ে কাশ তো, নির্ঘাত ওই গুম গুম
করে উড়ে যাওয়া রাজপুত্রের সওয়ার...

দেবযানী:

আহ! থামবি তোরা? ওই ইডিয়ট টা তো
একগাদা ডিএম করে আমি পাত্তা দিইনি।
এই সব সিলি ব্যাপারে এখন নাক গলানোর
সময় নেই...

স্বাতী: তাহলে,

দেবযানী: মা,মাগো! তুমি তো জানো মা আমার বিদ্যের দৌড় এই স্কুল পর্যন্তই। হ্যাঁ কলেজ আমি পড়ব কিন্তু সে শুধু ডিগ্রির জন্যই, আমি যে influencer হতে চাই। সেই যবে থেকে ফোন হাতে পেয়েছি চেষ্টা করে যাচ্ছি। অ্যাকাউন্ট টার একটু রিচ পাইয়ে দাও মা। বেশী নয় আপাতত 10 k followers হলেই চলবে। 'দেবস ডে'স' একদিন ব্লুটিক পাবেই। নাচ আর গানটা একটু দেখে নিও... ব্যাস্ আর কিছু চাই না আপাতত।

মালিনী: তোর হবে। তোর মধ্যে আছে ... একটা স্পার্ক।

দেবযানী: তোরা কী চায়লি বল। অন্যান্য বছর তো অঞ্জলীর সময় ঠেলাঠেলি করিস।

মালিনী: মা কে বললাম নিটটা যেন First attempt এ ক্র্যাক করতে পারি। এই অত্যাচার যে আর সহ্য করা যাচ্ছেনা। রবিবারেও ছুটি নেই। আমি কুল খাইনি মা, কুল গাছও চিনি না। একটা সিট যেন হয়ে যায় ...

স্বাতী: আমি চাইলাম অর্ঘ্য যেন ফিরে তাকায় একটু আমার দিকে। ডিএম করলে যেন রিপ্লাই দেয়, আবার একসাথে ফুচকা খেতে যেতে পারি ... টিউশনে যেন আমার পাশে বসে ...

মালিনী: এই থামতো -সারা ক্ষণ শুধু ওই; তিনি তো শুনছি আবার প্যাচ আপ করে নিয়েছেন। এখন পুরোনো ফুলেই অর্ঘ্য দিচ্ছেন।

স্বাতী: এই খবরটা কিসত্য় রে...?

দেবযানী: এখন একটু থাক এসব। চল পোলাও টা সাঁটিয়ে আসি আগে... যা গন্ধ আসছে... আহ!

স্থান: উদয়ন সঙ্ঘের বাগদেবীর মণ্ডপ। এখন রাত বারোট। আকাশে শুক্লাপঞ্চমীর ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদ।

মণ্ডপের ভেতর আসীন মা সরস্বতী আর রাজহংসী। বাইরের ক্লাবঘরে দুজন সশস্ত্র প্রহরী নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে।

সরস্বতী: কীরে হাঁসু ঘুমোলি বুঝি! মশা লাগছে না?

হাঁসু: ঘুম কি আর আসে মা! মশা গুলো যে গাত্র দাহন করছে।

সরস্বতী: এদের আক্কেলটা দেখ একবার! সারাদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাজা বেঁকে গেলো। কুল খেয়ে খেয়ে গা গুলিয়ে যাচ্ছে। আর এই হতচ্ছড়া গুলো একটু ঘুমোতে দিলে না!

হাঁসু: এখানে তো আরও এক রাত থাকতে হবে মা --

সরস্বতী: তা তো হবেই নইলে মা আবার রক্ষে রাখবে না। হ্যাঁ রে হাঁসু একটা জিনিস দেখাচ্ছিস মর্ত্যের এই কচিকাচা গুলো কি সব অদ্ভুত প্রার্থনা করছে...

হাঁসু: সেই তো, এরা তো অনেকেই বিদ্যা বুদ্ধি সঙ্গীত নৃত্য কলা এসব আর চাইছে না, নতুন নতুন চাহিদা সব।

সরস্বতী: কেউ বলে INFLUENCER হবে কেউ বলছে NEET CRACK করিয়ে দাও, PATCH UP করে দাও BREAK UP করে দাও... লাইক দাও কमेंট দাও আরও কত বায়না!

হাঁসু: মা আমি তো সব বুঝতে পারছি না এদের নতুন নতুন ভাষা। কে একজন বলল আমাদের নাকি খুব কুল লাগছে। কুল তো তোমার বড় প্রিয়...

সরস্বতী: আরে এ কুল হল গিয়ে অন্য কুল। মানে, মানে...

হাঁসু: আচ্ছা মা মর্ত্যে আর কিছুদিন থাকলে হয় না! স্বর্গীয় নেটওয়ার্ক টা বড্ড খারাপ 3G ও

চলে না মাঝে মধ্যে এখানে দেখো সবসময়
5G...

সরস্বতী: আচ্ছা বেশ, মাকে একবার খবর পাঠিয়ে বলে
দেবো যে আমরা কদিন মর্ত্যে থাকছি।
এখানকার আদবকায়দা রপ্ত করব।

হাসু: সেই ভালো। মা আমি কিন্তু রিলস বানাবো।
একটা। অ্যাকাউন্ট খুলবো INSTAGRAM
এ। তুমি আর আমি একটা SHOPPING
MALL এর বড় আয়নায় মিরর সেলফি নেবো।
স্বর্গে পঁচা কে দেখাবো, ওর মুখটা বাংলার
পাঁচ হয়ে যাবে। ভারী দেমাক ভালো উড়তে
জানে বলে...

সরস্বতী: আহ! হাসু হিংসে করে না। তুমিও তো সাঁতার
জানো। কি সুন্দর তোমার রূপ। লেখাপড়া
শিখিয়েছি তোমায়, আর কি চাও বল!

হাসু: হ্যাঁ মা তা আর বলতে, তোমার কাছেই তো
অঙ্ক, ভূগোল, জ্যামিতি, ব্যাকরণ শিখেছি।
গান, নাচ আরও কত কি...

সরস্বতী: থাম, তোর বিদ্যের দৌড় আমি জানি। তুই কি
একটা আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিস?

হাসু: কইনা তো... এখানে তো কেউ নেই।

সরস্বতী: একটু কান পেতে শোন না ভালো করে। ও
তোর তো কান নেই আবার। তাও শোন মন
দিয়ে।

(একদল উত্তেজিত লোক লাঠি আর কিছু
অস্ত্র নিয়ে ঢুকে পড়ে ফাঁকা প্যান্ডেল এ। মুখে
তাদের কালো কাপড় জড়ানো।)

ব্যক্তি এক: মূর্তিটার গা থেকে হারটা খোল তাড়াতাড়ি।
প্রণামী বাক্সটা তুলে নো। উদয়ন ক্লাবের এত
সাহস এই তারক লায়েক এর টাকা বেড়ে
দেয়! এতগুলো টাকা চাঁদা দিলুম নায়িকা
আসবে বলে! এখন নাকি তিনি আসবেন না!
ইয়ার্কি হচ্ছে...

ব্যক্তি দুই: দাদা গার্ড দুটোকে কী করব? যদি
বেফাঁস কিছু বলে দেয়...

ব্যক্তি তিন: খেলনা দুটো হাতিয়ে নে আগে।

ব্যক্তি চার: ওই দুটোকে চার - পাঁচ ঘা ডান্ডা মেরে
দাদার আরোগ্য নিকেতনে ফেলে আয়।
ওরা ICU তে রেখে দেবে সাত দিন।

ব্যক্তি পাঁচ: বাবা আমি কিন্তু ওই বীণাটা নেবো।
শুনেছি ওটা নাকি বেশ পুরোনো খাঁটি
জিনিস। বেশ দাম পাওয়া যাবে
ANTIQUE হিসেবে।

তারক: আরে ভিকু, তোর তো দেখছি সব দিকে
নজর। পড়াশোনা তোর হবার ছিল না।
বাপের নামটা রাখিস কিন্তু...

ভিকু: সে আর বলতে বাবা। এরপর থেকে
এইসব ছোটখাটো কাজ আমিই দেখে
নেবো। তুমি ইলেকশন এর দিকে
তাকাও।

সরস্বতী: এরা বলে কি হাসু! বীণাটা নেবে বলছে
যে, গয়না যাক গে সে আমার অনেক
আছে। কিন্তু বীণা যে আমার সাধনার
জিনিস...

হাসু: তুমি চিন্তা কোরো না মা বীণাটা আমি
নিতে দেবো না, আসুক না একবার
দেখাচ্ছি মজা!

(চার পাঁচজন মিলে মায়ের হারটা খুলে
নেয়। ভিকু বীণা নামাতে উদ্যত হয়।)

ভিকু: আ... হ্ ...কি জোরে কামড়ালো কিছু
একটা। মরে গেলুম রে... আঙুলটাই
নিয়ে নিল মনে হচ্ছে

বাকিরা সমস্বরে: দেখি দেখি...

(টর্চ জ্বলে দেখা গেলো ভিকুর ডান
তালু রক্তে ভেসে যাচ্ছে। সকলেই
খোঁজাখুঁজি করতে লাগল
প্রাণীটিকে।)

আমাদেরকে আর তেমন দরকার নেই।
এই বীণাটা সাথে নিয়েই যাবো।

হাঁসু: এখনি বেরিয়ে পড়ি চলা চাঁদ মামা
পৌঁছে দেবো।

সরস্বতী: চল হাঁসু চলে যাই এখান থেকে। মর্ত্যে



অঙ্কন: প্রতুষা মহন্ত

সুকুমার, সুখলতা এবং চিকিৎসা সংবাদ (জুলাই সংখ্যা)



'নিলয়' এর প্রথম সংখ্যার অনুপ্রেরণা আমাদের সুকুমার রায়। সম্ভবত মুখে বুলি ফোটার সময় থেকেই আমাদের সাথে সুকুমারের পরিচয় ঘটেছে আবোল তাবোল কিংবা খাই খাই এর হাত ধরে। কাতুকুতু বুড়ো, বাঙলা নিবাসী হুকোমুখো হ্যাংলা, রামগরুড়ের ছানার উল্টো দিকে বসে বসে হেসে কুপোকাত হয়েছি। শুধু সুকুমার নন, তাঁর বড়দিদি **সুখলতা**ও ছিলেন অসামান্য প্রতিভাশালিনী। প্রচারবিমুখ সুখলতার কাজের যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি আজও। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৬৯ সালের ৯ ই জুলাই। কাকতালীয় ভাবে আমাদের ম্যাগাজিন 'নিলয়' এর জন্ম এই জুলাই মাসেই এবং আমাদের কলেজ বর্ধমান মেডিক্যাল এর জন্ম ১৯৬৯ এই

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং বিধুমুখী দেবীর জ্যেষ্ঠ তথা প্রথমা সন্তান সুখলতা। তাঁর চেয়ে বয়সে এক বছরের কনিষ্ঠ ভাই সুকুমার রায়। স্বল্পবাক সুখলতার রঙ তুলি এবং কলমের সাথে সখ্য গড়ে ওঠে শিশুকাল থেকেই। তিনিই ছিলেন প্রথম ভারতীয় মহিলা ইলাস্ট্রেটর, কমিক স্ট্রিপ এবং প্রচ্ছদ আঁকিয়ে। তাঁর লেখা পাঠ্যপুস্তক নিজে পড়, 'নিজে শেখ' বেশ জনপ্রিয়তা পায়। তাঁর কিছু উল্লেখ্য কাজ সতী, পূজারিণী, ইন্ডের সভায় বেহুলা, 'স্বামীর কঙ্কালের আলিঙ্গনরতা বেহুলা' ধুব, শচী ও ঐন্দ্রিলা, সাবিদ্রী ইত্যাদি।



পরিশেষে যে কথাটি না বললে বা লিখলে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায় তা হলো। এই রায় পরিবারের 'ডাক্তারি' সম্বন্ধ। উপেন্দ্রকিশোরের স্ত্রী বিধুমুখী ছিলেন প্রথম বাঙালি এবং দ্বিতীয় ভারতীয় মহিলা চিকিৎসক **কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়** এর বৈমাত্রেয় কন্যা। সেই সূত্রে সুকুমারের দিদিমা ছিলেন কাদম্বিনী। বিধুমুখী দেবী ছিলেন প্রখ্যাত সমাজ সংস্কারক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাঁর প্রথমা স্ত্রীর সন্তান। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর কাদম্বিনী বসু বিবাহ করেন তাঁর বিপত্নিক শিক্ষক দ্বারকানাথকে। এই ব্রাহ্ম পরিবারটিতে মুক্ত চিন্তা এবং আধুনিক মননের আনাগোনা ছিল যার আলোকে ধন্য হয়েছে সমগ্র বাঙালি জাতি।

প্রভুষা মহন্ত

ছোট গল্প ২

Sadness
index

প্রতিশ্রুতি

সাগুলা দাস্ত

ক্ষোভ

বিক্ষোভ

ক্ষোভ

কল্পনা

ক্ষোভ



ও

ননসেন্স রাজ্য

কল্লোল মণ্ডল

বর্ষ : ২০২৫-'২৬

দোলের দিন সবাই রং নিয়ে খেলছে। কিন্তু পাগলা দাশুর প্রেমিকা (কল্পনার) তাকে নিয়ে খেলেছে। পাতাই দেইনি সারাদিন। সেই দুঃখে চৈত্রের এক দুপুরে পাগলা দাশু হেডমাস্টারের গৌফ চুরির ফন্দি ফাঁদলো। যেমন ভাবা তেমন কাজ। স্কুলের প্রোগ্রামে সেইদিন ভীষ্মলোচন শর্মার গান গাইতে আসার কথা। দাশু ভাবলো এই তো তার সুবর্ণ সুযোগ। ফেরেন তোরস এর মতো সে সুযোগ মিস করতে চায়না। স্কুলের সবাই অনুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকবে আর দাশু থাকবে তার কাজে ব্যস্ত। রোজ বিকেলে টিফিন টাইমে মাস্টারমশাই একটু জিরিয়ে নেন। সেই সুযোগে গৌফ টা টুক করে কেটে পাঁচিল টপকে পালালেই হয়। অসম্ভব মুলিয়ানাতে গৌফ কাটতে যাবে দাশু; তখনই তারস্বরে ভীষ্মলোচন শর্মা গান শুরু করে। ব্যাস ধড়ফড়িয়ে উঠে যান হেডমাস্টার। পাগলাদাশুর হাতের কাঁচি তার গৌফের দিকে তাক করা আছে বুঝতে পারেন। তখনই “গৌফ গেছে চুরি” বলে চিংকার শুরু করেন। আর অন্য দিকে পাগলা দাশু শুরু করে ছুটতে। হেডমাস্টার যত জোরে চিংকার করছে তত জোরে ছুটছে দাশু। ভীষ্মলোচনের গান এ যেনো প্রলয় এসেছে মনে হচ্ছে। তাও দাশু ছুটছে তো ছুটছেই। সামনে পাঁচিল এলেই টপকে ঝাঁপ দেয় দাশু। তারপর সব অন্ধকার। সব কালো। পাগলা দাশু কতক্ষণ অজ্ঞান থাকে খেয়াল নেই। উঠে দেখে সে আর পৃথিবীতে নেই, নতুন এক দুনিয়ায় এসে পৌঁছেছে। যেখানে দিনের বেলায় চাঁদ উঠছে। রাতের বেলায় সূর্য। আর তারাগুলো ব্রাজিল না আর্জেন্টিনা কার জার্সি তে গিয়ে বিশ্বকাপের পর বসবে; সেই নিয়ে রীতিমতো WWE চালাচ্ছে। পাগলা দাশু দেখলো পাখিরা এখানে সাঁতার কাটে। আর আকাশে উড়ে বেড়ায় মাছ। এখানে মানুষ বই পড়ার আগে; বই মানুষকে পড়ে। ছায়া দিলে মেঘ ভাড়া চায়। আরশোলার পিঠে চেপে ঘুরে বেড়ায় তরুণ তুর্কিরা। এই এসব দেখতে দেখতে পাগলা দাশু এক নতুন পাড়ায় এসে পৌঁছায়। এই পোড়া দেশে দেখে “গণতন্ত্র”ও বর্তমান। কিন্তু “ধুরন্ধর 2” সিনেমার টুইস্ট এর থেকেও একটা বড় টুইস্ট আছে এখানে। এখানে আগে ভোটের রেজাল্ট বেরোয় আর তারপর হয় ভোট। পাড়ার নেতা “রামগরুড়ের ছানা” এর এক অদ্ভুত ফরমানও আছে। পাড়ার লোকেদের দিনের বেশিরভাগ সময় মনখারাপে থাকতেই হবে। তার কোটার sadness index পূরণ করতেই হবে। রামগরুড়ের ছানা দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টারও মেরেছে যে হাসলেই ট্যাক্স দিতে হবে। এই আজগুবি সব একুশে আইন দেখে পাগলা দাশু হকচকিয়ে যায়। সে ভাবে একটা পাগলের পাড়ায় এসে পৌঁছেছে। কিন্তু পাশের পাড়ায় গিয়ে বুঝতে পারে; পাড়াটা পাগল নয়;

গোটা দেশটাই পাগল। পাশের পাড়ায় নেতা হকোমুখো হ্যাংলা। নেতাবাবুর শখ কি জানো? নেতা বাবুর শখ হলো কথায় কথায় তর্কবিতর্ক শুরু করা। এক ভুক্তভোগী; নেতার কাছে কোনো সমস্যা নিয়ে এলে নেতাবাবু সমস্যার জন্য তিনশোটা স্লোগান লেখার

পরামর্শ দেন। নিজে বানান চারশোর বেশি কমিটি। আয়োজন করেন পাঁচশো-এর উপর বিতর্ক সভা। সমস্যা একদিন না একদিন মিটিয়েই দেবেন বলে পাড়ার দেওয়াল জুড়ে ছশো এর বেশি পোস্টার লাগান। আর সমস্যার সমাধান বেরোয় একটাও না। রাস্তা ভাঙুক; খরাবন্যা আসুক; নেতা তার পারিষদদের সঙ্গে বৈঠক থামান না।

“কাজে না বড়ো হয়ে কথায় বড় হওয়ার” স্বপ্ন দেখতে থাকে হকোমুখো হ্যাংলা। এই দেশে খবরের চ্যানেল চালায়

কুমড়োপটাশ। কেও কোনোদিন কুমড়ো পটাশ কে দেখেনি। কিন্তু কুমড়োপটাশ সবাইকে দেখেছে। কেও কুমড়োপটাশ কে চেনে না। কিন্তু কুমড়োপটাশের বিপক্ষে কথা বলতে ভয় পায়। বললেই সেই লোকটা কর্পুর হয়ে যায় অর্থাৎ কর্পুরের মতো উবে যায়।

পাগলাদাশু দেখে এই দেশে একই জিনিস চক্রাকারে হয়ে চলেছে। রোজ একই সমস্যা; একই স্লোগান; একই প্রতিশ্রুতি; একই ক্ষোভ বিক্ষোভ; আবার একই ভাবে সব

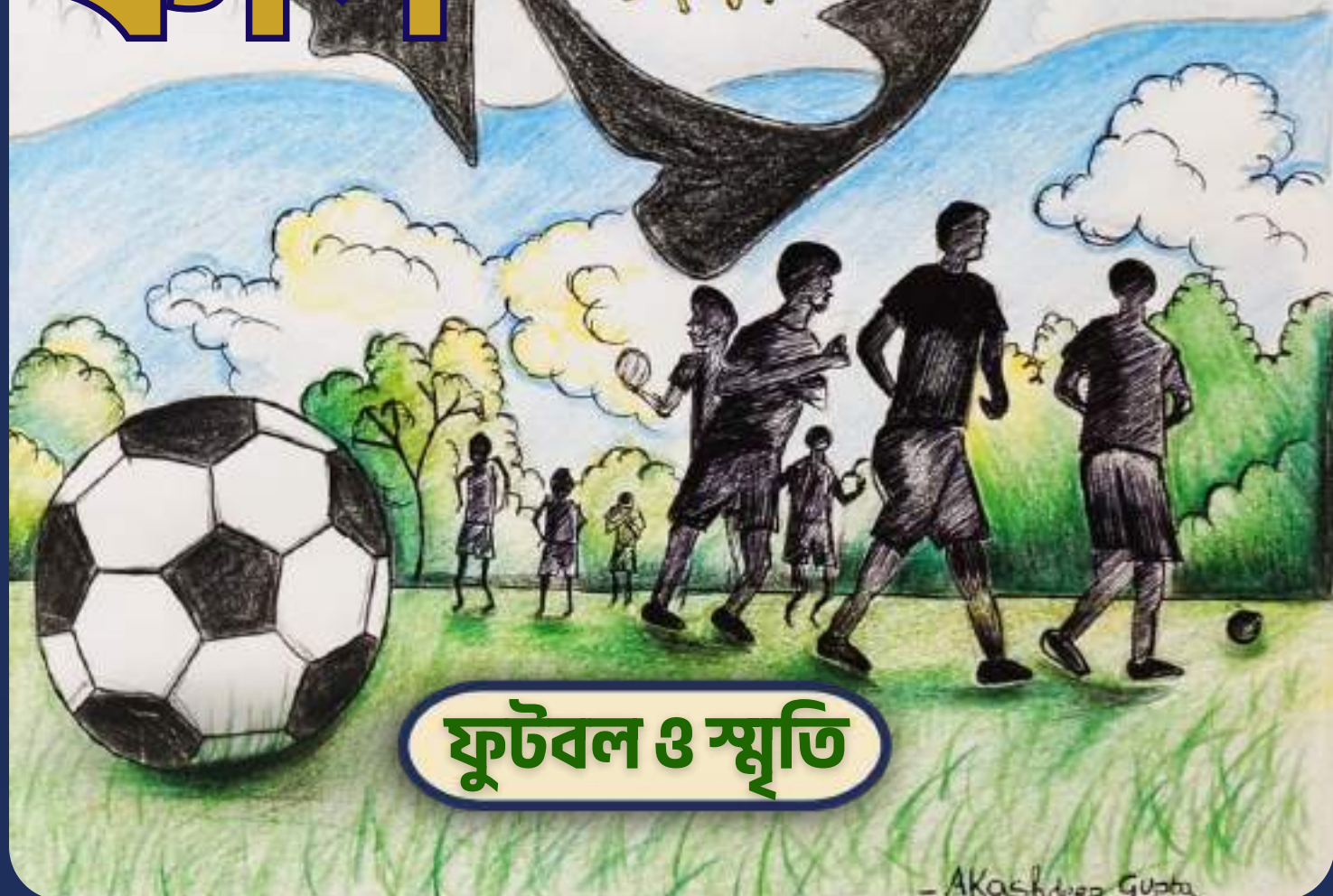
ভুলে যাওয়া। দেশে সবাই বাকি সবাইকে পাগল ভাবে। নিজেকে ভাবে না। পাগলা দাশু ভাবে ননসেন্স রাজ্য নামেই ননসেন্স নয়। কাজেও ননসেন্স।

হঠাৎ পাগলা দাশু দেখে তার গায়ে কোথা থেকে জল এসে পড়ে। ধড়ফড়িয়ে উঠে পাগলা দাশু বুঝতে পারে যে সে স্বপ্ন দেখছিল। পাঁচিল টপকে অজ্ঞান হওয়ার পর সেখানেই সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাকে ডেকে তোলে বছর ত্রিশের এক সুদর্শন যুবক। চোখে তার চশমা আর হাতে আবোলতাবোল বই। মুচকি মুচকি হাসছেন তিনি। দাশুর পাশে এসে কানে কানে বলে “স্বপ্নে যা দেখলে সেটা কি আসল পৃথিবীতে হচ্ছে না? তোমরাই ভাবো আর বের করো সমাধান। আমি আজ চললাম, কেমন?”

অন্যস্বাদে



বিশ্ব কাপ



ফুটবল ও স্মৃতি

- Akashdeep Gupta

৩০শে অক্টোবর—

ক্যালেভারের এক বিস্ময়।

সৃষ্টিকর্তার হাতে লেখা এক অনন্ত
রূপকথার জাল..!

দুই জাদুকরের জন্মদিন!!!

একজন ছন্দে ড্রিবল করেন আর
একজন ড্রিবলে লেখেন ছন্দ!

পায়ে আছে ফুটবল,
হাতে 'জগাখিচুড়ি',

সুতরাং প্রয়োজন নেই আর কিছুরই!

সারারাত কনসার্ট ঝিঁ-ঝিঁ আর

জোনাকে

দলছুট ট্রিবিউট



"সুকুমারাদোনাকে"

ফুটবল ফুটানি আর গোলমеле গোল কথা

SWAN BROTHER

(ছদ্মনাম)

ছি যাশির বিশ্বকাপ সবে শেষ হয়েছে। নেহাতই অল্প বয়েস তখন। জ্যাঠাতুতো দাদাদের মুখে প্রায়শঃই একটা নাম শুনতুম,- 'মারাদোনা,,,মারাদোনা,,,,'। 'তিনি কে অথবা কোন রাজকর্ম করেন,- সে ব্যাপারে কোনো পরিষ্কার আইডিয়া ছিলে না। তবে, এটা শোনা গেল,- তিনি ফুটবল খেলেন, দশ নং জার্সি পরেন এবং প্রায় একার কৃতিত্বে আর্জেন্টিনা কে বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন। দাদাদের দেখা দেখি এবার আমাদের 'ও কার্তিক' দা শর্টস প্যান্ট এবং স্যান্ডো গেঞ্জিতে আপন হাতে এলেবেলে অক্ষরে দশ নং লেখার ভারী তোড়জোড় চললে। ঝিরঝিরে টিভিতে রামায়ন/মহাভারত ছাড়া কোনো ভালো ছবি আসতো না। তাতে 'ই মাঝে মাঝে কে রাম, কে রাবন বোঝার উপায় থাকতো না আর ইনারা তো সম্পূর্ণ অপরিচিত! দাদাদের রানিং কমেন্টি আর আবছা অবয়ব দেখে মোটামুটি ধীরে ধীরে চিনতে শিখলুম মারাদোনা, বাতিস্ততা, বুরুচাগা'দের,,, 'এঁয়ারা তখন আমাদের কাছে স্বপ্নের রাজপুত্রের সব। খেলার ব্যাপারে বাড়ীতে ছিলে অবাধ স্বাধীনতা,,,। দেখতে দেখতে নব্বই-এর বিশ্বকাপ চলে এলে। দাদা'রা বড় পর্দায় খেলা দেখতে চললে আর আমাদের ভাগ্যে সেই সাদা কালো'র ঝিরঝিরে টিভি। তা'ও কেবলমাত্র ফাইনাল ম্যাচ দেখার অনুমতি মিললে। বাদাম, ছোলা ভাজা মিলে আগেভাগে বিস্তর রসদ জোগাড় করা হলো। খেলা সম্প্রচারিত হবে রাত্রী বারোটোর পরে (সম্ভবতঃ রিলে পদ্ধতিতে)। উৎসাহের শেষ নেই। সেইদিন সকাল সকাল খেয়ে সবাই রেডি হয়ে বসে আছি। ও বাবা! রাত্রী দশটা নাগাদ শুরু হলে ঝড় জল। অ্যান্টেনা-ফ্যান্টেনা কোথায় যে উড়ে গেল কে তার খোঁজ নেয়! এত সকালে ছোট মামা'র মুখে সেই হৃদয়বিদারক দিনকার, এত প্রতীক্ষা সব বিশ বাঁও জলে! সেইদিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে বহুক্ষণ ঘুম এলে না। ঘটনা'টা শুনলুম। আর্জেন্টিনা পরাজিত এবং

সম্ভবতঃ শেষ বিশ্বকাপের ম্যাচে মারাদোনা'র পুরস্কার লাল কার্ড। পরদিন ছিলে রবিবার। দাদা'রা বললে,- 'চল তোদের সবাই কে বড় পর্দায় রেকর্ডিং দেখিয়ে নিয়ে আসি ,,,, এটাই তো মারাদোনা'র শেষ বিশ্বকাপ,,, আর তো দেখতে পাবি না,,,।' বাড়ীতে অনুমতি পেতে খুব একটা বেগ পেতে হলো না। হাতের কাছ থেকে দেখলুম ফুটবল রাজপুত্রকে এবং হৃদয় নাড়া দিলে,- যখন দেখলুম লাল কার্ড দেখে কাঁদতে কাঁদতে সবুজ ময়দান থেকে বরাবরের মতো বিদায় নিলেন। সাক্ষী রইলাম আমরা, অগুণীত ফুটবল ভক্ত কচিকাঁচা'রা। মন ভারাক্রান্ত হয়েছিলে ঠিক 'ই,- কিন্তু আখেরে জয় হয়েছিল ফুটবল নামক খেলাটার। কেবল রাজপুত্রের বিশ্বজয় করে মহাকাব্য সম্পূর্ণ করলে ফুটবল বাদশা'র সাথে একাসনে বসতে পারতেন,- এই আক্ষেপ রয়ে গেল অবশ্যই। তবে ঐ দিন আবার নতুন নায়কদের চিনতে শিখলুম,- লোথার ম্যাথাউস,,, আনদ্রিয়াস ব্রেমে,,, রুডি ভয়েলার,,, যুরগেন ক্লিনসম্যান,,, নতুন নায়ক সব,,, বিশ্বাদ ভুলে বরন করতে কার্পণ্য করিনি ঐ দিন।

২

ছিলুম মারাদোনা ভক্ত,- এবার অন্য এক খেলোয়াড় মনের অজান্তে জায়গা করে নিলে। সে 'গাইকোচিয়া'-পরাজিত দলের গোলকিপার। সারা টুর্নামেন্ট জুড়ে অপ্রতিরোধ্য থেকে



ফাইনাল ম্যাচে পেনাল্টি শুট আউটে বল ফসকালে।
 স্নো মোশনের সেই মাটি ঘেঁষা ড্রাইভ বহুদিন পর্যন্ত
 মনে গেঁথে রয়েছিলে। আক্ষরিক অর্থে, এই বিশ্বকাপ
 তেমন কোনো মেগাষ্টারে'র জন্ম না দেখলেও,-
 অনেক কজন সুপারষ্টারে'র উত্থানের সাক্ষী হয়ে
 রইলে। এদের মধ্যে অগ্রগন্য ইতালির
 'স্কিলিচি', বেলজিয়ামের 'সিফো', ক্যামেরুনের
 'রজার মিল্লা', ব্রাজিলের 'কারেকা', ইংলন্ডের
 'লিনেকার', 'গাসকোয়েন', হল্যান্ডের 'রুদ গুলিট'
 আর 'মার্কো ভ্যান বাস্টেন', কলম্বিয়ার
 'ভালদোরামা', 'রেনে হিগুয়িতা' এবং অবশ্যই
 এশিয়ার ফুটবল শক্তি হিসেবে দঃ কোরিয়ার
 আত্মপ্রকাশ। কেন জানিনা ভালদোরামা'কে বড়
 ভালো লাগতো। সিন গার্ড বিনে ভাঁজ করে মোজা
 পরে ঝাঁকড়া চুলের মিড ফিল্ডারের স্টাইল'ই
 আলাদা লেভেলের। মনে মনে গায়কোচিয়া'কে
 নায়কের আসনে বসালেও, অনুকরন করতুম
 ভালদোরামা'কে। আবার জার্সিটা মন কেড়ে ছিলে পঃ
 জার্মানির। সাদার উপর ক্রশ রেনবো কালার,-কি
 ভালোয় না লাগতো! এবার তেমন জার্সি কোথায়
 পাই! হৃদয় হয়ে সারা কলকাতা টুঁড়েও ঐ জার্সি
 কোথাও পাওয়া গেল না। সেই যুগে ইস্ট বেঙ্গল, মোহন
 বাগান আর আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল ছাড়া অন্য জার্সি
 সহজ লভ্য ছিল না। তা'ও জামা জার্সি। আক্ষেপটা
 রয়ে যেতো। বাধ্য হয়ে, সাদা টি-শার্টের উপর কাঠ
 পেন্টিং-এর রং কিনে অনভ্যস্ত হাতে কারিকুরি
 চলতো। সেই এক পাগলামির যুগ! স্পোর্টস স্টার
 ম্যাগাজিন থেকে নায়কদের ছবি কেটে কেটে দেয়াল
 ভর্তী করতুম। শয়নে, স্বপ্নে 'গায়কোচিয়া,-সুতরাং দু-
 বেলা মন প্রান ঢেলে অনুশীলন চলতো। দাদাদের
 প্রশিক্ষণে, স্কুল অথবা বিভিন্ন প্রতিযোগিতা মূলক
 খেলাতে রীতিমতো সাফল্য পেতে শুরু করেছি
 তখন। ক্লাবে বড় মেজো বিভিন্ন শিল্পের সাথে 'ম্যান
 অফ দ্যা ম্যাচ' পুরস্কার গুলো যত্নের সাথে সাজিয়ে
 রাখা হতো। সাথে যুক্ত হলো ভেড়া এবং পোল্ট্রি
 মুরগী (আজকের মতো এতটা সহজলভ্য ছিল না)
 পুরস্কারের ওয়ান ডে খেলাতে চুপি চুপি অংশ গ্রহন।
 কোথাও পুরস্কার এক কুইন্টাল,, কোথাও পঞ্চাশ
 কেজি,, অধিকাংশ অংশগ্রহনকারী দলের নামে
 বেশ চিত্ত চমৎকারিত্ব ব্যাপারটি থাকতো। তখন
 ইরাক-ইরানের যুদ্ধের দামামা বাজতে
 চলেছে,, মুহম্মদ মার্কিনী বোমার হামলায় সাদ্দাম

সাহেবের যায় যায় অবস্থা। হেন কালে, একটি
 দল নাম দিলে,- 'মার্কিন স্কেপনাস্ত্র বি',,, এমনি
 মজার নাম সব,,। যেহেতু ছোটদের দল,- তাই
 আমরা ক্লাবের মূল নামের শেষে ব্র্যাকেটে 'ইয়ং'
 শব্দ লিখে কাজ চালাতুম। তাতে' ও না কুলোলে
 'জয়েন্ট হান্টার'- 'এ', 'বি' প্রভৃতি নামে অংশ
 গ্রহন করা হতো। এমন ও হয়েছে ফাইনালে
 যুযুধান দুই ফাইনালিস্ট দলের নাম জয়েন্ট
 হান্টার - 'এ' বনাম জয়েন্ট হান্টার - 'বি'। কোনো
 ছাড় নয়, মূল দলে জায়গা পাওয়ার আশায় 'বি'
 দলের ছেলেরা পঃ জার্মানি আদর্শে উদ্বুদ্ধ
 হিটলারি ব্লিৎস ক্রিগ বাহিনীর মতো তেড়ে ফুঁড়ে
 আক্রমণ চালাতো। আমি ছিলাম 'এ' দলের
 গোলকিপার। সারাক্ষণ তটস্থ হয়ে তক্কে তক্কে
 থাকতে হতো। প্রায় বার'ই পেনাল্টি শুট আউট
 পর্যন্ত গড়াতো। তখন আমার কাজ মোটামুটি
 শেষ, শুধু পেনাল্টিতে একটা গোল করতে হবে
 এই যা! এবার গোল কিপিং-এ অন্যজন
 দাঁড়াবে,- তাহলেই নায়কের মতো গ্রামে ফিরতে
 পারবো। কোনো দিন মিস করতুম না বলে
 সর্বশেষে রাখা হতো আমাকে। আজো মনে
 পড়ে, ফুউরররর শব্দে রেফারির শেষ বাঁশি
 বাজার সাথে সাথে'ই প্রবল 'হিপ্ হিপ্ হুররে'
 শুরু হতো। কোনো ক্রমে পুরস্কার গ্রহনের ওয়াস্তা!
 তারপর'ই সোজা সদলে ছুটতুম স্টুডিও'তে,-
 সবাই ভালদোরামা'র মতো চুল এলো মেলো
 করে পোজ দিতুম।

৩

দিব্যি কাটছিল দিন গুলি। আশপাশের সমস্ত
 টুর্নামেন্ট-এ অংশ গ্রহন করি আর এন্টার
 পুরস্কার জিতে নিয়ে আসি। প্রায় নেশার মতো
 হয়ে গিয়েছিলে ব্যাপারটা। এবার এলো সে দিন।
 অধুনা ঝাড়খন্ডের ঢাঙা কমল ক্লাবের সাথে
 ফাইনাল ম্যাচ। বিপক্ষে সেরা সেন্টার ফরোয়ার্ড
 'রন্টু' (নাম পরিবর্তীত)। বেলপাহাড়ীর
 মুড়ানশোলের বিখ্যাত মাঠ। পাশেই RGTS
 (রেসিডেন্সিয়াল ট্রাইবেল' গার্লস স্কুল)-এর
 আবাস ভবন। বিকেল বেলা। ছাদ ভর্তী সুন্দরীরা।
 ময়দানে এলাকার বিদগ্ধজনদের সাথে আলাপ
 পর্ব মিটলে পরে খেলা শুরু হলে। বুকের মধ্যে
 আশা-নিরাশার দোলাচল। গায়কোচিয়া'র মতো
 হবে না তো! সারা টুর্নামেন্ট জুড়ে অপ্রতিরোধ্য

থেকে গোল খেলে আর দেখতে হবে না! দারুন খেললে আমাদের দুই ডিফেন্ডার বিকাশ'দা আর সুধীর'দা। বলতে গেলে রন্টু'কে নখ দাঁত বের করার সুযোগ পর্যন্ত দেয় নি। খেলা মনে হয় পেনাল্টি শুট আউটের দিকেই এগোচ্ছে। খেলা শেষ হবার মিনিট দুই আগে নিজেদের মধ্যে পাস খেলতে গিয়ে সুধীর'দা ভুল করলে। বিপক্ষের উইং ফরোয়ার্ড বল পেয়েই পেনাল্টি বক্স লক্ষ্য করে উঁচু করে ক্লিয়ার করলে। দূরন্ত গতিতে রন্টু ছুটে এলে। সামনে আমি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই। ক্যাপ্টেন বাবলু'দার চিৎকার কানে এলে, -'এঙ্গেল,,,,,এঙ্গেল,,,,,, অর্থাৎ সামনে এগিয়ে দুরূহ কোণ সৃষ্টি করতে বলছে। বল তখন প্রায় হাত দশেক উপরে। সেই সঙ্গীন মুহুর্তে'ও আমার তাৎক্ষণিক ভাবে মনে হয়েছিলে রন্টু নির্ঘাৎ ওয়ান টাচ ব্যাক ভলি মেরে জাল ফাটিয়ে দেবে,

পূর্বেও এমত কায়দায় বহু গোল করেছে, তবে এইবার'টি আর হিরো হতে দিচ্ছি না বাছাধন'কে। কি মনে হলো,,,,, রন্টু কিছু বুঝে ওঠার আগেই ফুট ছয়েক উঁচুতে, চকিতে পেছন ফিরে, শরীর ছুঁড়ে বাঁ পায়ে ফলস্ মেরে ডান পায়ে বল লক্ষ্য করে ব্যাক ভলি দি। বলটা বিশুদ্ধ ভাবে ক্লিয়ার করতে

পারলে দারুন দর্শনীয় হতো ব্যাপারটা, -চাই কি হিরো হয়ে যেতুম, বিশেষ করে ছাদ ভর্তী সুন্দরীরা যেখানে! বেচারার রন্টু, আকস্মিক প্রতি আক্রমণে চটজলদি বল এবং মাথা সরিয়ে ফেলতে পারলেও ,দেশীয় মুচি'র বানানো কাঁচা চামড়ার স্পাইক জুতোর জোরালো সংঘর্ষ এড়াতে পারলে না। সিধে বাঁ কাধের নিচের অংশে লাগলে। বেশ কিছুটা দৌড়ে, বল ছেড়ে বুক চেপে বসে পড়লে। আমি হতভম্ব! দু-দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে মারামারি বেধে যাওয়ার উপক্রম। কর্ম কর্তারা দৌড়ে এসে ব্যাপারটি ম্যানেজ করলে। মারাত্মক ফাউল! পরিষ্কার পেনাল্টি। রন্টু'কে ধরাধরি করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। এবার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পেনাল্টি, -তাই গোল পোস্টের তলায় আমাকেই দাঁড়াতে হলো। অনিচ্ছাকৃত অপরাধ বোধে মন তখন এমনি বিষন্ন যে, -বল আটকানোতে

তেমন কোনো উৎসাহ পেলুম না, স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলের লাইন ক্রশ দেখলুম কেবল। ফুরররর্ করে লম্বা বাঁশি বাজলে। খেলা শেষ। বিজয়ী ঢাঙা কমল ক্লাব। দারুন অপরাধে ,মুখ নিচু করে মাঠ ছাড়ি। দর্শক গণের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে বিভিন্ন মন্তব্য কানে এলে, -'ইং,,,,, বক্সের মধ্যে তোমাকে গোল করতে দেবে?',,,,' গোলকিপার যেখানে পোস্ট ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে,,,,, রন্টুর ওখানে বুক দিয়ে বল রিসিভ করা উচিত হয় নি',,,,, 'মারাত্মক ফাউল,,,,, রন্টু'কে আরো খেলতে হয়েছে'!,,,,, ইত্যাদি ইত্যাদি,,,,,। সাইকেলের পেছনে বসিয়ে কোচ মঙ্গল'দা সান্ত্বনা দিতে দিতে গেলে, -'খেলাতে এমন ধারা হয়'ই,,,,, এছাড়া তোর উপায় কি ছিল,,,,,!'

“
**'দেখ্ বাবু রাফ খেলে
কখনোও হিরো হওয়া যায়
না মারাদোনা'র ভক্ত তো তুই
কোনোদিন দেখেছিস
মারাদোনা' কে ফাউল
করতে! বরঞ্চ মার খেতো
বিপক্ষ দলের কাছে।'**
”

৪

বাড়িতে' ও আপ্যায়নের কোন সম্ভাবনা রইলে না। প্রায় লুকিয়ে লুকিয়ে ঢুকতে হলো। মাহিন্দার শিবু কাকা প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে অন্যতম। গবাদি পশুর জন্য মিহি করে জাবনা কাটতে কাটতে বললে, -'দেখ্ বাবু,,,,, রাফ খেলে কখনোও হিরো হওয়া যায়

না,,,,, মারাদোনা'র ভক্ত তো তুই,,,,, কোনোদিন দেখেছিস মারাদোনা'কে ফাউল করতে!,,,,, বরঞ্চ মার খেতো বিপক্ষ দলের কাছে,,,,,।' ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলি, -'সত্যি বলছি কাকা,,,,, আমার লক্ষ্যটা ছিল বল,,,,, সে যে আচমকা বুক দিয়ে রিসিভ করবে, -সেইটে আদপেই আন্দাজ করতে পারি নি। ভেবেছিলাম এক দর্শনীয় সেভ করবো,,,,,।' কাকার কাছে কি করে স্বীকার করি, -আসল গোলমালটা বেধে ছিলে মাঠ লাগোয়া ছাদের উপর শতাব্দী রায়েদে'র উপস্থিতি। অন্য কোনো মাঠ হলে নিশ্চিৎ ভাবেই হাত দিয়ে অথবা অন্য কোনো উপায়ে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করতুম। কিন্তু, কি করে স্বীকার করি, -আমি করি নি, হরমোন আমায় করিয়েছে! রাত্রিও বহুক্ষণ বিছানায় এপাশ ওপাশ করেও ঘুম এলে

না।যখনি মনে পড়ে, সেই অনাহার ক্লিষ্ট চাবুকের মতো ছিপছিপে দেহটা,-আপনা থেকেই অশ্রু ভরে আসে চোখে।শুয়ে শুয়ে অনবরত প্রার্থনা করি,- 'ঠাকুর, দেখো তাকে,,,,তার যেনো কোন ক্ষতি না হয়,,,,।'

পরদিন জ্যেষ্ঠু এলে হাল্কা গোলাপি নেশা করে।এটা সেটা কথাবার্তার পর জানিয়ে দিলুম, গোলকিপার হিসেবে আমার অপারগতা।স্মিত হেসে জিজ্ঞাসিলে,- 'তাহলে কি করবি,,,,খেলা ছেড়ে দিবি,,,,?' প্রত্যুত্তরে বলি,- 'আমি ডিফেন্স-এ খেলতে চাই,,,,।'- আর সেখানেও যদি এমত ঘটনা ঘটে!' -আশ্চর্য্য হয়ে জ্যেষ্ঠু জিগায়।

তাড়াতাড়ি বলি,- 'বাকিটা আমি জানিনে,,,,,মোট কথা গোল কিপিং আর করতে চাই না,,,,,।'-

'আচ্ছা,,,,বেশ,,,,,তার আগে তোকে একটা গল্প শোনাই,,,,।'জ্যেষ্ঠু এবার শুরু করলে,-

'বুঝলি,,,,,আমরা তখন বিষ্ণুপুর কলেজে পড়ি,,,,,বার্ডওয়ান ইউনিভারসিটি'র সাথে রাঁচি ইউনিভারসিটি'র ভলিবল ম্যাচ,,,,,টানটান উত্তেজনা,,,,,সবার নজর বাঁকুড়া ক্রিস্চান কলেজের এক ছিপছিপে লম্বা ছেলেটির উপর,,,,,তার বিশেষত্ব,-সে স্ম্যাশে'র বল পর্যন্ত লিফ্ট করে তুলতে পারে,দু-হাতে স্ম্যাশ করতে পারে,সাথে সব পজিশনে খেলতে পারে,,,,কলেজে তার নাম সব্যসাচী,,,,যথার্থ'ই তৃতীয় পান্ডব ছিল সে,,খেলা শুরু হলো,,,,খেলা ১-১ এগোচ্ছে,,,,কেউই কোনো অংশে কম নয়,,,,শেষ পয়েন্ট নির্ধারক সার্ভিস ব্রেকে সেই ঘটনা ঘটলে,,,,বাঁ দিকের নেট ঘেঁষে সেই ছেলেটির বাম হাতের জোরালো স্ম্যাশ বিপক্ষের প্লেয়ার দুজন ওয়াল করতে উঠলে বটে, তবে তৎক্ষণাৎ ব্যাথায় ককিয়ে উঠে ধরাশায়ী হলে,,,,জোরালো সটে একজনের তর্জনী এবং মধ্যমা ভেঙ্গে লটপট আর অপর জনের কঙ্গি।বার্ডওয়ান জয়ী।তবে ,এর পরে কি হলো কে জানে,সেই ছেলেটি আর কোনোদিন খেলতে নামে নি,,,, বরাবরের জন্য মাঠ থেকে হারিয়ে গেল বুঝিবা। আন্দাজ করতে পারিস,কে সেই ছেলে,,,,।'শেষে ক্ষুদ্র এক নাসিকধ্বনি'র সাথে শেষ করলে এই বলে,- 'খেলায় ও'রম হয়,,,,,তা'বলে খেলা ছাড়ার কোনো যুক্তি নেই,,,,,।'

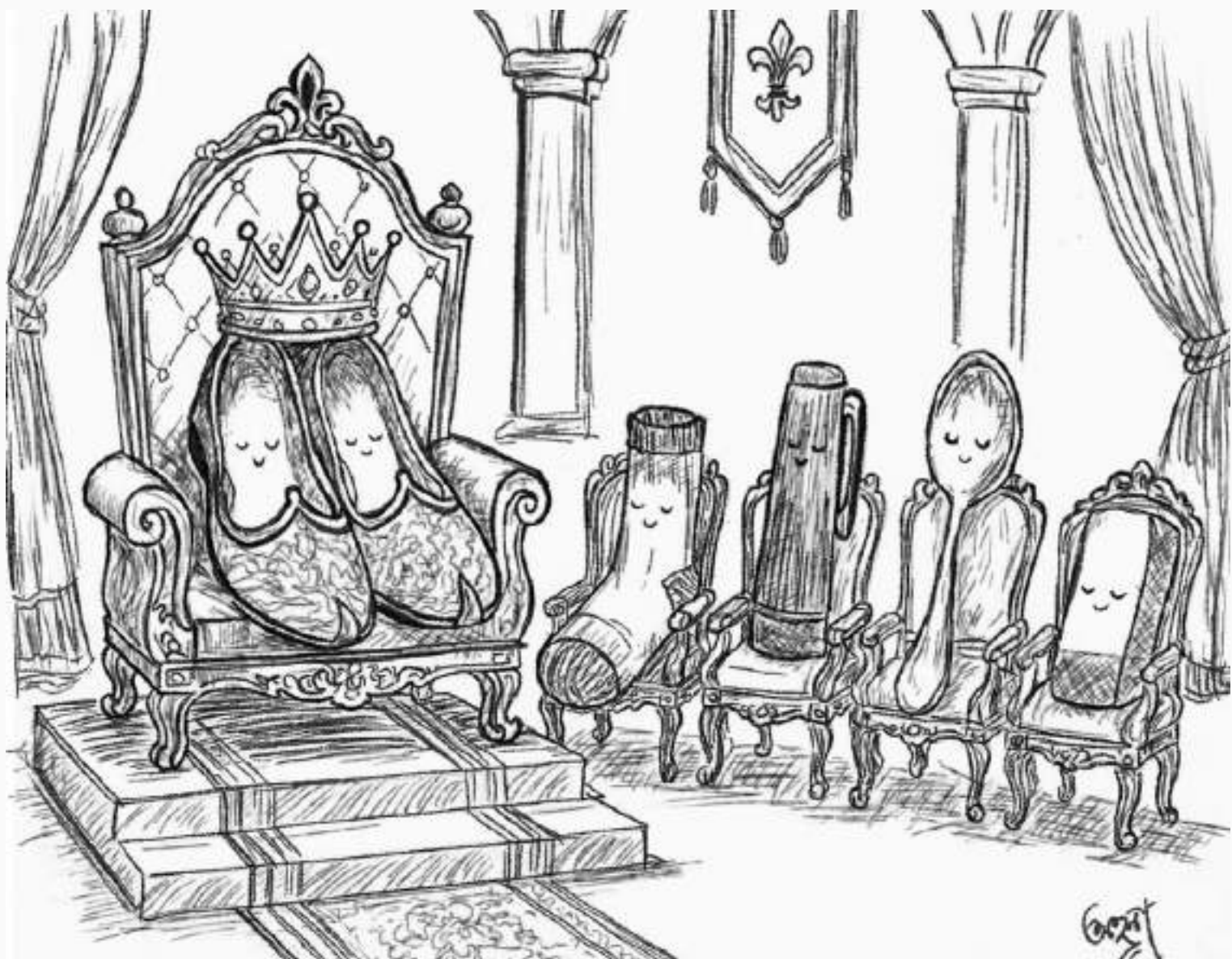
নাহ্ !খেলা আর ছাড়িনি ঠিক'ই ,-কিন্তু অতিমাত্রায় সাবধানী হতে গিয়ে ডিফেন্সে'ও খুব একটা সুবিধে করতে পারতুম না।তার মধ্যে অবিশ্যি গতি'ও এক



কারণ।আজ কত যুগ পরে,আজো মনে পড়ে রন্টু নামের অসাধারন প্রতিভাবান খেলোয়াড়'কে।কত চেষ্টা করেছি দেখা করার। দেখা পাই নি। ময়দান থেকে ভোজবাজির মতো উবে গেলো যেনো!আজো'ও প্রতি বৎসর,'জয়েন্ট হান্টার' ক্লাবের উদ্যোগে অথবা অন্য ক্লাবের উদ্যোগে এবং এলাকাবাসীর আর্থিক সহায়তায় পিতৃদেব নামাঙ্কিত ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন হলে -আমি বরাবর ২৩ খানা রৌপ্য মেডেলের অর্ডার দি' অর্থাৎ বিজয়ী এবং বিজিত দলের সবার জন্য সাথে একটা একস্ট্রা,,,,,আমার কাছে সব সমান,,,,সবাই চ্যাম্পিয়ন,,,,,কারুর কোনো ছোট্টো হৃদয়ে আঘাত দিতে চাই না আমি,,,,,আর একস্ট্রা মেডেল তোলা থাকে ম্যান অফ দ্যা টুর্নামেন্ট রন্টুদে'র জন্য,,,,,কতকাল ধরে খুঁজছি,,,,,অদ্যাবধি খুঁজে পেলুম না,- এইটেই যা দুঃখের,,,,,একসময় মেডেল জমতে জমতে ১৭-১৮ খানাতে দাঁড়ায়,,তবু'ও সেই মানের খেলোয়াড়ের আর দেখা পাই না,,,,,মনের কোণে দুখের বোঝা ভারি হয় আর চকচকে মেডেলে হাত বুলোতে বুলোতে সেকালের সুখ স্মৃতি রোমন্থনে ব্যাস্ত হয়ে পড়ি,,,,,।

ঃসমাপ্তঃ

ছোট গল্প ৩



হারানো জিনিষের স্বাধীন রাজ্য

সালোনি ভট্টাচার্য

বর্ষ: ২০২৫-'২৬

মা নুষের ধারণা, জিনিসপত্র হারিয়ে যায়।

এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

আসলে জিনিসপত্র নিজেরাই চলে যায়।

পৃথিবীর একেবারে অজানা প্রান্তে আছে "হারানগর" নামে একটি রাজ্য। সেখানে বাস করে হারিয়ে যাওয়া সব জিনিসপত্র।

এক পায়ের মোজা, কলমের ঢাকনা, চুলের ক্লিপ, ছাতার খাপ, টিফিনবাক্সের চামচ, এমনকি সেই রহস্যময় রাবারটাও—যেটা গত মঙ্গলবার পর্যন্ত টেবিলেই ছিল।

হারানগরের রাজা হলেন মহামান্য এক-পাটি-জুতো চতুর্দশ।

তার অপর পাটি বহু বছর আগে মানুষদের দেশে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সেই থেকে দুই ভাইয়ের মধ্য কথা বন্ধ।

প্রতি বছর হারানগরে "মহা-অনুপস্থিতি উৎসব" হয়।

সেই উৎসবে সবাই নিজের হারিয়ে যাওয়ার গল্প বলে।

একটি পেনসিল বলল,
—আমাকে কেউ হারায়নি। অঙ্কের খাতা দেখে আমি নিজেই পালিয়েছিলাম।

একটি চামচ বলল,
—আমাকে দোষ দিও না। আমি শুধু ফ্রিজের পিছনে একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম।

একটি রুমাল গর্ব করে বলল,
—আমি তিন বছর ধরে নিখোঁজ। এ বছরের "সেরা অদৃশ্য পুরস্কার" আমারই পাওয়া উচিত।

সবাই হাততালি দিল।

হঠাৎ সভার মাঝখানে এক বৃদ্ধ চশমা উঠে দাঁড়াল।

সে বলল,
—তোমরা সবাই নিজেদের নিয়ে গর্ব করছ, কিন্তু জানো কি, মানুষরা আমাদের খুঁজে না পেলে কী করে?

—কি করে?

—নতুন কিনে আনে!

সঙ্গে সঙ্গে সভাঘরে নিস্তব্ধতা নেমে এল।

একটি মোজা কেঁদে ফেলল।

একটি কলম ফিসফিস করে বলল,
—তাহলে কি আমরা বদলি হয়ে গেছি?

রাজা এক-পাটি-জুতো গম্ভীর হয়ে গেলেন।

অনেকক্ষণ ভেবে তিনি ঘোষণা করলেন—

—আজ থেকে বছরে একদিন সবাই নিজ নিজ মানুষের কাছে ফিরে যাবে।

—কেন?

—কারণ কেউ যদি আমাদের খোঁজে, তার মানে সে এখনও আমাদের কথা মনে রেখেছে।

সেই থেকে অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে শুরু করল।

বছরের কোনো একদিন হঠাৎ দেখা যায়—

বহুদিনের হারানো কলমটি বইয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

পুরোনো রুমালটি আলমারির কোণে হাসছে।

চুলের ক্লিপটি বিছানার তলা থেকে উঁকি দিচ্ছে।

মানুষ ভাবে, "আরে! এটা এখানে এল কী করে?"

কিন্তু হারানগরের বাসিন্দারা জানে—

ওটা 'ফিরে আসা'।

কারণ হারিয়ে যাওয়া আর ভুলে যাওয়া এক জিনিস নয়।

যতদিন কেউ মনে রাখে, ততদিন কোনো কিছু সত্যিই হারায় না।



অগুগল্ল প্রতিযোগিতা

ডিউটি শেষ করে রাত প্রায় দেড়টা নাগাদ ডক্টরস্ কোয়ার্টারে ফিরল বিপ্লব।
শীতের রাত। একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। গ্রামের কাঁচা রাস্তা জনশূন্য। চারপাশে
জমাট বাঁধা নিস্তব্ধতা।

সারাদিনের ক্লান্তি চোখে নিয়ে বিপ্লব যখন ঘুমোতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন
ঘড়ির কাঁটায় রাত ৩ টে।

হঠাৎই—দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ।

এই গভীর রাতে কে আসতে পারে? বিস্ময় আর কৌতূহল নিয়ে দরজাটি
খুলতেই সে দেখল...

**অগুগল্লর শুরু দিয়ে দেওয়া হল, বাকিটা পাঠক
দের লেখার জন্য
প্রথম তিনটি লেখা ছাপা হবে পরের সংখ্যায়...**

'৮০'-তে জন্মিও

"আমি **ডাক্তার আশিস মন্ডল** 1986 -87 ব্যাচ এর BMCian. আমাদের সময়ে **Spectra** নামে হাতে লেখা একটা দেয়াল পত্রিকা বের হতো। সেই পত্রিকা র একটি সুকুমার সংখ্যা বার করেছিলাম আমরা।কলেজের একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ এ দেখলাম তোমরাও সুকুমারকে নিয়ে ভাবছো। spectraএর জন্য একটা ছড়া লিখেছিলাম সেটা পাঠালাম। পুরোনো দিনের স্মৃতি"



সুকুমার রায়ের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে এটা হয়েছিল।
মানে ১৯৮৭ সাল।

Spectra তখন কলেজ ম্যাগাজিন হিসেবে
বেরোত(বার্ষিক) ছাপা হয়ে আর হাতে লেখাটা থাকতো
কলেজ ক্যান্টিনের দেয়ালে।

পত্রিকার এই সংখ্যায়

কবিতা

শব্দের ভেলায়, ছন্দের রেশে,
মনের খেয়ালে, স্বপ্নের দেশে...





আবোল আবোল ও নিমেরিক পাথর করে
ছন্দ বাঁধলেন আমাদের কবিরা

অঙ্কন: সুপ্রতিম রায়

ব্যঙ্গকবির বরদান

~ অনুষ্কা সাহা

বর্তমানের জীর্ণ ও অচল শিক্ষাব্যবস্থা, এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ আমার
মনকে গভীরভাবে ব্যথিত করছিল।

সেই একরাশ হতাশা ও অবসন্নতা নিয়ে ঘরের আলো নিভিয়ে শয্যাশায়ী
হলাম।

চোখের পাতা এক করতে না করতেই এক অদ্ভুত দৃশ্য!

একি! আমার সামনে দাঁড়িয়ে স্বয়ং মজার কবি সুকুমার রায়!!

ভূতের রাজার মতো আমায় দিয়ে গেলেন বরস্বরূপ এক মজার কবিতা।

কবিতাটি বর্তমান স্থবির শিক্ষাব্যবস্থার গালে সপাটে চর কষায়।

ঠিক যেমন, "আবোল তাবোল"-এর আপাত হাস্যরসের আড়ালে কলমের
খোঁচায়, ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা ও সমাজের অসঙ্গতিকে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের মাধ্যমে
তুলে ধরেছিলেন।

চোখ খুললে, চারিদিক নিস্তব্ধ।

কানে বাজছে কবিতাটি।

মুহূর্তের মধ্যে লিখে নিলাম ডায়রির পাতায়—



এই দেখো পেন্সিল, iPad এ হাতে,
এই দেখো ভরা সব ChatGPT r লেখাতে।।
Notification আসে যেই,
Telegram খুলি সেই।।

ম্যাট্রিকে উনিশটি বার
বসেছিল গঙ্গারাম,
ডাক্তার সে মস্ত আজ—
প্রশ্ন জানা এমন কি আর কঠিন কাম!

গোঁফ চুরি করেও শেষে
পায়নি কোনো সাজা,
সবটা দেখেও ঘুমিয়ে ছিল
বোম্বাগড়ের রাজা।

রাজার শালা কেষ্টমোহন
উফফ কি "ডানপিটে" ছেলে!
একুশে আইন ভাঙলে পরেও,
যায় না কভু জেলে।

পঁচা আঁর পঁচানীর
সম্পর্ক ছিল পাকা,
'১৬ সালে হঠাৎ দেখি
বদলে গেল খাতা!

ধনকুবের বাবুমশাই শখের
বোটে চড়ে,
ডিগ্রি আনতে পাড়ি দেন, সাত সমুদ্র দূরে।।
গরিব মাঝি শিক্ষার অচল
জাঁতাকলে পড়ে,
পিষ্ট হয়ে স্বপ্ন হারায় জীবনেরই ছলে।।

অঙ্কন: অনুষ্কা সাহা

স্কুলের যুগে সুকুমার ~ সুরজিৎ রায়

কলম ফেলে কীবোর্ড হাতে,
কবি বসেন হায়,
"আবোল-তাবোল" পোস্ট করতেই-
কমেন্ট, "এ তো AI!"

হাঁসজারু রিল বানিয়ে
ভাইরাল রাতারাতি,
বকচ্ছপের ভাইরাল গান শুনে
নৃত্যে মাতে সাথী।

পাগলা দাশু মিম বানিয়ে
হাসায় সকাল-সাঁঝ
লাইক না পেয়ে মন খারাপ,
বদলে ফেলে সাজ।

ফিডে ভাসে আজগুবি সব,
ট্রেন্ডের নেই শেষ,
সত্যি কোথায় হারিয়ে গেল—
ভিউ-ই এখন রেশ।

সুকুমার আজ থাকলে বোধহয়
হেসেই বলতেন, হায়!
আবোল-তাবোল কমই এখন-
স্ক্রলটাই সর্বনাশ!"



অঙ্কন: সুপ্রতিম রায়

ডিজিটাল সুকুমার ~ স্নিতা দাস

আবোল-তাবোলের সেই মানুষটা
ফিরলে যদি আজকের দিনে,
হাঁসজারুকে খুঁজে পেতেন
হয়তো কোনো মুঠোফোনের স্ক্রিনে।

হযবরলের সেই অদ্ভুত রাস্তায়
চলত না আর গরুর গাড়ি,
পিক্সেলের পাখা মেলে উড়ত
ডেটাভরা কত কল্পনার পাড়ি।

কুমড়োপটাশ গল্প বলত
হয়তো কোনো পডকাস্ট জুড়ে,
আর বকচ্ছপের তর্কগুলো
ভাইরাল হতো মুহূর্ত ঘুরে।

তবু যতই বদলাক সময়,
যতই বদলাক পৃথিবীর রূপ,
শিশুমনের সেই বিস্ময়টুকু
আজও তো সবচেয়ে বড় ধনরূপ।

কারণ সুকুমার শুধু একজন নন,
তিনি এক অনন্ত কল্পনার দ্বার,
তাই প্রযুক্তির এই যুগেও
বেঁচে থাকেন, ডিজিটাল সুকুমার।

পাসওয়ার্ড প্যাঁচাল

~অব্র কিশোর ভট্টাচার্য

একদিন নেটে লগ-ইন করে
সুকুমার রায় এলেন
হযবরলের পাসকোডটা
এআইকে দিয়ে ফেলেন!
হুকোমুখো হ্যাংলা তখন
খোলে ইউটিউব চ্যানেল
"আজকে আমরা চলেছি শিখতে
চাঁদে চাষের প্যানেল!"
কুমড়োপটাশ ইনফ্লুয়েন্সার
রোজই নেচে রিলস বানায়,
হুকোর জলে আলতা গুলে
ঠোঁটে-গালেতে লাগায়।
বকচ্ছপটা নিউজ পড়ে –
"সূর্য নাকি ঠান্ডা!"
কমেন্ট বক্সে লাগে ঝগড়া
ভিউজ বাড়ে, ওটাই তো মেইন ফান্ডা!
এআই বসে কবিতা লেখে –
"ঘোঁড়ার ডিমের পাকা দাড়ি"
মিনিটেতে লক্ষ লাইক
খুড়োর কলে চড়ে হেসে, যায় চলে সে বাড়ি।
হঠাৎ কবি বলেন হেসে,
"এ আর নতুন কী?"



আমার দেশে আবোলতাবোল
ছিল তো চিরদিনই..
তফাৎ শুধু এটাই জেনো
ছিল না তখন মোবাইল
আগে পাগল দশজন ছিল
এখন সেটা সবাই!"
বলে কবি লগ-আউট করে
তারার দেশে যান,
নীচে তখন ট্রোলের ছলে
চলছে মহাযুদ্ধখান!
কেউ বা বলে, "কবি স্বপ্নবাজ!"
কেউ বলে – "খুউব বাস্তব!"
সুকুমারের ভুতটা বলে হেসে –
"দুটোই কিন্তু আসল!
হযবরল টা বই ছিল আগে,
এখন তো গোটা দেশ,
আবোলতাবোল আপডেট হয়ে
চলছে ভালো বেশ!"



ডিজিটাল বিড়াল - রুমাল

~ লি জা আ ফ সা না

বিড়ালটাকে রুমাল করে আপলোড দিলো কে?
সকালে ছিলো মাছের পিছে, বিকেলবেলা নেটে।
গোঁফ দুটিকে এন্টেনা করে ধরলো ওয়াই - ফাই ডেউ,
মিউ মিউ করে মেসেজ পাঠায় "মাছটা পাঠাও কেউ!"
রুমালখানা স্ক্রল করতে গিয়ে হয়ে গেলো ব্যাং,
ব্যাঙমশাই রিল করতে গিয়ে পেলেন লক্ষ লক্ষ ঠ্যাং।
ছাতাটাকে চামচ করে, চামচটাকে ঘুড়ি,
ঘুড়ি আবার গ্যালারিতে তুলে রাখলো ছবির বুড়ি।
মোবাইলখানা ফুলদানি, ফুলগুলো সব অ্যাপ,
একটা গোলাপ লগইন চেয়ে করলো ধুমধাড়াঙ্কা র্যাপ।



চশমাখানা ড্রোন হয়ে যায়, উড়ে দেখে চাঁদ,
চাঁদমশাই পাসওয়ার্ড চেয়ে করেন বড় ফাঁদ!
বালিশখানা লরি হলো, লরি হলো চাবি,
চাবিখানা গান গাইতে গাইতে খেয়ে ফেললো দাবি!
এআই মশাই হিসেব কষেন "সবই সম্ভব ভাই!"
ছন্দ তাল অনুভূতি হেসে বলে "তা মোটেই নাই!"
তর্ক যখন জমলো ভীষণ ডিজিটাল দরবারে,
রুমাল নাকি বিড়াল হলো "কেউ না জানে কারে!"
শেষে দেখি মোবাইলখানা হয়ে গেছে তাল
তালগাছে বসে মেইল করছে "বিড়াল নাকি রুমাল?"
এইটুকুই পারি শুধু ছন্দ মেলাতে ভাই,
বহুদিন পর মজার টপিক ,তাই - রে নাইরে নাই।

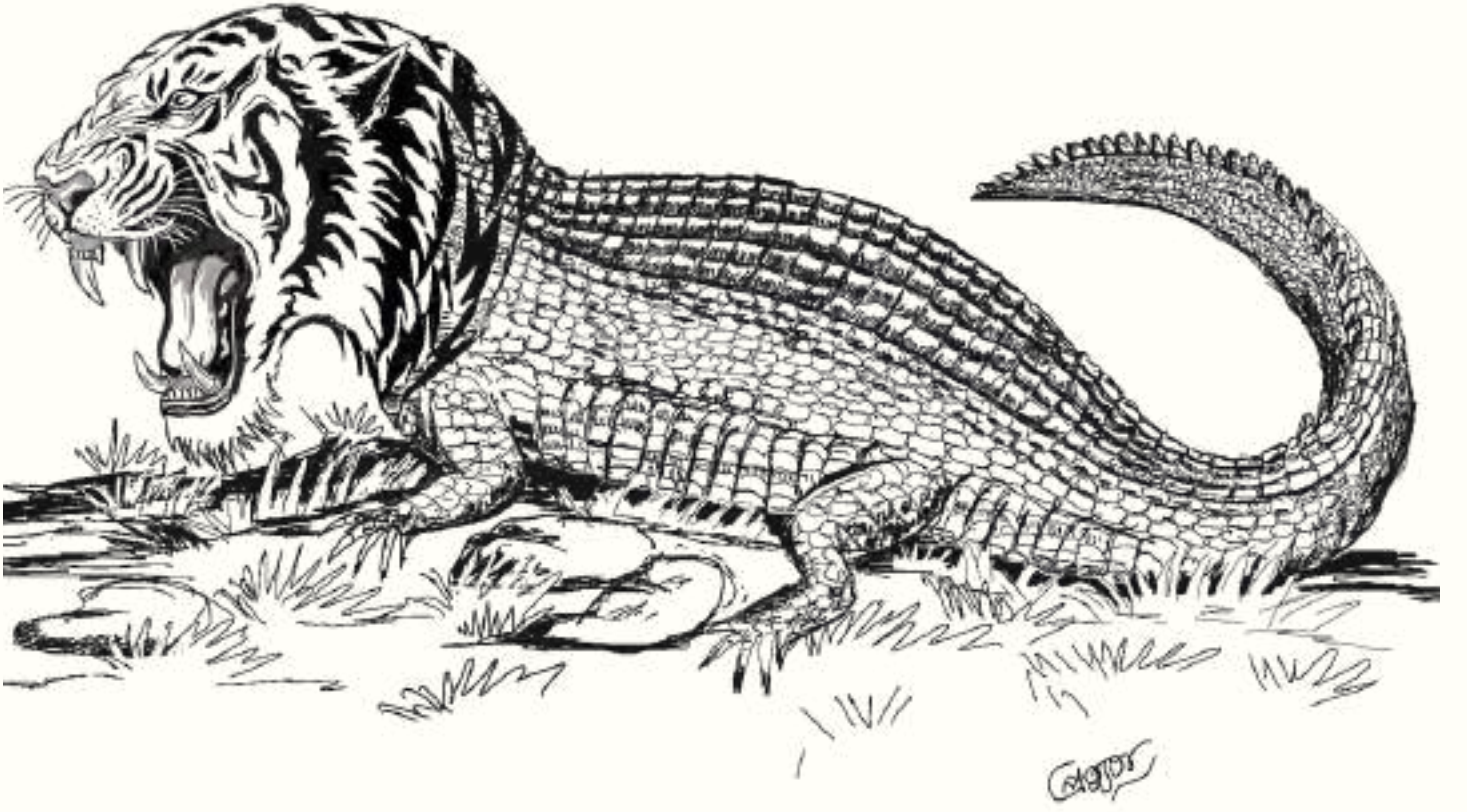
অঙ্কন: পৃথাঘোষ

প্রশ্ন পত্র

অবাক পরীক্ষা

ভাগ্যশ্রী বিষ্ণু

হাঁসজারু আর বকচ্ছপের গিন্নী গেলেন চটে,
পরীক্ষাটার প্রশ্ন শুনলুম উধাও হলো পটে!
হুকোমুকো হ্যাংলা বলে, "শোনরে কোলাব্যাঙ,
প্রশ্নবাবু পালিয়েছে ফেলে লম্বা লম্বা ঠ্যাং!"
খাতা পেঙ্গিল রবার বাবু কাঁদেন বসে বসে,
"এমন ধারা লিক-লিকানি দেখিনি তো দেশে!"
উড়ল পেপার, জুড়ল হাওয়া, হারিয়ে গেল কই?
পড়ুয়ারা গিলছে বসে শুধুই ছড়ার বই।
গিল্টি-করা টিকটিকিটা চশমা এঁটে নাকে,
বলছে, "বাবু, প্রশ্ন ধরো মস্ত বড় ফাঁকে!"
নেইকো পড়া, নেইকো পাস, সব হয়েছে গোল,
উল্লুকের এই মুল্লুকে ভাই হুটোপুটির দোল!
হেঁদো হাবুর পিসেমশাই চিল্পে বলেন, "বাপ রে!
নবীনবাবুর ভূতটা বুঝি ধরল এসে পাকড়ে!"
লিক হয়েছে লিক হয়েছে, চারদিকে এই ডাক,
পড়ুয়ারা মহাখুশি ভাই— "আজকে পড়া থাক!"
নেটের তারে সর্দি লেগে সবাই করে হাঁচো-হাঁচো,
প্রশ্নপাড়ায় চলছে গুলি, চলছে ধাঁচো ধাঁচো।
পড়াশুনোর পাট চুকেছে, খামখেয়ালি দিন,
প্রশ্নবিহীন পড়ার দেশে তাক ধিনাধিন ধিন!



আত্মকথা

~প্রতুষা মহন্ত

চল্লিশে চালশে খালি চোখ ফ্যাকাসে
চশমার কাচ মুছে মন দিই আপসে।
শিরদাঁড়া আজকাল সোজা রাখা বড় দায়
হেলে পড়ি সেই দিকে যেদিকে বালিশ পাই।
খবরের কাগজটা নেড়ে চেড়ে খুঁটিয়ে
মগজেতে ভরে নিয়ে চলে যাই গুছিয়ে।
চোখ কান খোলা রেখে পথ ঘাটে চলা চায়
মুটে আর মুদি গুলো আজকাল যা ঠকায়!
সবজির ঠালা গুলো সব ব্যাটা মহাপাজি
বাজারের চড়া দাম ওদেরই তো কারসাজি।
আতিপাতি করে তাই হিসেবটা রেখে যাই
মাঝে মাঝে রাস্তার খানাখন্দে হোঁচট খাই।
মাথা খানি ঠেসে রাখি নানাবিধ চিন্তায়
একখানি মগজে কতটা আর ভাবা যায়!
রাবণের মত আমার যদি দশ মাথা থাকত
রাম-লক্ষ্মণ হনুমান হারাতে কি পারত!
আহা নিউটন হতাম, যদি থাকত আপেল বাগান
কিছু না হলেও অন্তত হতাম নাবিক ম্যাগেলান।

মরা গাঙ্গে আজ কাল বান আর আসে না
জয় মা বলে তরী আর ভেসে যায় না।
মনের দুখে আমি তাই ব্যাকরণ মেনে চলি
কাচশমা এঁটে থাকি, পাছে মশামুক দেখে ফেলি।
স্বপ্নের ঘোরে আমি দেখে থাকি রোজ প্রায়
বাঘ মুখো ঘড়িয়াল হেঁটে চলে চার পায়।
চারা মেখে ছিপ ফেলি উঠে আসে কইলিশ
ইউরেকা বলে ছুটি বাগিয়ে নতুন স্পিসিস
দুম! করে ঘুম খানি ভেঙে যায় মাঝরাতে
চিতপটাং হয়ে আমি হাত-পা ছুড়ি ভূপাতে।



অঙ্কন: প্রতুষা মহন্ত



বাক্সবন্দী

~ দি ক পাল সিং

আজব শহর, গজব মানুষ, অদ্ভুত সব কান্ড,
লাইক কमेंটের চক্রেতে ঘুরছে এ ব্রহ্মাণ্ড !
হাতে সবার একটা করে চৌকো চোরাবালি
দিন ফুরিয়ে রাত কেটে যায়, স্ক্রোলিং চলে খালি ।

এই দেখ ভাই "সোশ্যাল মিডিয়ার" বুড়ো খেপার দল
কিলবিলিয়ে মাথায় ঘোরে রিল বানানোর খল।
ফড়িং এর কটা ঠ্যাং — গুগল দিলেই আসে,
মানুষ এখন AI দেখে, বোকার মত হাসে ।

রুমালখানা বিড়াল হলো সুকুমারের কালে,
এখন বিড়াল Vlogger সেজে নাচছে মডার্ন তালে ।
হিজিবিজবিজ আজগুবি সব খবর জড়ো করে
পাগলা দাশুর খামখেয়ালী, চ্যাট বক্সের পরে ।

গোঁফ হারিয়ে হেড বাবু তো রেগেই আগুন ঘরে
সারাদিন ধরে চলছে যে সার্চ, গুগল করে করে ।
তা দেখে কি কাকেশ্বর আর শান্ত হয়ে বসে ?
ফেসবুকেতেই মস্ত বড় হিসাব দিল কষে।

রকম দেখে রামগড়ুরের ছানাও নাকি হাসে...
ডিজিটাল এই আবোল তাবোল জমছে বারোমাসে।

অঙ্কন: অর্চি রায়

কাঁচের দেওয়ালে আঙুলের দাগ

সামিমা আখতার (মুন)

হযবরল মানেই সুকুমার রায়
উনার স্মরণেই ছন্দ শুরু করা যায়
কবির ভাষায় অনেক চরিত্র ছিলো
আবোল তাবোলে
ভাগ্যিস পড়েনি তারা রিলস এর কবলে
একে অপরের সঙ্গে করতো
সারাক্ষণ রোস্ট
আর ক্ষণিকের মধ্যেই করতো
ফেসবুকে পোস্ট।
আজ বুঝি নেই চিঠি লেখার সময়
তাই তো মুহূর্তের মধ্যে ইনবক্স ভরে যায়
পায়রারা সব পেয়েছে কাজের ছুটি
আর সারাক্ষণ মোবাইলের
চক্রে কমছে দৃষ্টিশক্তি।
তাইতো চারিদিকে তৈরি হচ্ছে টাওয়ার
বাড়াতে নেটওয়ার্কের পাওয়ার।
এসব দেখে প্রকৃতি কাকুতিমিনতি করছে
এবার থামো: আমার সন্তান ধীরে ধীরে
বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে!
শুনলাম মানুষের নাকি আজকাল
নেই কথপোকথনের সময়
তাই বুঝি এরা রক্তচাপ বাড়ায়
সাথে আবার মনঃচিকিৎসক ও দেখায়।
আজ আছি কাল নাই
স্বপ্ন আয়ু কাজে লাগায়
বই খুললেই সময় যায়
Chatgpt বলে আমি আছি ভয় নাই,
আধুনিক জীবন আর ডিজিটাল লাইফ
শুনতে ভালো লাগে তখনই
যখন ন্যায় বিচার ও আলোকিত জীবন
সবার সঙ্গে হবে তখনই।

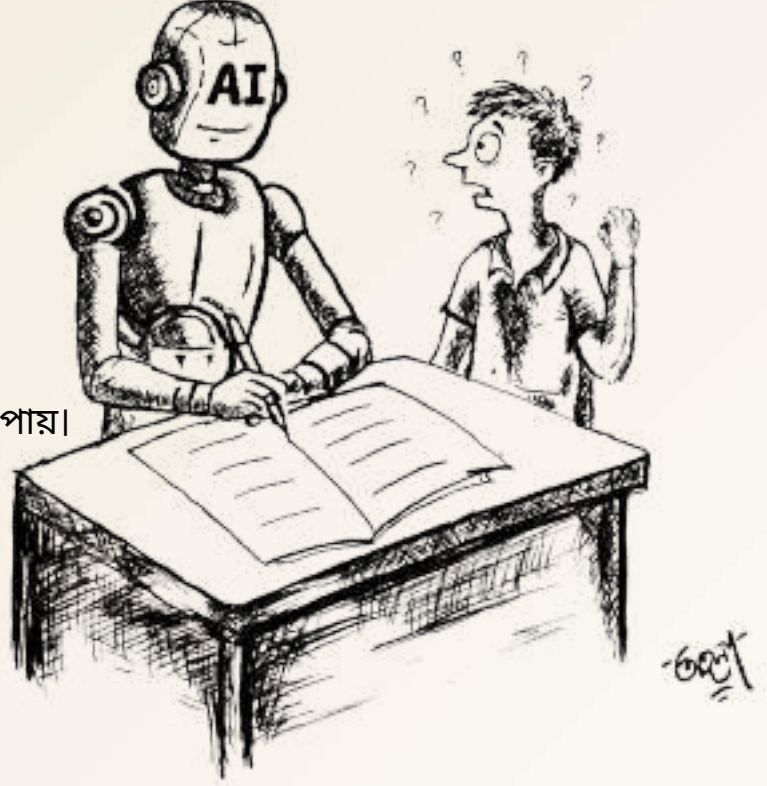


অঙ্কন: সুপ্রতিম রায়

স্কলনগরীর স্কলার

~ অ হ না ঘোষ

প্রাতঃকালের প্রথম দর্শন ফোনের স্ক্রিন পায়
এরই মাঝে ফোন হারালে বলে হায় হায়!
পড়তে বসে বইয়ের পাতা পাশে বসে কাঁদে
রিলরুগী তখন আরাম করে পড়েছে রিলের ফাঁদে।
গুগুলবাবা ঠাকুরদাদা, চান অনেক রেস্ট
মেটা মশাই তাই আসরে নামেন, দিতে নিজের বেস্ট।
চার্জারেরও নিস্তার নাই, বিশ্রাম সে কি পায়?
পাওয়ার ব্যাংকও ভ্যাকেশন চায়, কেউ যে শুনতে না পায়।
এ আই বাবু সবচেয়ে জ্ঞানী, সবার কথা শোনে
প্রশ্ন শুনেই তার মধ্যে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলে।
এরই মাঝে একি ভাই! নোটিফিকেশনের ঝড়
মেসেজ মাসি হাই বলেছে, ইমোজিতে উত্তর।
আরও আছে থামো থামো, এখানেই নয় শেষ
ইলটোগ্রামের স্ক্রিনটাইমেই জ্ঞানেন্দ্রিয় শেষ।



লাইকলালের ভালোবাসা একটু সত্যি যদি হত
সবুজে ভরা পৃথিবীটা আজ অন্য রকম হত।
সবাই আছে কানেক্টেড, আসলে মনটা বড়ই ফাঁকা
ফলোয়ারের দলে নাম লেখালেও, আজ সে বড় একা।
সেলফি স্যার পৃথিবীতে শুধু নিজের মুখটাই চায়
পাহাড়, সমুদ্র, মেঘ সবাইকেই তার বাই।
হ্যাশট্যাগকে সঙ্গী করে ছুটছে সবাই ট্রেন্ড ধরে
ফিল্টার দিয়ে আড়াল করে, আসলটা না বেরিয়ে পড়ে।
স্ক্রিন খায় সে অষ্টপ্রহর, 'হবি'গুলো কই?
বইয়ের স্তূপে হারিয়ে গেছে আবোল তাবোল বই।



অঙ্কন: অহনা ঘোষ



অঙ্কন: অনন্যাহাজারা

রায়বাড়ির রূপকথা

~ তনয়া সামন্ত

রায়বাবুদের দালনবাড়ি, উঠছে যে আজ সেজে
আবোল তাবোল ছন্দে মেতে, আজগুবি সুর বেজে।
আসছে ভোলা খেয়াল খোলা, পাগলপারা আনমনে,
শ্যামাদাসকে বোঝায় সবাই কার কথা আর কেই শোনে।
হুকুমুখো হ্যাংলা এসে চৈচিয়ে বলে, "সবাই কই?!"
এইতো সবাই এলো বলে সবুর করো খোলো বই।
প্যাঁচা এলো বেজার মুখে প্যাঁচানি ভীষণ রেগে
তার গানের সুরে সবার মাথা ঘুরছে ভীষণ বেগে।
রামগরুড়ের ছানা বলে, "কেউ যেন আজ না হাসে!"
কাতুকুতু বুড়ো বলে "বসনা বাপু আমার পাশে।"
হিজিবিজবিজ দেখছে বসে নন্দখুড়োর হাত
মন্ত্রীবুড়োর গন্ধবিচার চলবে সারারাত।
উড়ে এসে বসলো জুড়ে ট্যাঁশগরু বেশ আয়েশে
নোটবইতে নিলাম লিখে রুচি নাই তার পায়েসে।
বেনিয়াটোলার ভীম পালোয়ান ষষ্ঠীচরণ আসল তেড়ে
হাঁসজারু তো কেঁদেই বলে "আমায় তোরা বাঁচতে দে রে!"
ঝোলাগুড় ও পাউরুটি খেয়ে বলল সবাই "আহা!"

কাঠবুড়ো ওই রেগে বলে "ছাইপাশ সব তাহা!"
ছায়াবাজির খেল দেখিয়ে জমলো এবার আসর
ভীষ্মলোচন শর্মা শুরু করবে গানের বাসর।
প্রাণটা সবার উঠল কেঁপে গানের গুঁতো ভাই
হাতিমি এসে তাড়ায় তাকে, বাঁচলো সবাই তায়।
হেড অফিসের বড়বাবু হঠাৎ গেলেন ক্ষেপে
গোঁফ গেছে তার আবার চুরি দেখেন তিনি মেপে।
চণ্ডীদাসের খুড়ো এলেন লাগিয়ে নিজের কল
গঙ্গারাম তো ভেবেই মরে একী মায়ার ছল!
বাবুরামের বুড়ি ভরা সাপের বাহার দেখে
কুমড়োপটাশ পালিয়ে বাঁচে তল্লিতল্লা রেখে।
পালকি চড়ে এলেন শেষে বোম্বাগড়ের রাজা
পাত্র মিত্র খাচ্ছে বসে আমসত্ত্ব ভাজা।
জমলো এবার আজব সভা উঠল সবাই মেতে
রায়বাবুরই আশীর্বাদ মোরা নিলাম মাথা পেতে।
সৃষ্টিছাড়া-বাঁধনহারা, যদি হাসতে থাকে মন
আবোল তাবোল শেষ হবেনা, চলবে আজীবন।।



অঙ্কন: প্রত্যাষা মহন্ত

বুড়োর ঘুরতে যাবার দেশ- ~ বাঙালি রাজপুত

লম্বা দাড়ি বুড়ো,
সঙ্গী বন্ধু কলের খুড়ো,
ফেল করে ঘুরতে যাবার ট্রেন—
ধরতে গেল, চলা জলের প্লেন!
উঠতে গিয়ে শেষে,
বিষম খেয়ে কেশে—
ধপাস্ করে উল্টে, তার দুনিয়া গেল পাটে।
শেষে রামধনুর টিকি ধরে,
নাচতে নাচতে জোরে
কি রঙিন দুখান বেশে, নামল আজগুবি দেশে।

সে কী বিশাল রঙিন মাটি,
যেন সোনার পাথর বাটি,
দেখে চক্ষু ছানাবড়া— হন্দে যাচ্ছে নাকো ধরা!

সেখানে টিকটিকি টানা গাড়িতে,
গাধা যায় বাড়িতে।।

ইঁদুর দিচ্ছে খুঁড়ে, লাঙলের সব গর্ত করে—
হাতিগুলো দিচ্ছে ছড়িয়ে জল,
পাখিরা বুনছে বীজ বানিয়ে অদ্ভুত এক কল।

বাঘ, গন্ডার মামা তো বন্ধু ভারি;
হয়ে মিস্ত্রি —
পলকে তুলছে বড় বড় প্রাসাদ বাড়ি!
চাঁদের টুকরো খুলে;
সবাই নাইট ল্যাম্পে দিচ্ছে পুড়ে,
খাবার জলের হোম ডিলিভারী—
মিনিট দশেকে দিচ্ছে মেঘ, না থাকলে আড়ি।

নদীর জলে ঘি-এর ধারা,
তীরে মাছেদের রেস্টোরাঁ
দিচ্ছে ভেজে লুচি, সঙ্গে ঘুগনি, গরম ডালের বড়া,
আরাম কেদারায় এসে, ধুতিপাঞ্জাবি পরে,
চশমা চোখে সূর্য্যি মামা, কাগজ পড়ছে ভোরে।

এই দেখে বুড়ো,
বলেই দিলো- চল খুড়ো
যাই এখানে থেকে, মজা ভারি, কেউ নেই ছোটো বড়ো
পরে যা হবে ভাববো - "না হয় দেখে"।

এক ঝলকে সুকুমার

১] সুকুমার রায়ের শেষ লেখা আবোল তাবোল।

২] আবোল তাবোল প্রকাশিত হয় সুকুমার রায়ের মৃত্যুর নয় দিন পর (১৯ শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৩)

৩] তাঁর জীবনকাল ৩৫ বছর (৩০ শে অক্টোবর , ১৮৮৭-- ১০ই সেপ্টেম্বর , ১৯২৩)

৪] তিনি ইংল্যান্ডে মুদ্রণ প্রযুক্তি এবং ফোটোগ্রাফ নিয়ে পড়াশোনা করেন।

৫] U Roy and Son' s পারিবারিক মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানে আধুনিক মুদ্রণ পদ্ধতি চালু করেন।

৬] তাঁর অধিকাংশ বইয়ের চিত্র তিন নিজেই ঐঁকেছিলেন তিনি

৭] তিনি ' মণ্ডা ক্লাব ' নামে একটি সাহিত্য আড্ডার সাথে যুক্ত ছিলেন।

৮] তাঁর মৃত্যুর পরও বহু রচনা প্রকাশিত হয়।

৯] সুকুমার রায় পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশোনা করেছিলেন।

১০] তাঁর ডাক নাম ছিল তাতা ('রাজর্ষি'র হাসি ও তাতা নামের অনুকরণে) ও সুখলতা রাও রের ডাক নাম ছিল হাসি।

১১] তাঁর মৃত্যুর সময় সত্যজিতের (মানিক) বয়স ছিল দু'বছর।

১২] আকাশবাণী শব্দটি ১৯২১ সালে প্রথম একটি প্রবন্ধে ব্যবহৃত হয়।



পত্রিকার এই সংখ্যার



উপন্যাস





শুরু হচ্ছে নতুন ধারাবাহিক -

বোলপুরের বাড়িটা

বাইরের বৃষ্টি একটু ধরে এসেছে। ঝুপড়ি এক ঘরে ; হারিকেন জ্বলে বসে আছে দিদি আর ভাই। দিদির নাম দীপ্তি ; বয়স মেরেকেটে দশ বারো হবে। দরজার দিকে ঠাঁই তাকিয়ে আছে তারা। তাদের মা এখনও ফেরেনি। মা এর তো এতক্ষণে ফিরে আসার কথা। মা এসে ; হাড়ি চাপালে তারা পেটভরে একটু খেতে পাবে। মা এখনও এলো না কেনো ? এত দেরি তো করে না মা। ছোটভাই ; দিদির কোলের কাছে জুটিসুটি মেরে বসে। দূরে কোথাও অনেকগুলো কুকুর এক সঙ্গে ডেকে ওঠে। বুকটা হঠাৎ ধড়াস করে ওঠে দীপ্তির।

কুকুর গুলো গোল বেঁধে একটানা ডেকে চলেছে। রাস্তায় জমা ; বৃষ্টি জলের উপর এক এক করে রক্তের ফোঁটা পড়ছে। কাটা মুন্ডু থেকে গড়িয়ে জমা জলের উপর পড়ছে রক্ত। মানুষের রক্ত। দীপ্তি-র মায়ের কাটা মাথা টার চুল ধরে নিয়ে যাচ্ছে এক অতিকায় মানুষ।

পরেরদিন দীপ্তির মায়ের মাথা এক সুপুড়ি গাছের উপরে পাওয়া যায়। দীপ্তি আর তার ভাই কে কোথাও পাওয়া যায়নি। তন্ন তন্ন করে খুঁজে ছিল গ্রামের মানুষ। খালের পারে দীপ্তির মা এর লাশ পাওয়া গিয়েছিল। আর তাকে ঘিরে বসে ছিল দুই শেয়াল। দুই শেয়াল কে শ্মশান পর্যন্ত লাশ এর পাশ থেকে আর আলাদা করা যায়নি। তারপর যেন হঠাৎ উবে গেছিল শেয়াল দুটো।

দীপ্তির মা বোলপুরের এক ব্যানার্জি বাড়িতে কাজ করত। তার পাশের বাড়িতেই থাকত আমার এক দিদি। তার কাছেই শোনা গোটা ঘটনাটা।

ব্যানার্জি বাড়ির মেজভাই কলকাতা থেকে এসে এই বাড়িতে থাকা শুরু করে বছর কুড়ি আগে। তার সঙ্গে আসে তার স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে। পনেরো কাটা জায়গার উপর বানানো বিশাল দোতলা বাড়িতে বনেদিয়ানার ছাপ স্পষ্ট। তার সামনে মস্ত বাগান। বাগানের পাশে এক কুয়ো।

বাড়িতে আসার পরপরই ব্যানার্জি বাবুর স্ত্রী ভীষণ অসুস্থ হয়ে যান। নার্ভের অসুখ ধরা পড়ে তার। শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। পাড়ার কাকিমা রা দেখতে আসতেন অসুস্থ মানুষটাকে। তখনই কেমন অদ্ভুত আচরণ করতেন মিসেস ব্যানার্জি। ঘরের কোণের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হঠাৎ আঁতকে উঠতেন। একদিন তার বরকে ডেকে ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করলেন “বারান্দায় ওই তিনটে লোক আমার দিকে তাকিয়ে গল্প করছে; ওরা কারা গো?” ব্যানার্জি বাবু ফাঁকা বারান্দার দিকে তাকিয়ে কাওকেই দেখতে পান না। ডাকবুকো ব্যানার্জি বাবুর ও শিরদাঁড়া দিয়ে হঠাৎ ঠান্ডা স্রোত বয়ে যায়। এমন ভাবেই একদিন মিসেস ব্যানার্জি মারা যান। মিস্টার ব্যানার্জি ও আর ওই ঘরে থাকেননি। তালা মেরে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। একবছর পর নতুন পরিবার বাড়িতে ভাড়া নিয়ে আসে। ভাড়া নেওয়ার দুই সপ্তাহ পর বাড়ির বৌ গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। এই পরিবারও বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। এরপর বহু বছর বাড়ি ফাঁকai পরে ছিল। শুধু পাড়ার লোক; প্রতি শনিবার এক অতিকায় মানুষকে ছাদের উপর দিয়ে ছুটতে দেখতো। গোটা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল বাড়িটা “ভুতুড়ে”। কয়েক বছর পর আরও একটা পরিবার বাড়িটা ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করে। স্বামী পরিতোষ; স্ত্রী বিমলা আর তাদের দুইমাসের শিশু কন্যা। পাড়ার লোকেও তখন ভূতের বিষয়টা ও অনেকটাই ভুলে গেছে। নতুন ভাড়াটিয়াদের সঙ্গে খুব ভাব হয় আমার দিদির। দিদির ঘরের জানলা খুললেই ওই বাড়ির রান্না ঘর। রোজ গল্প হতো তার বিমলা বৌদির সঙ্গে। গল্প করতে করতেই একদিন বিমলা বৌদি বলল “বাড়িটা এত খোলামেলা; বুঝলে; তাও সন্ধ্যার পর কেমন গা ভারী হয়ে আসে; জানো? কেমন ছমছম করে দালানগুলো। শুধু মনে হয় কেও আমায় দেখছে।

দিদি ওকে বুঝিয়ে বলে এসব কিছুই নয়; “সবই তোমার মনেরই ভুল।” সেইদিনই রাতে বিমলার ভয়ংকর চিৎকার এ ঘুম ভেঙে যায় পাড়ার সবার। সবাই ছুটে আসে বাড়িটাই। পরে তারা জানতে পারে; বিমলার রাতে ঘুম আসছিল না বলে হওয়া খেতে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল। তখনই ভয়ঙ্কর কিছু দেখে সে চিৎকার করে ওঠে।

বিমলা দেখে বাড়ির সামনে ছয় ফুট উঁচু পাঁচিল এর উপর দাঁড়িয়ে; ঠাই ভাবে বারান্দার দিকে তাকিয়ে আছে এক মহিলা। বিমলা “কে কে” বলে চিৎকার করলে হামাগুড়ি দিতে দিতে দ্রুত গতিতে বাড়ির বাগানে মিলিয়ে যায়। বিমলা ওই আলো আঁধারির রাতে মেয়েটার মুখটা দেখতে পায়। মেয়েটার মুখে কোনো চোখ; ছিল না। ছিল শুধু অজস্র কাটা কাটা ক্ষত। বিমলা ওখানেই চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। পরেরদিন পাড়ার সকলে গিয়ে; পরিতোষবাবু কে বাড়ির ইতিহাস সম্বন্ধে বলে। তখনই পরিতোষ বাবু বাড়িটা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু বাড়ি ছেড়ে নতুন বাড়ি পেতেও তো সময় লাগবে। তাই নতুন বাড়ি যতদিন না পাচ্ছেন এই বাড়িতেই থাকতে হতো ওদের। দিন দিন বিমলা বৌদির শরীর ভাঙতে থাকে। চোখের তলায় কালি পড়তে শুরু করে। শরীর শুকিয়ে যেতে থাকে জিনিসপত্র; পোশাক এ সৌখিন বিমলা বৌদি কেমন যেনো দায়সারা হয়ে ওঠেন। দিদির মা; মানে কাকিমা একদিন জিজ্ঞেস করেছিল বিমলা কে; “তুমি কি শরীরে যত্ন নিচ্ছ না নাকি; এমন খারাপ হয়ে যাচ্ছ দিন দিন।”

বিমলা বলেছিল “কি জানো দিদি কিছুই তো আর ভালো লাগে না। সন্ধে দিতেও ইচ্ছে করে না আর। ক্লান্ত লাগে শুধু।”

শহরে গিয়ে ডাক্তার দেখালেও সেরে উঠছিলেন না তিনি। শুধু কথায় কথায় বলতেন যে ওনার খুব ভয় করে। এমনভাবেই একদিন বিমলার খুব জ্বর হয়। হাসপাতালে ভর্তি হন। কিন্তু আর বাড়ি ফিরে আসে না বিমলা। হাসপাতালেই মারা যায় সে। যেদিন মারা যায়; দিদি সেদিন বিমলা কে দেখতে গিয়েছিল। মরার আগে কেমন ড্যাভ ড্যাভ চোখে দিদির দিকে তাকিয়ে হেসেছিল বিমলা বৌদি।

হিসহিসে গলায় বলেছিল “আমার সঙ্গে যাবি বাবু?” বাড়ি এসে দুদিন খাবার ছুঁয়ে দেখতে পারেনি দিদি। দিন তিনেক পর তার কলেজ এর হোস্টেল এ গিয়ে ওঠে। কিন্তু সেখানে তার জীবনের সবচেয়ে অন্ধকার দিন নেমে আসবে; দিদি নিজেও ভাবতে পারেনি।

অক্ষন: অনন্যা হাজারা

(ক্রমশ)

"খাম" খেয়ালে

প্রিয় পাঠক,

অভিজ্ঞ, অনভিজ্ঞ, কাঁচা পাকা হাতের লেখা ; ছবি দিয়ে সাজানো হয়েছে আমাদের পত্রিকা। আমাদের এই পথ চলা কোনোদিনই একপাক্ষিক নয় । এই সম্পর্কের ভিত-ই হলো পত্রিকা এবং তার পাঠক। তাই পত্রিকার সার্থকতা , বিচারের দায়িত্ব ও আপনাদেরই হাতে। কোনো রকম দ্বিধা ছাড়াই, পত্রিকাসম্পর্কিত ভালো মন্দ এবং ছোটো ভাবনা জানালে আমরা ম কৃতজ্ঞ থাকবো। পরের সংখ্যায় আরও নতুন কী সংযোজন বা পরিবর্তন করলে তা পত্রিকাকে আরো সমৃদ্ধ করবে ; এই বিষয়ে আপনাদের মতামত অবশ্যই এই মাধ্যমে পাঠাবেন.....

email: med26bmc.darpan@gmail.com । চিঠিটি পরবর্তী সংখ্যাই প্রকাশিত হবে । আপনাদের উদ্দেশ্যে রইলো অব্যাহত দ্বার।
শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানবেন।

এই মাসের চিঠি

প্রিয় পাঠক,

আপনি যদি এই মুহূর্তে ফার্মাকোলজির বই খুলে পড়ার কথা ভেবে থাকেন, তবে অভিনন্দন। আপনার সেই মহৎ পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করতেই এই ম্যাগাজিনের জন্ম।

এই ম্যাগাজিনের কোনও শিক্ষামূলক মূল্য আছে কি না, তা নিয়ে আমরা নিজেরাই নিশ্চিত নই। তবে এটুকু বলতে পারি, এই পাতাগুলো পড়তে পড়তে আপনি অন্তত কিছুক্ষণ ভুলে যাবেন যে আগামী সপ্তাহেই পরীক্ষা, প্র্যাকটিক্যাল, ভাইভা, লগবুক, অ্যাটেনড্যান্স আর জীবনের বাকি সব দুর্ভোগ এখনও আপনার জন্য অপেক্ষা করে আছে।

এখানে আপনি পাবেন কিছু মেডিক্যাল ছাত্রছাত্রীর বহুদিন ধরে জমে থাকা মানসিক বমি, যা কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, আঁকিভূঁকি ও অন্যান্য সাহিত্যিক রোগের ছদ্মবেশে পরিবেশন করা হয়েছে। দিনের বেলায় যারা ব্র্যাকিয়াল প্লেজিয়াস, ক্রেবস সাইকেল আর পরীক্ষার নম্বর নিয়ে কাঁদে, রাতের বেলায় তারাই হঠাৎ নিজেদের ডিজিটাল যুগের সুকুমার রায় বলে ভাবতে শুরু করেছে।

ফলাফল? কোথাও স্টেথোস্কোপ প্রেমে পড়েছে বৃষ্টির, কোথাও ক্যাডাভারের পাশে বসে জন্ম নিয়েছে দর্শন, আবার কোথাও ইন্টার্নাল পরীক্ষার ট্রমা ছন্দ মিলিয়ে কবিতা হয়ে উঠেছে।

মানুষের সময় নষ্ট করার হাজারো উপায় আছে। আমরা কেবল সেই মহৎ কাজে সামান্য সাহিত্যিক অবদান রাখলাম।

শুভ অপচয়।

মৈনাক ব্যানার্জি

বিচার

"আমিই হবো উকিল হাকিম, আমিই হবো জুরি
কান ধরে তোর বলবো বেটা 'ফের করেছিস চুরি?'
সটান দেবো ফাঁসির হুকুম বেটা অমনি একেবারে
বুঝবে তখন চোর বাছাধন
বিচার করে বলে "

আজকের সমাজে জন নেতৃত্বের অবস্থার দিকে এবং দিনের পর দিন স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও ইত্যাদি ক্ষেত্রে বেড়ে চলা দুর্ভিক্ষ আর আইনভঙ্গ কাজের কথা জানলে কবি সুকুমার রায় এর এই লাইন গুলো মাথায় আসে। হয়ত সাধারণ মানুষের মুখে এই লাইন গুলো মানাবে বিশেষ করে এই সময়। ক্ষুধার্ত সাধারণ জনগণ বিচারের আশায়, বৃষ্টির অপেক্ষায় অধীর চাষীর মতো দিন গোনে আর অন্ধের মতো দিনের পর দিন ঘটে যাওয়া অপকর্ম ভুলে গিয়ে দিন কাটায়।

সংপাত্র

"শুনতে পেলুম পোস্তা গিয়ে-
তোমার নাকি মেয়ের বিয়ে ?
গঙ্গারামকে পাত্র পেলো ?

জানতে চাও সে কেমন ছেলে ?..."

এই কবিতায় কবি খুব সুন্দর ছন্দে সামাজিক ভেদাভেদ ও বৈষম্যকে তুলে ধরেছেন যা এখনও খুব ভালো ভাবে প্রচলিত। এই কবিতাটি শুধু একটি হাস্যরসাত্মক কবিতা নয়, এটি সমাজে প্রচলিত ভণ্ডামি, অন্ধ বংশগৌরব, বিবাহ-সংক্রান্ত কুসংস্কার এবং ভুল মূল্যবোধের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ যা বর্তমান সমাজে এখনো বজায় আছে।

অরিত্র গাঙ্গুলি

সুকুমার রায় একটি সাপ্তাহিক সভা বসাতেন তাঁর

গড়পাড়ের বাড়িতে যার পোশাকি নাম ছিল মন্ডা ক্লাব। (Monday club)। এই সভার বিষয়বস্তু ছিল মূলত সাহিত্য চর্চা, সর্বোপরি সুকুমারী কায়দায় হাস্য রস এবং বুদ্ধিবৃত্তি। আমরাও একেবারে মগ্ন ক্লাবের মত উৎসাহে উগবগ ফুটছি যার মঞ্চ হল এই মেডদর্পণ। সুকুমার রায় এর মগ্ন ক্লাবের যে আমন্ত্রণপত্রটি ছিল তার নমুনাটি তুলে ধরা হল :-

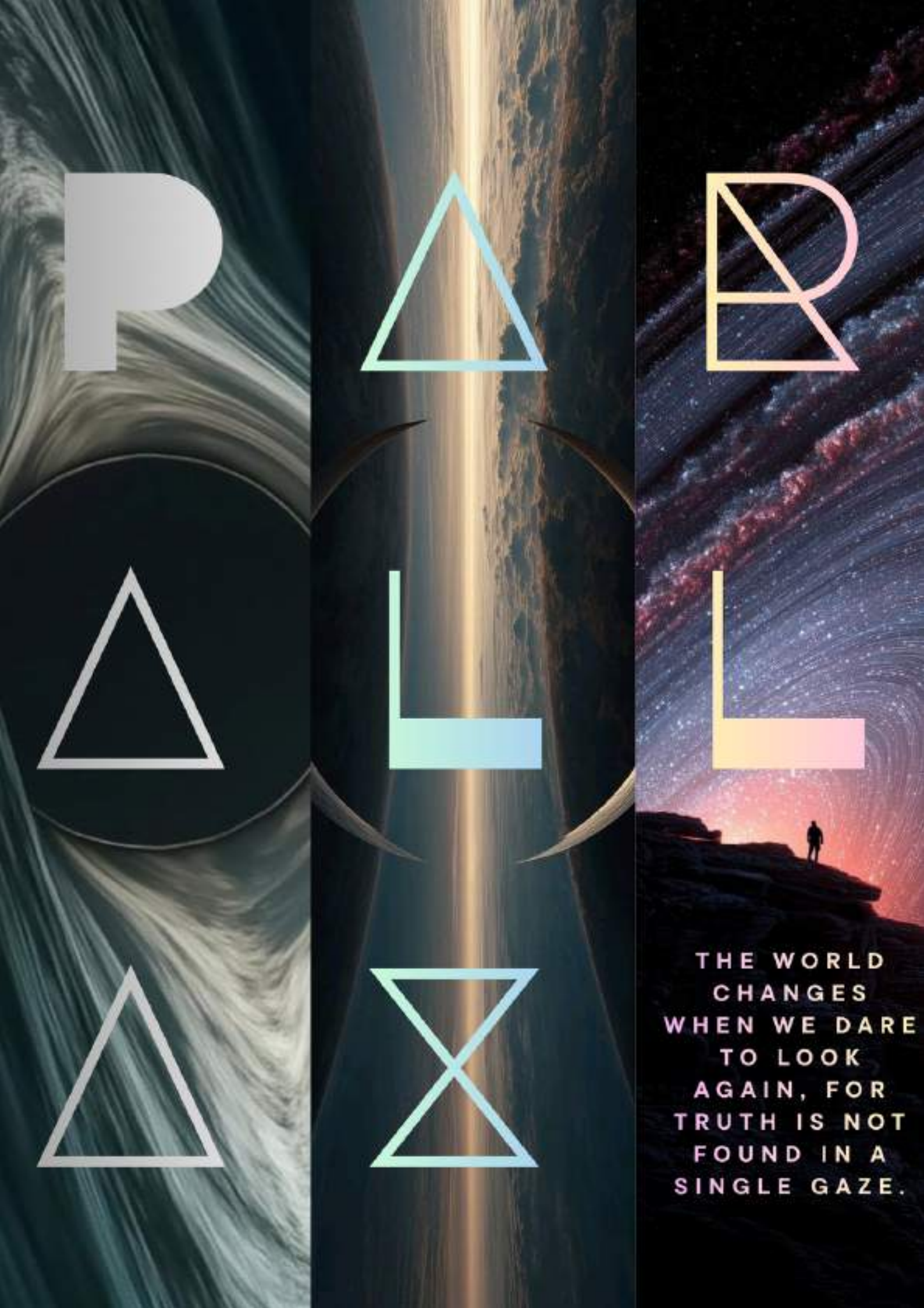
সম্পাদক বেয়াকুব
কোথা যে দিয়েছে ডুব—
এদিকেতে হয় হয়
ক্লাবটি তো যায় যায়।

তাই বলি সোমবারে
মদগৃহে গড়পারে
দিলে সবে পদধূলি
ক্লাবটিরে ঠেলে তুলি।

রকমারি পুঁথি কত
নিজ নিজ রুচিমত
আনিবেন সাথে সবে,
কিছু কিছু পাঠ হবে।

করযোড়ে বারবার
নিবেদিছে সুকুমার।





P

A

R

A

L

L

A

X

THE WORLD
CHANGES
WHEN WE DARE
TO LOOK
AGAIN, FOR
TRUTH IS NOT
FOUND IN A
SINGLE GAZE.



Perfectly Absurd

There always lies a strange beauty in being irrational amidst the rest searching for reason. "Perfectly Absurd" entangles delightful contradictions with dreamers and their inner chaos. We welcome your journey along the thoughts that defy logic; revealing deeper truths beyond boundaries of conventional. The nonsensical forms sense, the ordinary appears extraordinary while absurdity finds its own peculiar perfection. Come along - take a seat while imagination spins the clg clogging your mind; take up the mighty pen and let the ink flow! Afterall, in a world determined to find sense, maybe absurdity is the answer .

**Sincerely,
Editorial Team**

TABLE OF *Contents*

1

PROSE

Ritual- Sneha Das	01
The King- Adrita Banerjee	04
Rose - Ahana Ghosh	10
The Demon of the Mind - Dr. Anik Mondal	21
The Subway Lady - Dr. Jatabeda Pal	24
To be Freed - Aadi Singh	27
The Burden of Blame - Teesta Chakraborty	30

2

POETRY

Survival- Kazi Raisa Naznin	32
Absurdist's Almanac- Agnik Chatterjee	33
After the Last Answer- Shruti Priya Rajhans	35
Imperfectly Perfect - Snita Das	36
Home of None- Krittika Mohanta	37
Hues of an Absurdist- Aritra Ganguly	37

3

ESSAY

Macrocosm of Microorganisms - Archi Ray	38
You are "PERFECTLY ABSURD" - Durga Aggarwal	42
Sleep Medicine - Dr. Najesh Afroz	43
Protocol No. 47 - Dr. Dharmendra Kumar Pradhan	48
Theory of Modern Day Love - Amit Kumar	53

4

EDITORIAL NOTES

Bivangshu Roy	I
Agnik Chatterjee	IV
Arya Das	VI
Kazi Raisa Naznin	VII
Ruchika Bhow Singhka	VIII

EDITOR'S LETTER



Bivangshu Roy
Batch 2022-23
Chief Editor of Parallax

Dreams are rather a man's creation than the other way around. They blossom when we pursue them, they are common when we reach them, and they are very valuable when we remember them. This editorial is inspired by precisely this room between fulfilment and farewell.

I remember having a dream that is now becoming reality, where I could write words, that too being the English Editor of Med-Darpan. It was never about a designation. This was about being a part of something bigger than myself; about leaving behind a few pages that may live on past my time inside these BMC walls. Today that dream slips into reality and it dawns on me that this will be the

the first and the last editorial I will ever write in the magazine.

Well, that's why life constantly appears to be the most absurd thing to be.

In the medical world, we are brought up to live with certainties, but in our lives here, things are far from certain. Here we came in with the idea that we were to learn medicine. We discovered, however, that instead of studying medicine, we were on course to study humanity. We found friendships and failures, victories and heartbreaks; who laughed out loud undeniably and who just could not get along.

This magazine also has its own heartbeat, in my opinion. Eventually, readers will read what came out of boring blank pages that were broken off into tidbits of ideas and promises of becoming something, lost copies of drafts, misread and misunderstood thoughts that had to be rewritten, submissions that were never supposed to be made, and other moments when the will to commit to the project was gone even though it was a good idea in the beginning.

The days of having to balance being a final-year medical student and an editor were more unfathomable than ever. Which was why there were differences of opinion, a host of unplanned additions and corrections, missed calls, worries about designing, and always an inkling that, no matter how hard you try, one thing won't be right.

Maybe it wasn't perfection that we were aiming for, though.

Each problem, each stumble is a part of a narrative to which it never came close to telling the end of. You can choose from a plethora of articles to read, and behind each one is someone with the courage to write it. There is a budding photographer behind each of the photos. With each illustration is somebody's imagination. Beyond each and every page, a shadowy host of hands motivated not for recognition, but for creation.

At times, seemingly contradictory themes come up in the themes of this edition: Perfectly Absurd. But does not medicine come at a paradox? We learn year after year the fragility of life, and we strive in our efforts to maintain it. We celebrate survivors, but we are aware that not all things are rosy, and we rejoice in those that remain. In a job where uncertainty is sometimes part of the job, we are working without getting tired for sure.

Similarly, college life is totally chaotic.

An inability to get a lot of sleep leads to us complaining about it, yet, at some point, we forget about all that in our future.

We hurry to get out of these corridors, and live our lifetimes inside of them in our minds.

We count semesters and in the future we'll count memories!

Maybe absurd is a different form of beauty, looked at from afar.

It's the kind of thing that Parallax has long sought to portray.

Parallax, if seen from different views, there is an apparent change in an object's location in astronomy. In reality, the truth never changes and viewpoints change. Each submission in this section is an invitation to noteworthy second readings, to questioning and wondering that this same world can seem very different from one view.

EDITORIAL | III

At the present time, we are much more thankful than we are nostalgic, as I write these last ditch words,

To every writer that entrusted us with their thoughts.

To all artists who have made this art of imagination come into visuals.

To all whose unstated talents made these pages come to life.

To all the readers who still have faith that in spite of all prescriptions and diseases, literature still has an area in the domain of medicine.

Thank you.

If, in all, these pages cause one to stop for a moment, to think a little further, to smile at something he did not expect, or enter with a sense of hope for having their problem brought to someone else's attention, or for others to have experienced the same; if it were to cause any of these, it was worth it.

This brings my last post for Parallax to an end, but I hope that it was a first for others in my running shoes. The magazines continue to live on for each successive generation, giving not just responsibilities, but legacies to the next. I hope that the future editors continue to attempt to dig up the hard questions, champion truthful voices and never be afraid of perspectives that are unconventional.

The end of dreams is quite bizarre. They don't end with a big round of applause. Most often, though, they lie out of the mind because there's the last page and the closing sentence, and that something that seemed beyond possibility has somehow been.

Maybe that's the quintessential silly thing about it all.

A heartfelt vote of thanks to Agnik, Raisa, and Ruchika, whose creativity, commitment, and unwavering support, along with the entire design team, turned this vision into reality. A special shout out to Neelanjan and Aritra, the dependable pillars of the Med-Darpan, who were always just a call away whenever the need arose. Thank you all for being an indispensable part of the journey of PARALLAX.

EDITOR'S LETTER



Agnik Chatterjee
Batch 2023-24
Associate Editor of Parallax

There is a very peculiar cruelty to beginnings.

The first day you step through the gates of the medical college does not announce itself as the prologue to one of the most transformative chapters of your life, you get to know while shifting through unending textbooks, hurried introductions and corridors that confuse you. Such was the beginning of this magazine - a wild, hurried, uncoordinated effort that somehow gained momentum thanks to all of you! Med-Darpan is an act of quiet defiance against the limitations that so often accompany the pursuit of something new.

Late nights in the middle of June, just before my semester, I decided to take on the mantle to pioneer the English section of an unfinished sketch - this magazine. The task took all I had to offer, facing relentless additions, differences in opinions and some criticisms without solutions. I feel like creation has always demanded an unusual kind of courage, the courage of defiance against knowledge; I write this without knowing if anyone would pause to look, submitting myself to you, dear readers, who owe me neither agreement nor applause.

Perhaps this is why the first issue of this magazine feels miraculous to me. It is not flawless - far from it. Every page still carries the trace of the blood and sweat the whole team poured into it. It bears the fingerprint of every hurdle we overcame, but perhaps this is what gives it character. Providing a medium to the unspoken voices was a dream to me since I started my degree, and watching the seeds come to fruition is honestly dimorphous. The victory belongs to those willing to venture into uncertainty armed with little more than conviction -

To wet the quill before knowing which words resonate,

To uncork the paints before an inspiration,

To preserve a fleeting thought against the relentless river of oblivion -

Trusting that this letter in a bottle may not go adrift.

An ode to kindred minds.

EDITORIAL | V

The theme for this issue, Perfectly Absurd, preserves what we strive for. Medicine is already an exercise in contradiction, riddled by never-ending exceptions – none may be predicted. We slowly yet surely learn to identify patterns in the perpetual desert to impose order on the chaotic flesh. We hold life at its most fragile, and yet continue on the parapet to restore smiles. Yet, not having reached my final year, I probably should not be too free-spoken about medical cases – you know why ;)

I arrived shapeless and was moulded into who I am by this college, the voices in it. It is perfectly absurd how no one is prepared for what's coming, yet everyone has an opinion – maybe this absurdity is the force binding us together. The sound of pages turning in exam halls where everyone pretends to know, the relief behind a cancelled lecture, the brief laughter emanating without reason – the simplicity of it all is probably what romanticises this phase. The strangely normalised exhaustion behind all the faces is what makes us a community, ambition and weariness coexisting without resolution.

In my first year, I felt the lack of representation of English literature in our college. Over time, I realised the potential you all have, and I was in search of a medium to see it through. I slowly found myself drawn to the process of building a collective space where expression exists without justification. Thank you all for helping me reach my dream of building a theatre dedicated to literature, where none is outlawed.

I sincerely express my gratitude; if there is anything this journey has taught me, it is that creation simply demands willingness. The willingness to initiate without guarantee, to strive without assurance and to complete without perfection. A magazine can never be, in its truest sense, finished. I await the next set of voices who inherit it and have the courage to be its walking stick for the foreseeable future.

And so, as the first issue – the Abhaya issue – reaches your hands, I invite you all to read, question, contribute and most importantly, continue. We are all, in the end, unfinished stories and long after the pages have turned, what remains must not be the magazine but the imprint it had by your quill.

“All the world’s a stage, and all the men and women merely players.” - play the world to your whimsy, dear writers.

EDITOR'S LETTER



Arya Das
Batch 2023-24
Assistant Editor of Parallax

I have always believed that memories are fragile things.

They rarely announce themselves while they are being made. They exist quietly in conversations outside lecture halls, in hurried cups of tea before postings, in laughter echoing through hostel corridors, in friendships that form unexpectedly, and in countless ordinary moments we seldom realise are becoming unforgettable.

When I first became a part of this magazine, I imagined it as a collection of writings. Somewhere along the journey, it became something much more. It became an attempt to preserve a fleeting

chapter of our lives before time quietly moved us beyond these walls.

Medicine teaches us to remember anatomy, pathways and protocols. But it also teaches us humanity, resilience and compassion, lessons that rarely find a place in textbooks. This magazine belongs to that other curriculum. Every poem, article, photograph and artwork within these pages reflects not only talent, but the people behind them. Different voices, different stories, all bound by one institution we have the privilege to call home.

As an editor, I have read every submission more than once. Some made me pause, some made me smile, and some reminded me that creativity continues to thrive even amidst the demanding rhythm of medical education. They reaffirmed my belief that behind every future doctor is an individual with stories waiting to be told.

Years from now, we may not remember every lecture we attended or every examination we wrote. But perhaps we will remember a page, a photograph, a familiar name, or a piece of writing that transports us back to who we once were.

If this magazine manages to preserve even a small part of that journey, then every late night, every revision and every conversation behind these pages has been worthwhile.

May these pages become not just a record of a year, but a memory that outlives it.

EDITOR'S LETTER



Kazi Raisa Naznin
Batch 2024-25
Assistant Editor of Parallax

If I had to define 'Serendipity', it would be how I got the Editorial post for MED-DARPAN. Literature has always fascinated me. But little did I know that my love for reading and writing would find me at this strange juncture. Our theme this month is 'Absurdity'. Initially, I thought of it as a distant idea, a philosophical concept. But as I sat with it, I realised how familiar it really is. As I read through the various submissions, I realised how we all look at the same things and end up with different perspectives. If we ever sit down and think about anything long enough, we would realise how riveting and how ridiculous everything truly is.

The number of ideas, stories, poems, essays I have gone through, the discussions that I have had over the last month have enriched me in ways more than I can describe. The knowledge that something exists in the world because of our own efforts is something that I will carry with me long after.

Now, as I put down the last few pages of the Magazine, I don't know if this Magazine answered any questions for me. But it certainly gave me better ones.

And, if this Edition leaves you seeing the ordinary just a little differently, then every conversation behind these pages has been worthwhile.

EDITOR'S LETTER



Ruchika Bhow Singhka
Batch 2024-25
Assistant Editor of Parallax

I've always loved magazines. As a little girl, I remember flipping through the glossy pages (or, as current technology would have it : a PDF) to witness text and image combining in the best way possible. In my humble opinion, magazines are arguably better than books and movies, it is the right mix of education and entertainment.

This is exactly what MED-DARPAN is, a perfect blend of art and medicine. Whether you're an aficionado of unique medical cases or a literary enthusiast, this issue has something for everyone.

Putting together this bundle of stories, photography and art has been a "Perfectly Absurd" experience in the best way possible!

I really hope this issue brings you a fraction of the joy it took to make.

Working on this edition has been a unique experience every literary nerd dreams of. Being a part of this magazine and making my small contribution has been an enriching journey that goes beyond mere textbooks. On that note, I would like to thank every single person for their contribution.

ENGLISH

PARALLAX

MAGAZINE



P R O S E

“Don't use a five-dollar word
when a fifty-cent word will do.”

Ritual

Sneha Das

Batch 2022-23

How absurd, I thought, to be remembered so faithfully by something incapable of memory.

Perhaps that is why we become attached to certain coincidences; we spend so much of our lives searching for permanence that we begin to find companionship in the unlikely places: the old sweater we refuse to throw away, that particular song which always finds us when we are feeling little too low, the big tree outside our childhood window that was once a small sapling, the smell of a book that carries us back to the day we first read it, and the rain that never fails to visit us on ours. cut cakes, sing the same song, make wishes over extinguished flames, and pretend time is moving forward instead of carrying pieces of us away with it. Perhaps, as Albert Camus says, is because, we humans desperately seek meaning in an indifferent universe. The universe never answers, but sometimes it sends rain.

It has rained on my birthday ever since I was born. Yes, even on the day I was born. Now, this is not a memory of mine. It is merely a story I inherited.

You know, the kind of story families tell so often that it settles into your bones as though you had witnessed it all. They say the sky had darkened long before I arrived. The roads glistened under sheets of water. Umbrellas turned inside out in the wind. Somewhere amid the noise of hurried footsteps and anxious waiting, I entered the world to the sound of rain striking rooftops. You know, the kind of story families tell so often that it settles into your bones as though you had witnessed it all. They say the sky had darkened long before I arrived. The roads glistened under sheets of water. Umbrellas turned inside out in the wind. Somewhere amid the noise of hurried footsteps and anxious waiting, I entered the world to the sound of rain striking rooftops.

Years have passed since then, as they inevitably do. The rain has not missed a single birthday of mine.

Every year, as August approaches, the sky remembers before I do. Clouds gather quietly at the horizon, the air grows heavier, and anticipation settles in. Then, almost ceremonially, the first drops begin to fall.



(Contd.)

As a child, I hated this ritual. Rain stole the birthdays I had imagined for myself. There were no spontaneous outings, no carefree celebrations. Every plan carried the possibility of cancellation. Every celebration came with damp clothes, muddy roads, and the faint disappointment of having to stay indoors. For years, I believed the rain ruined my birthdays. But how strange! When I think about it now, how wonderful it is to be “remembered so faithfully by something incapable of memory”. Friends forget to call. People drift away, as people inevitably do. Some birthdays arrive during years when celebration feels unnecessary. Traditions change. Expectations dissolve. There were years when I barely acknowledged the day myself. Yet the rain never failed to arrive. It is strange because the clouds know nothing about calendars. The monsoon does not pause over my little corner of

of the world with affectionate intent. The sky does not love me, and yet, year after year, it returns with unwavering punctuality. Perhaps this is what it means for something to be perfectly absurd.

We know these things cannot love us

back. We know they carry no memory of us. Still, we return to them because they remain when so much else changes around us.

There is a quiet comfort in that. Every year, on the anniversary of my existence, the sky opens above me. I still cannot decide whether it is welcoming me into another year or grieving the one I have left behind.

Perhaps it is

doing neither.

The world is indifferent. It is unpredictable. It is probably simply carrying on in its own rhythm.

But somewhere between childhood disappointment and adult expectations, I stopped wishing for sunshine.



Absurdly enough, I began waiting for the rain.

There is something deeply romantic about being able to count on something you can't really have expectations from.

And if the world insists on speaking in coincidences and absurdities, this is the perfect absurd ritual I have chosen to keep.

Illustration : Surajit Roy (2024-25)



The King

Adrita Bannerjee

Batch 2025-26

"Should we let him be executed, Zlatan? He knows too much."

"But if he goes down, he will take the whole drug market with him. We are already at a loss."

General Hensly and General Zlatan are troubled by the order of execution of drug lord Zuvinsky. They held a big share in the drug dealership of the kingdom of Bavaria.

Recently the ruler of Bavaria, Admiral Von Shoutenstien has captured Zuvinsky and is considering to execute the drug lord. Both the Generals were discussing about it in their chamber inside the Shaikenfort.

The Shaikenfort is basically the castle of Shoutenstein. It is not heavily guarded on the outside because any person who enters inside the Shaikenfort is destined not to leave it.

"I still haven't found out who that schizml is that's been stealing our drugs" said Zlatan. "I swear to my father's grave," said Hensly, "once I get my hands on him, I will squeeze the life out of that druazkl." Zlatan looked up

in surprise. "When did your father die?" said Zlatan looking utterly surprised, "I met him this morning."

Suddenly there was a loud knock on the door. "Generals", said the messenger from outside, "The Spounder wishes to have a word with you two." Hensly sighed. "We'll be there," said General Zlatan. The men put on their batches and left for his chamber.

Reaching, the men found Admiral looking at some papers on his desk. "Saute Shoutenstein" they said saluting the Spounder. "Ma' Spounder, you called for us" said Zlatan.

"Yes", said Admiral, "I've recently captured Zuvinsky. But there's been a mistake. A grave one". The Spounder's face darkened. "What happened, Ma Spounder?" said Hensly. The Spounder looked up and said with his head shaking, "I wanted to catch Jhuvinsky, the husband of Julia to threaten him to give me his wife and your STUPID ARMY brought THAT SCHIZML INFONT OF ME!" Both men looked down. Even the plants curled themselves before the wrath of the



Shoutenstein. It suddenly started raining as if even the sky feared for its life. "THIS IS THE THIRD TIME IT HAS HAPPENED. WHAT ARE YOU AND YOUR STUPID ARMY DOING GENERAL? IS YOUR ARMY FULL OF ILLITERATES!" Zlatan looked down in shame, in spite of knowing that it was the Spounder who spelled the name wrong in front of the army. "You know how I love her, don't you?" said Admiral with tears in his eyes, "I will get her. I will chase the Sun and the Moon to get her but I will not stop". "Forgive me, ma Spounder," said Zlatan, "I will make sure it won't happen again." The Admiral wipes his tears. "And now it appears that he is a drug lord," said Admiral, "If he was just a homeless schizml I would have him executed immediately, but since he is a drug lord, I would like to interrogate him before executing him" Hensly and Zlatan looked at each other "Hendrich Hensly and Zokowich Zlatan" said the Spounder, "you two are my most trustful generals. I entrust you with the job of interrogating the Zuvinsky."

Zlatan's face brightened. "Ma Spounder," he said, "we will extract each and every bit of information from that druazkl." He looked at Hensly who was still wondering how it suddenly became bright and sunny outside. Zlatan gave him a push. "Aw, oh yes..yes ma Spounder" he said coming to his senses, "we won't let any stone unturned to squeeze information from him." The Admiral looked impressed. "You are dismissed" he said. The men

saluted "Saute Shoutenstein" and left his chamber.

"He didn't get his name for nothing it seems", said Hensly, "I think I need to visit my doctor for my ears". "Oh shut up now," said Zlatan, "we are going to Zuvinsky's cell. This is the perfect chance to know who that rat is who steals our drugs" "umm, is it necessary?" said Hensly, "I mean, we will get our drugs and -" "YES!" shouted Zlatan, "it is necessary, now come!" "Okay okay, just let me do the interrogation okay?" said Hensly.

Zuvinsky sat plainly in his chair. It seemed that he waited for his day of judgement. The two men closed the door and Hensly pulled a chair in front of him and sat on it. "Alright Zuvy," he said, "we are here to interrogate you" Zuvinsky looked at him. "That's not my name," he said, "call me Zaikh Zuvinsky. Not any stupid name". Hensly looked flabbergasted. "Anyways, I am here to interrogate you and -" "WHY," said Zuvinsky, "weren't we partners?" "Oh shut up please" said Hensly, "Admiral's orders. Now before you start, I want to let you know that you are looking at the one who has extracted information from criminals like feathers from a chicken. I am the best. So think twice before lying. Is that understood?" Zuvinsky sighed. "Yes sir," he said.

"Tell me about yourself," Hensly said. Zuvinsky started saying, "My name is Zaikh Zuvinsky. I am the biggest drug dealer in the kingdom of Bavaria. I have

smuggled drugs since I was a toddler. I have smuggled drugs in the USA, China, USSR, England and-

"Let's ask some serious questions, shall we?" said Hensly, "First question, are you vegan?" Zuvinsky frowned and looked at Zlatan who was as confused as him. "No," said Zuvinsky. "Okay," said Hensly, "Do you eat fruits?" "Sometimes," replied Zuvinsky. "Is that's a serious question?", said Zuvinsky. "YOU DON'T SPEAK", screamed Hensly, "you speak when you are told to". Zuvinsky and Zlatan again exchanged confused looks. "Okay," said Hensly, "do you like apples?" "WHAT ON EARTH DO YOU THINK YOU ARE DOING?" said Zlatan. "Why, getting info out of him," replied Hensly. Zlatan sighed and pulled him out of the chair. "Get out. Let me see," he said. "The best it seems," Zuvinsky smirked.

"Okay Zuvinsky. I don't want to kill you and you don't want to die either. So, listen to me...you co-operate with me and I'll co-operate with you, okay?" said Zlatan. Zuvinsky nodded softly. "Okay," said Zlatan, "So-" "MAYBE WE SHOULD ASK HIM ABOUT THE VEGETABLES" Hensly shouted. Zlatan glared at him. "Get out," he said.

"But, I am-

"Get out"

"But-"

"GET OUT OF THIS CELL!"

"Okay."

Hensly went out of the cell and closed the metal sliding door making a great deal of noise.

"Now," Zlatan said, "Let's pick up where we were, shall we?"

No sooner had this world left his lips he heard the sound of the door opening.

Zlatan looked behind. Hensly. Peeping through the small space that was made, if anyone can call it small. Zlatan glared at him. He closes the door.

Zlatan turned to Zuvinsky to continue the conversation and again he heard the door open

"WHAT ON EARTH DO YOU INTEND ON DOING, HENSLY, THE BEST!" screamed Zlatan.

"I want to watch," said Hensly, "please?". "Oh GOD!" sighed Zlatan, "Come in. But don't disturb me otherwise I'll shoot you" "SUUREEEEE", said Hensly jumping inside and closing the door.

"You have anything to say, Hensly?"

"Nope"

"You sure?"

"Yup"

"You have nothing to say to this prisoner?"

"Nopsie"

"Nothing?"

"Nothing"

"Okay then", Zlatan turned towards Zuvinsky.

"Maybe we should ask him about the apples", he whispered, "it is important. Just a suggestion."

Zuvinsky saw the General transitioning from a White European to a Red European. He even thought he reached

for his gun but somehow Zlatan managed his anger. "What is his obsession with fruits?" thought Zuvinsky.

"Hensly," said Zlatan, "go to that corner and stand like a statue. No movements, no statements, no suggestions, no whispers, nothing. Do you understand?"

"Yes sir", said Hensly.

"So," Zlatan said looking at Zuvinsky, "you know there was someone who you are hiding. There is someone who is taking out our drugs and selling them at their discretion..." Zlatan narrowed his eyes. "He is standing just like a status isn't he?" said Zlatan. "Uh-huh," said Zuvinsky, "Just like the Statue of Liberty. He ain't even got a torch, what is he even holding?" Zlatan looked at Hensly, standing with his one arm on his side holding his hat and the other one stretched holding something that's probably not visible to normal humans.

Zlatan sighed. "Ignore him", he said, "Tell me who is the person who stole or took the drugs. I know it cannot be done without your consent Zuvinsky". Zuvinsky paused, and said "Shall I tell the truth? I won't be penalized, right?" "No", said Zlatan, "you may tell the truth and if you do I assure you, no one will ever possess strength to even scratch your body." "Okay then," said Zuvinsky, "it was our little Liberty over here". "That's a code name, I assume?" said Zlatan. "No," replied Zuvinsky, "It

was Hensly", Zlatan turned toward him with threatening eyes and Hensly avoided eye contact, while still standing like the Statue of Liberty. Zuvinsky continued, "And that's why he is trying to avoid the interrogation. He even paid me extra for it."

Zlatan dashed towards him, held his collar and pinned him to the wall. "Give me ONE GOOD REASON why I shouldn't kill you right here," said Zlatan. "Well," Hensly said wincing, "the fact that I know you were also associated with the drug market and misused the Spounder's trust." "SCLINK AKH BUSHTANK!" screamed Zlatan as he let go of him. "You druazkl! I will take care of you once I deal with Zuvinsky."

”

**Give me
one good
reason why I
shouldn't
kill you
right here**

”

Days passed. Shoutenstein ordered the execution of Zaikh Zuvinsky by poison gas. Zlatan had reassured Zuvinsky that he won't die but he might have to act dead. Eventually the dreadful day came.



Zuvinsky was dragged to the poison chamber. No signs of struggle was seen from him. The guards had been convinced that the drug lord Zuvinsky has accepted his fate. The door was closed and the signal was given. General Hensly and Zlatan were standing sombre. "Have you done the job?" Zlatan whispered. "Yes," said Hensly, both maintaining their sombre attitude. The second signal was given from the control room and poison gas started filling the chamber. Screams of pain and struggles were heard from inside until a time came when it was all silent. He was taken out and the medical examiner who was paid by Zlatan declared him dead. The guards came to dispose of the body. They saw Zlatan standing before the body. "Saute Shoutenstein" they saluted. "Guards", said Zlatan, "This body is of a very influential person. We must dispose of this body with extreme precision. That's why the Spounder has entrusted the job of disposing of this body to me and General Hensly. You are dismissed." The guards saluted their general again and left.

The body was brought to Hensly's private chamber. "Now," said Zlatan, "We just need to make arrangements to take him out of Bavaria. Let him be here and let's see Shimyond."

The men returned after a few hours. They entered the room but found it empty. "This is bad!" exclaimed Zlatan, "Where did he go!" They searched each

and every corner of the chamber but there was no one to be found. They hit the streets to search for him. Searching for him, they reached the city market, where they saw a pretty peculiar sight. The whole market was in disarray. Everything is scattered. Everyone was scared, running. Suddenly they saw an even more macabre view.

There was a person on a donkey in the market. The donkey was running wild but the person was even more wild. He was wearing nothing but undies. He has a cap over his head and was screaming, "MY NAME IS ZUVY, THE GREAT. I AM THE KING. THE KING OF ENGLAND! BOW BEFORE ME OR DIE!"

Zlatan couldn't decide what to watch - the donkey or the man's undies

"Hensly"

"Yes?"

"Is that Zuvinsky?"

"Yes it is."

"Why is he riding a donkey?"

"I am as confused as you are"

"What did you replace the poison with?"

"Umm...well...orange juice?"

"Orange juice?"

"Yeah."

"Really?"

"Yes."

"YOU REPLACED THE POISON WITH ORANGE JUICE!! ARE YOU OUT OF YOUR MINDS!"

"That was the only thing that came to mind."

"Oh God...anyways whose undies are those?"



"Mine."

"Oh Hensly not the bottom one."

"Yep that's also mine."

Zlatan looked at him

"Why do you have a bra? You haven't even married anyone"

"I wear them."

Zlatan was much to baffled and disgusted to talk. He was at his wit's end.

"We need to catch him" said Hensly and the two men began running behind him. They ran and ran and ran but couldn't catch the undeclared king of England. Perhaps the donkey was way more daring than Bucephalus. At one point of time they lost him.

"We should return to the Shaikenfort", Hensly suggested, panting heavily, "I'll conjure up something to say". "Yeah we should. Come on" replied Zlatan catching his breath. They returned to the Shaikenfor. The men were trembling in the fear of Shoutenstein's wrath. But suddenly they saw Zuvinsky again. This time he had a girl behind him. The girl was scared beyond wits. He screamed, "I AM THE KING OF ENGLAND. YOU ARE MY QUEEN. COME, WE WILL GO TO OUR CASTLE!"

This time the men didn't even try to catch him. They knew that their days were beyond numbering. The men knew there's nothing to do. They choose their last words of affection. "Hensly, I know I have been very harsh to you. Although you have been so

inappropriate, stupid and senseless, you have been my best friend. No one will ever match my feelings for you." Zlatan said with tears in his eyes as he walked down the hallway. "Oh Zlatan. I know. You are the only person who would support my nonsense. You are my brother", said Hensly. Both the men started crying. "You too are my brother," Zlatan said, "Hensly, I love you." They hugged each other knowing this would be the last bit of affection each one would get. "Oh Hensly, I am so sorry." "Oh Zlatan, I am gay." "What?"

Suddenly they heard a loud noise from inside. They rushed inside the Spounder's chamber. Admiral beamed on them as they entered. "Hensly, Zlatan! My beloved Generals," Admiral said, pointing at Zubinsky "this man has found Julia for me!" This man fought with Jhuvinsky over this woman so fiercely that all his clothes were torn. I, Admiral Von Shoutestine, hereby make this person the Senior-General and my personal adviser." Both the Generals just had one thought: how on earth did the Spounder timidity the King of England? Hensly whispered to Zlatan, "Where did the donkey go?" "Well," Zlatan shrugged, "Maybe he found a new one."



ROSE

Ahana Ghosh

Batch 2023-24

Sudhir stood outside the florist's, staring at the flowers in front. A giant display of every flower you could think of, pinks and reds and yellows, balanced by the soothing green from the leaves. Tiny droplets of water rested on the petals, looking like glittery stones. The air was laden with the intoxicating smell of roses, and if you took a deeper breath, you'd be able to smell the lilies and the carnations too. Sudhir's usual tired eyes seemed brighter than usual. He stood entirely still, entranced by the vibrance and hypnotized by the air.

"Are you here to get roses for your pretty girlfriend, sir?" a high-pitched voice squeaked right beside him, making him jump.

"N-n-o, NO!No?", he stuttered and then frowned a little, confused about why he was there in the first place. The shopkeeper continued to look at him with a smile, making him uncomfortable.

What flowers does Ruby like? He thought. Maybe roses? Or tulips? Maybe something else entirely?

"Sir?"

"OK, Ok, I'll take the roses. Yes, the roses should be fine, yes. Every girl likes roses, yes." "The red ones or the

yellow ones, sir?" said the shopkeeper, smiling even wider than before.

To this question, Sudhir paused and pondered a little bit.

He didn't know Ruby personally; she was his neighbor's daughter. She lived in another state but was visiting for a while.

Ruby's mother, Mrs. Gupta, the lady who lived in a flat directly opposite his, had decided that it would be a great idea for them to "get to know each other," a proposal Sudhir had

squeezed his way out of many times before. However, a recent visit from his own mother had changed the dynamic between him and Mrs. Gupta, as well as the other neighborhood ladies. They seemed to have successfully instilled a fear in his mother's mind about her son's emotional and physical well-being in the absence of a woman in his life. The events that followed led to this point of Sudhir standing in the florist's shop, getting flowers for a girl he didn't want to know. He sighed. "Yellow ones look fine."

"Very well, sir," said the shopkeeper, deflated. "We're giving mystery boxes with every order at the moment. No, you can't refuse, here are your

flowers," she said mechanically.

Sudhir sighed again, and again, all the way back home, carrying a bouquet of yellow roses and a little box with a red bow.

Back at home, he put the flowers in a vase, promising himself that he'll most definitely see Ruby, but maybe not today. *Tomorrow, yes, tomorrow is always better.* He planted the seed from the mystery box in a little pot, right by the bedside window, and watered it carefully before plunging into his bed, too tired for anything else.

The next morning, he got up late. Within 10 minutes, however, he was ready to leave, but not before fixing his hairstyle in the mirror twice and pouring a little water into the pot beside the window. Stepping out of his apartment and onto the street, he noticed Mrs. Gupta and her train of aunties marching towards him, looking all worked up. A name flashed in his mind, that of a gemstone, one that he had recently started to get wary of. He pretended to be on a call before hailing a taxi and leaving before the army of aunties could catch up.

When he came back, in the evening, he noticed a small sapling, a tiny shoot with two pretty green leaves, had sprouted from the mystery seed. The next morning, it was even taller. "An impatient one we have here," he smiled. He caressed the leaves and said, "Maybe I should just go see Ruby today. What do you think, little one?" A plant, of course, doesn't reply.

He stared at it for a while. "I'll call you,

Rose."

"You're beautiful," he said and smiled again before leaving for work.

When he returned, it was quite late in the evening. He did not turn the lights on. The moonlight from the windows pooled into the flat. The only sound was that of the cicadas buzzing.

The yellow roses greeted him, and he sighed again. But something grabbed his attention.

There was a strange smell in his flat. It seemed to come from his room. The unmistakable smell of roses. His hair stood on end. A wave of fear rippled through his body. He tiptoed to his room and turned the doorknob ever so slightly. Through the crack in the door, the the intense, maddening scent overpowered his senses, and the next moment he found himself standing inside his room, looking at Her. For the first time.

A girl, no, a woman. Pale, paler than wheat. From her head came out green tendril-like hair, right up to her feet. She had covered herself with a blanket from the bed. Only her hands and feet poked out of it. But the thing that shocked Sudhir the most, was her eyes. They were white with a blood red dot in the center, yet when the light hit her eyes, they shone and looked more purple than red.

"Wha-what are you?! Sudhir gasped.

"Rose," she said, her voice was light, almost sing-songy. Yet when it hit Sudhir's ears, it hit Sudhir's ears, it sounded like a cuckoo's calling.

The room felt like a garden now, despite the fact that there was only

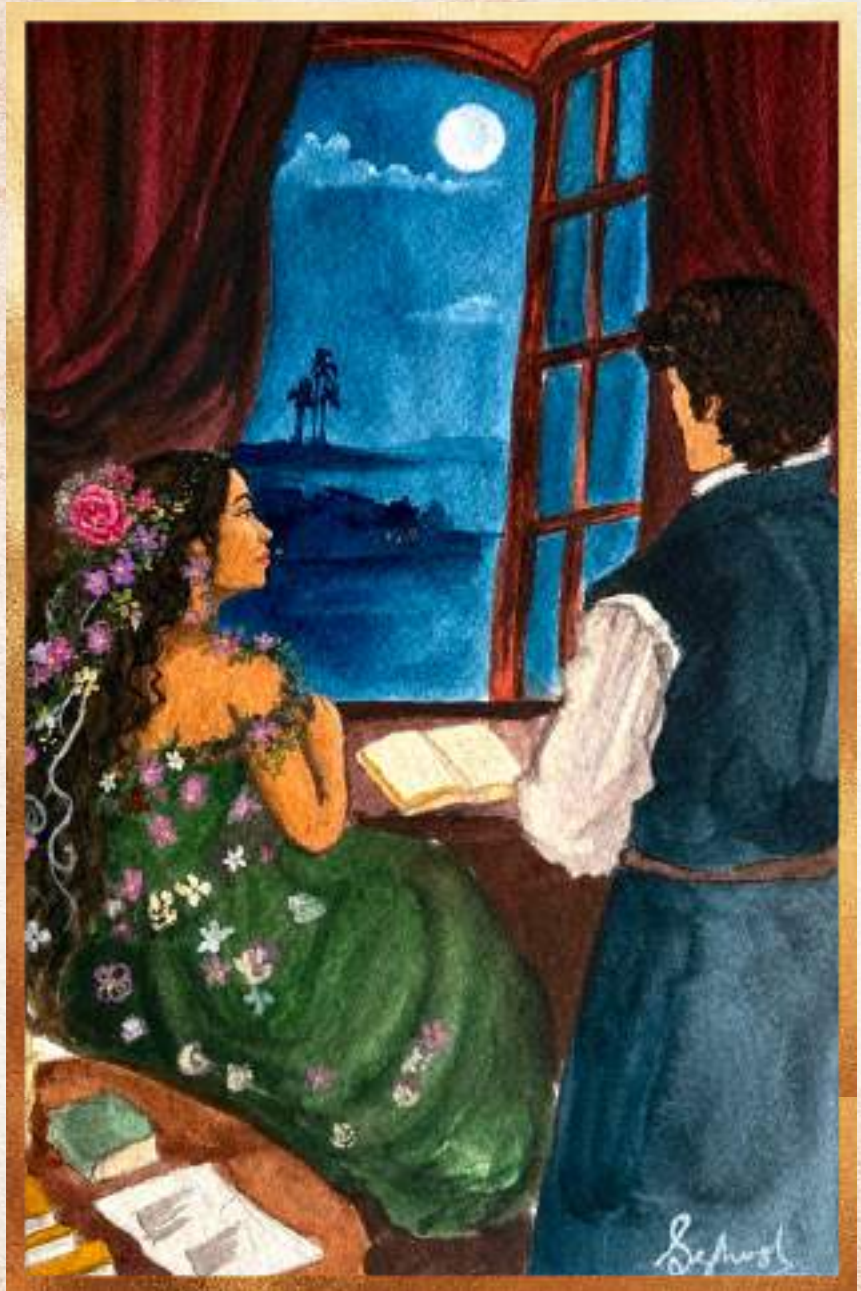
one flower there. The smell of roses filled the air, a sweet but bewitching scent.

"Ho-How? Wh-what is this? Why? How did you get here?" Sudhir asked again, pointing towards the door. She shook her head.

"You're beautiful," she said and smiled. A row of crooked teeth appeared. Suddenly it hit Sudhir. The mystery seed. The pot beside the window was empty now. The plant was standing beside it. On two legs, wearing a blanket. Sudhir burst out laughing. He couldn't believe what was happening or even the outrageousness of the theory he had just come up with. Then he heard it. She was laughing too. A shrill, ringing laughter.

The next morning, Sudhir lay on his bed, looking at

the ceiling. The events from the previous night felt like a distant dream now. He didn't remember much of what had happened either. A nonsensical yarn woven by his own thoughts. He tore himself from the bed to get ready, all the while stealing glimpses at the plant by the window side. It was bigger than yesterday, fuller with green, and with a solitary flower at the top. It was pale, paler than wheat, with red in the center.



Sudhir had a rough day at work. By the time he reached home, he had no energy left. He fell onto the bed and into a deep slumber. When he woke up, it was midnight. The smell was stronger today. There was something else, the woman.

She was sitting on the windowsill, draped in leaves. The moonlight fell on her face, bouncing off her soft features

Sudhir continued to stare, unable to move. The room around him seemed to dissolve into darkness, leaving only her. A bright angelic figure, who had somehow lost her way to the heavens and now sat in front of him, blessing his senses. The smell of roses floating around him, around her, made him drowsy. When he opened his eyes again, she was sitting beside him on the bed, huddled up in the blanket. She looked much more real now, even like a child. But beneath the serious countenance, Sudhir sensed something else, an eagerness. For what? He didn't know. She was staring intently at him.

"What are you looking at?" Sudhir asked.

She pointed at his stomach and then produced a fruit from inside the blanket.

"You want me to eat that? I am hungry, I guess." Sudhir smiled and took the fruit. It was an apple.

Turning it in his hands, he noticed the sticker on one side of the fruit. The girl stared straight at him.

He chuckled. "Where did you get this, Miss Rose?"

She pointed towards the kitchen, eyes still fixed on Sudhir.

Sudhir found himself laughing again. The air now felt lighter. He felt as if he knew her for a long time now. Perhaps they had met before, when they were children. And then when they were teenagers. Again and again. He felt as if he had laughed like this with her a million times before.

A mischievous thought crossed his mind. Sudhir went to the kitchen. She

followed him. He took out the red food coloring and mixed a few drops with water. Then proceeded to give it to the girl. She drank it. But nothing changed. "Maybe it'll take time." He thought out loud. Her eyes drew closer in a curious frown. "Do you know my name?"

"Sudheeeeer," she sang.

Sudhir smiled.

"Can we be friends, Miss Rose?"

"Friend!!" She cried out, her nose turning a deep shade of red. She looked in the mirror on the wall above the basin. "Rosey!!" she grinned. Sudhir burst out laughing as the color rose to her cheeks and ears.

In the nights that followed, sometimes she would mix colors herself and drink them, just to make Sudhir laugh until tears rolled down his eyes. On other nights, Sudhir would stay up late for work, and Rose would be there, right beside him, helping as much as she could.

Then she would give him fruits to eat from the kitchen. And they would sit and talk for hours until the first rays of the sun would take her away from him. Earlier, there was no one to listen to Sudhir. But now, all his words had found a home. He would talk about his life, his childhood, his struggle to build a life of his own. He would go on about his days at work, the colleagues that annoyed him, his likes, his dislikes, and during all of it, she would listen. Never telling him he was too much or too little. When the sun set, Sudhir knew he could relax and let go. That all his complaints now had ears that would receive them. All his jokes had

lips that would smile at them.
This was new, having someone wait for him at home. And soon it would become a habit.

Habits can work in weird ways. They can make even the most incredible things seem ordinary.

"Hello? Hello Sudhir? Hello?"

"Yes, Mother, I can hear you."

"Oh, why didn't you see Ruby yet? Mrs. Gupta called me again. She's worried for you, son.

You shouldn't disrespect her so."

"Is that why you called? How's Father?"

"Hello? Oh this stupid signal... What did you say? Your father? Oh, he's not fine, dear. His friend Mrs. Das? Remember her? Her son has taken over their family business."

"What's wrong with Father?"

"Oh, need there be anything more dear? He is always worried about the business. At his age, he shouldn't be so stressed. Son, you can always come back if you don't like your job.

You don't have to work, you know that."

"Yes, Ma, I do like my job still. Did you eat today? You both should take some days off sometimes too, you know."

"What? No, do you even care about anything I tell you? You didn't even visit this month. You won't even get married! It's impossible..."

Sudhir put the phone down.

It was raining heavily that day. The rain drops, cold and relentless, fell on

Sudhir as he rushed into his apartment. The dark clouds the sky. He couldn't see whether the sun had set. Rose wasn't there yet.

Sudhir opened the window and sat next to the pot. The rain drops fell on his face again. The piercing sound of thunder rang in his ears.

He had always lived alone in this room. But today, he felt as if the emptiness would swallow him whole. Every minute felt like an hour. Every movement made him look up. The rain stopped after some time. So did the thunder. Leaving a profound, painful silence. Time went by slowly, as if



**She had
raindrops on
her hair.
They shone
like tiny stars
in the
darkness...**



teasing Sudhir, showing him how helpless he truly was. Finally, after what felt like an eternity, the dark clouds shifted, letting the moonlight shine. And in the blink of an eye, she was there.

She had raindrops on her hair. They shone like tiny stars in the darkness,



reflecting the light of the moon. Her usual pretty face bore a melancholic expression. She sat perfectly still on the windowsill, dressed in a robe of leaves. An otherworldly creature. An angel.

"My mother called today."

Her soft eyes settled on his. Sudhir took her hand in his. Her hands were delicate, like petals, pale, with long fingers, fragile.

"She spoke about Gupta again. Her daughter. Mrs. Das. Her son's handling family business.

Why don't you and all"

Sudhir glanced away, tightening his grip on her hand. She placed another hand on his and said, "Ask about you?" in a voice ever so gentle, like feathers falling through the air.

"No. She spoke about father. And their expectations. That is all. Because I get everything wrong. Always!"

Tears streamed down Sudhir's cheeks.

"No matter how hard I try, she never has time for me.

There is always this other thing that I am failing to do as a son!"

She held his face in her hands and wiped away his tears.

"Ruby likes Sudheer?"

Sudhir cringed at the name. "No. They care about money, that's all. And that too, my father's. There is nothing and no one..."

Sudhir didn't remember the last time he had cried like this before. It felt like all the sadness inside him had finally had enough and decided to rush out of him, like a hailstorm, of disappointment and self-loathing. He

would break into a million pieces here itself. In her arms. In this light. In this softness and warmth.

Breaking through the black, he only heard her voice.

"You're beautiful, Sudheer. You're loved. You're safe here."

He shook his head. Again and again. Crying about things he would've deemed pointless had it been anywhere else. Anyone else.

"They are bad, Sudheer.

They should not hurt Sudheer.

Sudheer should be loved."

He felt like he could hear it forever.

The sweetest of all songs. Gentlest of all salves. Here he didn't feel like

Sudhir, the office-going, confident gentleman, who had life all figured out.

Here he was a wounded child, weeping in his mother's lap.

Little did he know, just outside of his room, one hand length away, the curtain inside the window facing opposite his, slowly moved back down, concealing the figure behind.

Sudhir hated the mornings. He hated going to work. Hated having to speak to people. But isn't that how he always was? He couldn't remember a time when he enjoyed going to work. *The nights are better, because I can rest. Yes, no more reason than that.* During the day, everyone rushed around, everything happened fast. No one spoke of girls with green hair and red eyes that transformed into plants in

the morning. Sometimes, Sudhir would think to himself, maybe it's because it's so common an idea that nobody cared to mention it, that they all secretly harbored many such plant women beside their windows, and spoke to them under cover of the dark night, with only the moon to spy upon them. The yellow roses had wilted. Sudhir had bought new red ones for Rose on his way from work. He smiled at the thought as he walked towards his house.

"Sudhir!" He heard a man's voice from behind him.

He turned around. It was Suresh, his colleague and a chatterbox.

"So, Sigh Man, how are you doing these days? It seems like every time I see you, you're already leaving for home!"

Do
you
want to,
Sudheer?

"I'm fine, really."

"More than fine it seems," he said, eyes fixed on the roses. "So, are you going to see her?" he said, his eyebrows dancing.

"Who?" mumbled Sudhir.

"O come on! So, we'll soon get an invitation, right? Sigh Man weds who?" Sudhir smiled awkwardly and started walking faster.

"Are O Sudhir! See you tomorrow! Best of luck, man! Let's have coffee sometime!" Sudhir almost ran away. *Never turning at his voice again!*

Back at home, he replaced the yellow roses with red in the vase.

"They're beautiful, Sudheer", he heard Rose behind him.

"Not more than you, Rosey," he said without turning around.

"I want to ask you something," he said.

"Yes."

"Do you think I should see Ruby?" Sudhir said slowly, chewing on every word, his back still turned to Rose.

"Do you want to, Sudheer?"

A simple question. Yet it irritated him.

He turned around to face her. Her face was red again today. His favorite color.

He swallowed and said again, "I want you to say, Rosey."

She looked at him for a while. "Did Ruby make Sudheer cry?"

"No."

"Then yes," she said with a blank expression. She kept looking at him with her big red eyes. "You don't care if I see Ruby, that's what you're saying," said Sudhir, louder than he had meant to.

"No, but Ruby is a friend too?"

"No, when did I ever say she was my friend Rose? Have you lost it?! I have never even met her!" Sudhir was shouting now, anger taking control over him. He hated this.

But now there was no going back.

"Very well, if that is what you want! I'll see Ruby tomorrow. You don't have to bother about anything I say anymore!" Sudhir marched into his bedroom, slamming the door behind him. Her eyes welled up with red tears. Her lips shook. "You're good, Sudheer. You're beautiful," she mumbled.

He arrived earlier at the restaurant. He had brought yesterday's red roses with him.

But his mind was still disturbed from last day's conversation with Rose.

How stupid are you, Rosey? What do you want me to do then? Alright, I'll do it, at least she is a person and not a stupid plant! Yes, yes. You, Rosey, are a plant that I bought, nothing more.

The words kept running in a loop in his head, each time scratching away at his tender heart.

I'll live a happy life with Ruby, I'll talk to her and only her. She will be enough. Yes, yes, Rosey, you...

"Sudhir? Are you okay?" a loud grating voice.

Sudhir jumped to see a concerned Ruby already sitting in front of him. She just got here? Didn't she? What time is it?

"I'm so sorry, but we got a customer last minute, and I couldn't get out. Have you ordered already?" She picked up the menu. "I'm sorry, but where do you work?"

She grinned, "Oh! I just completed my postgrad, actually. I'm technically jobless as of now, but I am helping a

friend out at her tailoring shop these days. She is just starting out and could use some spare hands. She's. A. Mess. Right now. Anyways, I heard about you though, Mom talks a lot about you, to be honest. But when are you joining the business? Why do a job anyway? I wouldn't have, to be honest, if I were you..." She talks a lot, doesn't she?

"So what do you think?", asked Ruby.

"About what?"

"Your order?"

"Oh, a coffee will be fine, just black." Sudhir told the waiter.

"Really? Uhh, I don't get those people..."

Stop it already, you don't have to get why I drink what, you can drink whatever you want to. "Are those for me?" she said, pointing at the red roses in his hand.

"Oh, yeah."

"Ok, first of all, flowers? Thank you but, umm... I'm actually a bit allergic to pollen, so I'd rather not, sorryyy."

Allergic? To flowers? Who the hell doesn't like flowers?

"It's okay, alright."

"So, Sudhir, what's been on your mind lately?"

"What do you want me to say?"

"Umm, anything, really. Whatever you want to talk about?", said Ruby, smiling. Sudhir was looking away. Out the window. The sun was beginning to set. Soon it will be time for her to come.

"Sudhir?"

"Yes, yes. I was thinking about your mother." "Excuse me?!"

"Yes, mothers in general, actually. Do you like yours?"

"Umm, well yes, but sometimes she can be really annoying."

"Right? They think they can control the lives of their issues, that they naturally have a right to, don't you think?"

"Uh, well, I get where you're coming from. I mean, it's a way to look at it, I guess, but..." "But what, Ruby? To be honest, I wouldn't be very surprised if every person in this room here were plotting their own revenge against their mothers!" Sudhir laughed. A little too loudly.

Ruby looked at him with a perplexed face.

"What? What are you looking at?" Sudhir was still laughing.

"No. I don't think so really, that's a bit extreme, I think?" she said, confused.

"You're speaking as if you came here because you wanted to? No, right? I mean, they call me Sigh Man at the office, for Christ's sake!" Sudhir was still trying to laugh it off.

Ruby was not looking at him anymore.

"I wanted to come here," she said slowly.

Sudhir stopped.

She now looked him straight in the eye.

"And if you had any problem with this arrangement, you were fully capable of cancelling it, weren't you? Stop acting as if your mother is somehow responsible for this, Sudhir!" Sudhir felt irritated. Alright, so what did you expect from me? And what the hell do you even know about me and my mother or any part of my life!

"Ok, let's start this over, shall we? Let's try one last time?"

Sudhir wasn't listening anymore. The sun had set. He got up abruptly.

"Sudhir!" exclaimed Ruby.

He ran out into the street, ignoring Ruby's calls.

He stood outside his apartment. Panting.

A pair of red eyes flashed before his mind, and he quickly rushed in.

When Sudhir found her, she was sitting on the bed, wearing one of his shirts.

Lips pursed

and eyes frowning.

"Rosey?"



**She looked
even
prettier
when she
was mad.**



"Do you like her?"

Sudhir smiled. She looked even prettier when she was mad. Her face, her eyes, her hair, he

thought he could look at them all day.

"You gave her the roses."

Sudhir smiled even more. "If you keep meddling into other people's affairs then I'll have to

call you Nosey", he said chuckling.

"You gave her the roses and you...", tears streamed down her cheeks. She walked over and hugged Sudhir.



Sudhir stood frozen. He raised his arms to hold her, but they stopped mid-air. Her hair was green. But her skin was soft. And there was something more he hadn't thought much about before. He could feel her heart beat.

”

**Yes, it is
a girl,
and I love
her.
Happy?**

”

"Oi, Sigh Man!" Suresh plopped down next to Sudhir. He had biriyani on his plate. It made Sudhir's stomach churn, and his mouth taste sour.

"Hey, what's up, man? Are you on a fruit diet or something?" He pointed to the massive array of fruits on Sudhir's plate. Sudhir didn't answer.

"Hey? Listen, man, I know you don't like me much, but is it really too much to pick up my calls? I called you literally seven times last night, dude!"

"For what?" Sudhir said, unbothered.

"For what?! Are you kidding me right now? You're gonna get chewed by boss again for the third time this week!

What the hell is wrong with you?!" Suresh screamed.

"I think I'm fully capable of doing my own work Suresh, I don't need you to call a million times and remind me, of all people."

"Oh, yeah? Mr Know-it-all! It's that girl, isn't it? That's why you're acting up? Sigh Man obsessed with a girl is it?"

"What if it is? Mr Suresh? Yes, it is a girl, and I love her. Happy?" Sudhir blurted out.

Suresh started to laugh as the others stared.

Sudhir left work early that day. It was a sunny day, but something in him made him restless.

He had to go back home. To Rose. She was waiting for him. He would tell her today that he didn't care about Ruby at all. Rose mattered more to him, yes, that's what he'd tell her.

But wait, there was a crowd outside the apartment. Sudhir walked faster, his heart beating wildly. He could hear Mrs Gupta's voice.

"Look, that lunatic is coming! I saw him, I tell you! Night after night he spent talking to this plant! Crying even! Just look at him!"

"Mom, please, stop!", Ruby's voice.

Sudhir squeezed his way into the crowd to come face to face with Mrs Gupta. His face was red. Beads of sweat rested on his forehead. He was panting. But his eyes were locked on the object in Mrs Gupta's hand.

Mrs Gupta held the cut end of a plant, a rather strange-looking one. It had only one flower at the top. A flower, paler than wheat, with a splash of red

in the centre.

“Look! He’s mad, I tell you! Just look at his eyes...” Mrs Gupta couldn’t finish her sentence.

Sudhir had pushed her. Hard. Knocking her over onto the ground. The people around saw not a person but a wild animal perhaps, wearing the skin of the calmest man they had ever seen. They rushed to Mrs Gupta’s aid, who had lost consciousness now.

Sudhir fell to the ground.

Crawling on all fours, he retrieved the plant from the mayhem and sat by the side of the road with a blank, listless expression on his face, clutching the twig tightly in his hands. Like a sailor who had lost his ship. Like a traveller who had lost his way. The crowd around Mrs Gupta increased, people gathered around Sudhir as well, curious to see the madman who spoke with plants.

And for some reason, incomprehensible to all, he pressed the broken twig to his chest and began to cry.

Illustration : Surotama Ghosh (2025-26)



The Demon of the mind

Dr. Anik Mondal

Postgraduate Trainee, MD Psychiatry

Amid the city's crowd, lost among unknown faces, no one could have guessed what storms were hidden inside this shy, quiet thirty-year-old man. His name was Koushik (name changed). He had studied only up to class six; the small shop left behind by his father was his sole means of survival.

But Koushik's inner world was utterly different—a terrifying, restless, secret whirlpool.

From the age of just fifteen, an invisible demon had lodged itself in his mind—the fear of filth. If someone spat on the roadside, or a scrap of paper blew near his feet, an ominous alarm would start ringing ceaselessly inside his body. A voice in his head would keep repeating, “I am impure, I am dirty, I am infected.” The tension became so unbearable that he would often jump into the nearby pond—without caring whether it was winter or summer.

The villagers would say, “The boy is possessed.”

His mother would shed tears, “What will become of this boy?”

No one knew that this fear would one day push him into an even darker abyss.



2.

As adolescence gave way to youth, another storm engulfed Koushik—the bite of unwanted sexual thoughts.

The more he tried to suppress them, the more these thoughts struck his mind like venomous snakes.

In the hope of finding release, he began forming sexual relationships—with men, with women. In the end, even innocent animals did not escape his perverse sexuality. The harmless street dogs in the neighbourhood would flee in unknown terror the moment they saw him. But there was no relief. Those strange thoughts lodged in his mind's eye would not let him live in peace even for a moment. And that was when he discovered a strange path.



A dreadful, hidden, forbidden path.

One day, behind his shop, he picked up a discarded wire and a bizarre thought entered his head. He tried to insert that wire into his urethra. He cried out in unbearable pain, almost without realising it—and immediately afterwards he was stunned. His brain seemed to proclaim that within this pain lay his pleasure, his release, the path to the sexual satisfaction he had been seeking for so long.

That was the first time—and after that, it was as though some inhuman force pulled him there every single day. Straws, matchsticks, broomsticks, insulated wire—all of them covered his agony for a little while, under the spell of that momentary pleasure.

It felt as if a liberation, like electricity, was coursing through his body. But the very next moment—emptiness returned.

Sorrow returned. Fear returned.

Sometimes he would insert the narrow end of a funnel into his anus and pour water through it—until the intense pressure made his body shudder. And that shudder brought him a strange, guilty, demonic ecstasy.

He tried to keep all this hidden. But like an addiction, this behaviour kept drowning him deeper and deeper into the darkness.

”

**But fate
had a
strange
irony.**

”

3.

Days passed like this. Then came that cursed night when he thought—“One last time, just this one last time.”

It was an insulated copper wire, almost four feet long. As every time before, he closed the door slightly, turned off the light, and took off his clothes. Then his demonic sexual act began. He started forcing the copper wire along his urethra. Once again, pain and pleasure merged into one. But fate had a strange irony. Drunk on boundless pleasure, he lost control. Deeper! Deeper! More! More! His body convulsed as if struck by a flash of lightning. Now it was time to pull it out. But what was this? The copper wire had gone deeper and deeper into the urethra and touched his bladder. After a little tugging, it would not come out at all. A drop of blood trickled from his urethra onto the floor. And a sharp, intense pain—this time there was no pleasure in it. No satisfaction.

His body started trembling; pain and fear seized him together.



He himself understood—today it could no longer be hidden.

He ran to the hospital.

At first, he tried to keep the demon inside him a secret by claiming it was an accident. But battered by the doctors' relentless, piercing questions, hiding it was no longer possible. Through the tireless efforts of a skilled surgeon, the copper wire was retrieved via a suprapubic cystostomy. A commotion broke out in the OT. Everyone was left wide-eyed in shock. The next day he was sent to the psychiatry ward—where the psychiatrist's patient efforts and empathetic attitude broke through the barrier of his secrecy. For the first time, we came to know about his long, silent war of many years.

4.

Koushik's treatment began—
Fluoxetine, Clomipramine,
Risperidone, and most importantly—
psychotherapy.

For the first few weeks, he wondered—
what good will all this do?

But gradually, the wall of years of
accumulated fear, shame and
compulsion began to crack for the first
time.

After six months, Koushik came to
realise—

Driven by the lure of false pleasure, he
had actually considered his own body

an enemy. He had made himself cruel.
And he actually wants to live. He truly
wants to live.

Even today, the old urges sometimes
rise in him—

But no longer as a raging storm; rather,
as faint, manageable ripples.

He is learning—how to fight his own
mind.



Illustration : Pritha Ghosh (2025-26)

The Subway Lady

Dr. Jatabeda Pal

Alumni

It was an odd winter afternoon in mid of July. Juthika was waiting at the subway. She was waiting there for a long time. She didn't realise how many metro have passed while she was waiting. After a while her reverie broke. There was a chaos. Something fell off. No. Someone fell off. Or rather jumped off on the subway. People were rushing there. Metro was approaching. Juthika felt numb. Her eyes blurred. She realised. Something is wrong. Profoundly wrong.

It was almost a week since Pallav left. The blow was so sudden and unprecedented Juthika couldn't take it well. It was a very platonic love story of two physics heads, falling for each other on their 1st year of undergrad. It was almost 3 years since then. Pallav went to Delhi last month for his Master's. It was all well and good until last Saturday 'the' phone call came.

3 years can dissappear in seconds..can evaporate like never exist. Juthika was always a girl with "90's heart". She never have imagined a single " we should break up" can end a fairy tale. No warning sign. No premonition. She was left with no explanation, no answers. Nothing. She was left. Like a ragged doll. He vanished like smoke as if all of these years were just a dream.

Juthika couldn't leave her PG for 4 days. Couldn't call her parents. She was laying there like a dead body. A breathing one.

On Friday afternoon, she woke up like a homeless man in the footpath and left her room..and went to subway. She wanted to jump. She wanted to jump with all her might. But she couldn't. She boarded the next one. She took a seat in the ladies section. Every system of her body was failing her..She felt like she was choking..She couldn't even sit there properly. Across her..there was a lady sitting wearing a black coat and black pant and a sunglass. The lady stood up and came straight toward Juthika. The lady stood there for 10 seconds and took a seat next to her. Juthika felt a sudden jolt and looked at her. The lady was facing towards her. It was very evident despite the sunglass..that she was staring at her. 5 seconds, 10 seconds, 15 seconds. Juthika couldn't understand what's happening. She sat there. Her hands were trembling. A nausea was overriding her stomach. The lady extended her arm and put in over Juthika's shoulder. She wore a black stone on her index finger. Juthika was unable to speak a single word. She felt a cold touch. A shiver came down her



spine. Finally the lady spoke "You look quite pale". Juthika nodded with a yes.

She felt strangely warm despite the cold touch. The lady brought out a bottle from her bag and offered it to Juthika. She refused. The lady was persistent and put that bottle on Juthika's hand. She drank a little. The water tasted stale. The lady spoke in a very soft voice. "Aren't you cold?"

It was an odd question to ask in mid of summer. But Juthika somehow felt an urge to say yes. The lady put off her coat and gave it to Juthika. The white shirt the lady was wearing was so perfectly ironed, it made Juthika a little bit self conscious. The lady smiled and said.. "At your age I used to be savage. Couldn't care less about the world, it was me and me alone,

I didn't care who stays or who leaves..as I knew it's their loss." Juthika was stunned and dumbfounded at the same time. Was she an astrologer or a psychic?.or is she happened to be so readable that a random stranger was consoling her upfront. She felt consoled..but an uneasiness was rampaging her heart. She tried to smile but couldn't. The lady said " Don't force a smile. Have more water and calm yourself down." Juthika did what she was told.

The lady suddenly said " Central is the next stoppage, you should get down and return home". Juthika never felt so directed in her life. She agreed and stood up. She was giving the coat back to her. The lady stood up and put off her sunglasses. Juthika felt a chill down her spine. It was made of stone. Both of her eyes. There was no light in it. Absolute profound dark. Juthika stepped back .An unknown fear was swelling up in her throat. The lady looked directly into her eyes and said " Don't do it my dear. Remember I have seen you..I have seen all of you. I will never let you. Never let you slip". The metro door opened. Juthika rushed through the door and never looked back.

She had no idea how she got back to Dumdum at her PG. All of this felt so absurd..that she couldn't really tell if anything happened at all.



Illustration : Archi Ray (2023-24)



Next morning Juthika woke up with a very bad headache, swallowed 2 pain killers at once and went to subway for the work she has left unfinished. She was standing there numb. Still rethinking her desicion. Suddenly a fear grasped her neck.."I have been seen. Even the eyes that can't see. I have been seen through and through. " That's the sentence her mind was repeating. The fear and warmth, (paradoxical but true) of being seen held her steps closely and firmly. And then something happened. Wrong. Profoundly wrong. She felt numb. Her eyes blurred. She was trembling, staggering all the way to the end from where the chaos was uprising.. she stopped .She couldn't take any further step forward. Because she has been seen. Through and through. All she could hear was a calm voice that was reaching her ears "I won't let you slip". She came back home. All that was left in the subway was a big black stone ring.



To be Freed

Aadi Singh

Batch 2023-24

“After the Hill of Hiccup Hats ,
Deep down the Bog of Singing Bats,
Where thursdays coming out of buried
pumpkin seeds,
And the owls only took shiny, pickled
beads.”

There was the Grand Collegiate Hall of
Dead . According to many, it was the
oldest school
ever built. Every morning, souls of the
newly dead, the departed ones, who
died last night,
would come in the most weird ways -
some came out of porcelain teacups ,
some hidden in
violin cases , others tucked in little flat
umbrellas of paper, or enclosed in
fresh cabbage
leaves as a bunch of vegetables at a
grocery store.

At the iron gates, there was a yak with
twelve eyes waiting for the
newcomers. It dipped
each soul's name into a bottle filled
with an inky deep blue and then
pointed the spirit
towards one of the seven original
houses:

Pride,
Greed,
Wrath,
Envy,
Sloth,

Gluttony or
Desire.

There was Lord Peacock Puff of Pride
who gave himself a medal every hour
and no one could stop him from
wearing that medal as if it were the
only reason he lived. Madam Wolf of
greed put moonbeams into heavy iron
chests and when you wanted to get
some, you had to pay her an amount of
big interest. Professor Salamander
used to blow up when his students left
out a comma. Then there was Miss
Serpent that counted all the scales that
various

creatures had for whole days and Sir
Bear that took so long to go to sleep
every time that it was impossible to
keep time on whether he ever finished
the course. Then a Goat who ate all
sorts of things, the pictures on the
maps, the tables and chairs, the books
as well and if possible the history itself!
Finally, a Spider who was hopelessly in
love with a new thing on every
Tuesday that came along. The school,
for a long time, just taught one lesson -
to find the beast.

The students remembered all the
characteristics of every beast , knew
the examinations' answers, and finally
graduated, perfect in fault finding.
Yet no one has ever been allowed to
leave.

Among them was a very small little one called Bim who came so long ago that it's not remembered when he started. During a rainy day while Professor Salamander was yelling at one innocent little comma, Bim quietly stretched his little palm and asked: "Even after studying for so long why are we still called the dead? " Silence enveloped the classroom.

”

There was no chasing of the beasts. They were just always right behind.

”

The question lingered beyond its walls, ascended the steps, squeezed between doors, and finally lost itself in the old walls of the school. After a moment of silence, something spoke up. Not the bells! Not the serpent under the basement! Mirrors! Each and every mirror in the school began to crack together. The walls folded just like pieces of paper. The passageways twisted and turned like ribbons.

The chairs, like magical ones, turned into reindeers. The windows jumped from one corner to another just like playful dolphins, and then the four corners of the rooms started changing shapes, blending into the whole school so that it looked like one big puzzle.

Bim shouted there is something is appearing on the wall.

In the faintest white colour it wrote "The last lesson is starting, "

Then the words were gone and the mirrors were clear again.

Someone catches the reflection by accident and screams.

When everyone sees the reflection they see

A Peacock hiding in every smile, a Wolf behind every wish, a Salamander beating

impatiently on the shoulder , a Serpent was measuring the worth of another one, a Bear

was sleeping out of its lifetime , a Goat gnawing at the maps of past that have been ignored

by others and a Spider was still yearning for a beautiful sight.

Scared by the beasts in the mirror they whirl around . Nothing . They look back as the beast

is still there. There was no chasing of the beasts. They were just always right behind.

A few laughed, a few cried,

but few of them finally dared to see the reflection and extended their hands to the beast.



The big door began to creak. No bell
was heard.

Souls were going out one by one .

Nor any voice that praised the
worthiness of the departed.

They just carried on.

Inside the grand hall,

Lord Peacock marveled at a medal.

Madam Wolf figured out the latest
treasure. Professor

Salamander adjusted the wind. The

Snake found scales to look at again.

The Bear was tired

and stretching out. The Goat bit the

corner of an old map. The spider was

dreaming about

another Tuesday.

None of them realized that the gate

was wide open outside.

So ,

After the Hill of Hiccup Hats ,

Deep down the Bog of Singing Bats,

Where thursdays coming out of buried
pumpkin seeds,

And Owls only took shiny, pickled
beads

Stood the grand Collegiate Hall of dead

Where you ought to know the beast

within you to be freed.



The Burden of Blame

Teesta Chakraborty

Batch 2023-24

"Ishan, please open the door, son. We will definitely figure something out," wailed Ishan's mom, while his father tried to break open the bedroom door. Ishan couldn't bring himself to face the world after the incident. His job, reputation, family's honour all were at stake because of his mistake. "We were both drunk. But that's no excuse for what I did," thought Ishan.

Just as he was about to slit his wrist, the door broke open. The police barged in, followed by his parents. "You are under arrest, Mr. Roy, on the charges of sexually assaulting your colleague last night."

As soon as Ishan stepped outside his home, reporters attacked him from everywhere. "Is this your first time committing such a crime?", "Was she really just your colleague or something more....?", "Was it pre planned?" Before he could answer any of those questions, the police dragged him into the van.

The reporters then turned to Ishan's parents. "Was he always this violent and insensitive?" someone asked Ishan's mom. "Did you ever feel that

your son was capable of doing something like this ever?" "Don't you think that it was your responsibility as a mother to teach your son the right thing?" Ishan's mom burst out in tears. The news channels exploded with debate. Experts criticized Ishan's flamboyant lifestyle, late night parties, drinking, clubbing etc. One of the panelists held up a shirtless photograph of him at the gym from his social media handle. "Honestly," she said, "This quite explains everything." Interviews of people related to Ishan circulated all over social media. His boss said he was way too ambitious and arrogant for his age. His neighbours complained about how he always returned home late every other night. His friends criticized his drinking addiction and how he was fairly promiscuous. The details of his lifestyle, personal interests, fashion sense were way more interesting to everyone rather than the actual incident. As if all these attributes of his personality justified the rape. Nobody was concerned about asking him the real question, "Why did he do it?" He committed the crime because he chose to commit it. And he should be held responsible just for that.



"I am so sorry for what you had to go through. Please take your time. We will wait until you are ready," said the police officer to the survivor. She felt safe in the hospital, surrounded by her family and friends after the incident. "I was drunk and it was getting really late, so I asked Ishan to drop me off after the party. On the way, he suddenly stopped the car and tried

We love you and we are always here for you," her father expressed.

Nobody questioned her character, her ambitions, her past trauma or even the length of her skirt. She received the justice and support she deserved...

”

**He committed
the crime
because he
chose to commit
it. And he
should be held
responsible just
for that.**

”

to..... I said no. I told him repeatedly to stop. But he just wouldn't listen to me." She broke down in tears. "It doesn't matter whether you were drunk or not. You said no and that should have been enough," the police officer said.

After the police left, her parents comforted her. "You are so brave. We are so proud of you dear," said her mother. "Never ever blame yourself for what has happened. You are in no way responsible for it. He couldn't take something from you to which he never had access to, the goodness of your heart, that's where your honour lies.



ENGLISH

PARALLAX

MAGAZINE



P O E T R Y

"Poetry is a deal of joy and pain and wonder, with a dash of the dictionary."

Survival

Kazi Raisa Naznin

Batch 2024-25

The grass is trampled without a thought,
A genuine soul is rarely sought.
The kind, the compassionate, the true,
Learn quickly what survival asks them to do.

At last, you reach out for your vizard,
Try and fashion it as 'Your Guard'.
And suddenly, the world somehow,
Isn't such a bad place,
And how!

I have a newfound respect for the chameleons,
For they have known the trick for aeons.
They are mocked for no reason,
When we are the ones who commit the treason.

How absurd is the world
to mock the change it itself compelled!



Illustration : Supratim Roy (2023-24)

Absurdist's Almanac

Agnik Chatterjee

Batch 2023-24

I. The Morning Report

The ledger was opened as half past none,
The clerks in the basement - minds gone.
Papers unkempt, ink spills on linen shirts,
Busy amidst rows of unsent adverts.

A memo went out, quill on papyrus read-
"Henceforth, lacerations will never bleed."
Rivers will flow back up the mountains,
To accommodate ducks who did not like fountains.
The chancellor smiled flimsy,
Since corruption was his whimsy.



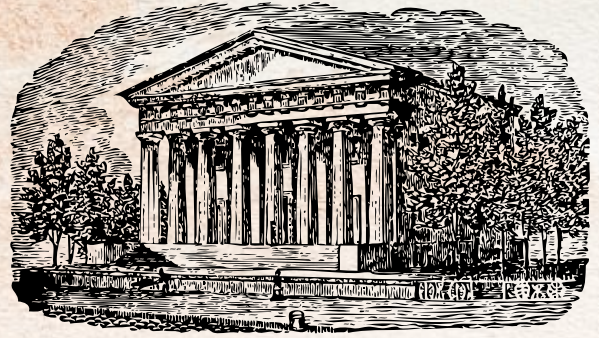
Illustration : Archi Ray (2023-24)

II. The Midday Confusion

Across the great yard, lined up many subject-
The decree made its rounds; on idle minds it pecked.
The citizens paid thinking-tax in buttons, string and rust,
Everyone knew the "intellectual" met their appetite fast.

The soldier dazed in the crowd,
wanted all the soil to be ploughed;
He chipped his sword and made a sickle,
To harvest a logic that proved rather fickle.

The scholar argued fiercely that yellow was blue,
The hypnotised mass joined the queue.
They cheered in whispers, banners furled;
For only the dumb spoke in the world.



III. The Evening Situation

The logicians were locked in a cage,
Exempted from the coming of a new age.
The era of many a grand sweeping view -
Of what is false might become true.

"If the door is a jar, then a jar goes to the beach,
The faster you go, the slower you reach;
As success is a mere illusion for good taste."
Said the man with a clock tied around his waist,
No numbers on its face, simply rotating gears;
Ticking out centuries, masquerading as years.



IV. The Nocturnal Decree

The sun set, the crowd dissolved,
As the erracy wasn't one to be solved.
Houses lit up with shadows of doubt,
A single young girl managed to shout-

The Soldier stepped forward, sickle raised,
To slice through the webs the chancellor made.
The populace burnt all the buttons, string and rust,
As corruption could never be just.

The chancellor vanished, the cages gave way,
As logic returned to the dawn of the day.
Banners unfurled, no tax for thought -
The grand madness was forever caught.



After the Last Answer

Shruti Priya Rajhans

Batch 2024-25

A world without mistakes,
Where no path led astray,
Promises that stayed,
And tears a stranger to every face.

Every wish fulfilled,
Every summit achieved,
No place for sorrow and none for grief.
Every question answered,
And every mystery unveiled,
What was left there to dream, to seek?
Then closed the last library,
No knowledge there left to dig.



Fell silent the last classroom,
Every lesson long since learnt.

Retired the final scientist,
Discovery had already reached its limit.

The last painter laid down his brush,
There existed no masterpieces left undone.

And so, there remained no dreams,
Because dreams are for the incomplete!

Humanity, having achieved everything,
Became what they strived to be,
Finally perfect,
Perfectly irrelevant!



Imperfectly Perfect

Snita Das

Batch 2024-25

“What's perfection, Granny?”
asked the little kid.

"What once seemed impossible," laughed
Granny,
"My dear, every wonder, old or new,
Was once a dream that was thought
impossible to be true."

"Have you ever wondered how mistakes are
made?
For every art, there creates a unique shade

"My boy, come to my little piece of peace."

Garden, where every heart finds a sweet
release.

The little kid rejoiced, seeing flowers
Shouted heavily seeing pots and towers

"What are they for, Granny?"

"Oh, those cracked old pots..." Ha ... Haaa.....

"Yes, my child. Those cracked old pots slowly
leak,
Yet they water flowers week by week."

No, don't panic. Take your seat.
I am here until death gives a greet.

He offered a cup of tea with shaky hands.

"That's why a castle is built on muddy lands."
said the kid

Granny, they said my wild thoughts were too
strange to try,
Like catching stars from the sky."

Granny smiled,
"Every miracle you know
Was once a dream too bold to grow."

"No need to be flawless,
Just do your part.
Be imperfectly perfect
Right from the start."

"The word Impossible wore a foolish face
Until it found its rightful place."

"My child, if your heart says 'Yes,'
Don't be afraid to try."

With a deep voice, she smiled,
Still resisting to bid you goodbye.

Illustration : Biswambhar Duya (2024-25)



Home of None

Krittika Mohanta

Batch 2025-26

Many came, some spent a spell,
Few, a lifetime.
Left many, after a beckon of hope elsewhere,
Or even to get close to loved ones.

But these walls,
They have seen, felt, sensed, lived
All those moments, rented here,
Of sweet giggles,
Of bitter quarrels,
Of devious intentions,
Leaving marks on their face.

Like that one, behind the door,
Towards the West,
Where the sun sets,
Lies that mark.

Too dark to be crayon, too light to be mud.
Is it of life's red nectar?
We shall never know.



Illustration : Protyusha Mahanta (2023-24)



Illustration : Sania yasmin (2025-26)

Hues of an Absurdist

Aritra Ganguly

Batch 2025-26

To believe in teleology
Is in vain
For being misunderstood
Is in my grain

Be it in my thoughts
Or my actions
Repeatedly the only option
Lies with the potions

I can't move with the crowd
For I find them hard
Crowd doesn't accept me
For they find me absurd

So from an absurdist, what is Life?
To rise above the dreams of pleasure
And breathe life into those who die
To look beyond one's fleeting horizon
And sail the ship of sighs

ENGLISH

PARALLAX

MAGAZINE



ESSAY

"A genuine essay is not a doctrinaire tract
or a propaganda effort or a broadside."

A Macrocosm of Microbes

Archi Ray

Batch 2023-24

It seems perfectly absurd to think, that a tiny, tiny little cell can give rise to this, hotpot of tumultuous emotions and innate philosophical consciousness - a human being. Yes, I am talking about a zygote, a microscopic speck, the singularity which condenses to form the cosmos of a human being. Yet there seems to be a tale, which is more absurd, more astoundingly remarkable than the tale of our tiny zygote. It is the story of microorganisms and how we humans are but mere vessels afloat on their churning tides. ERV - Endogenous Retrovirus, a term we have come across often, mostly in the context of belligerent diseases like SLE or other autoimmune infections, a scary thought indeed! But what If I were to tell you , that you simply wouldn't be alive and breathing right now if it were not for these gilded organisms and their dexterous genes. Scientists having mapped the genomes of numerous mammals alive today, have

discovered that, about 150 million years ago, the oldest ERV gene - H-ERV L (human endoretrovirus -L) had invaded the genes of some of our ancient ancestors. This infact led to stratification of two different sects of mammals - namely the egg laying ones like the platypus and the rest of us who resort to giving birth. Weirder than that, scientists also found out that the placenta (an organ used by mammals for sustaining life inside a mother's womb) was 'created' by the unfathomable efforts of lo and behold - the ERVs! Yes, I know, this is a lot of take in, and after you are done face palming yourself over this blasphemy of a revelation , I would like to elaborate.

Hermann Minkowski in 1908 had birthed the concept of space time, based on Einstein's concept of General Relativity. Simon Singh in his book, The Big Bang : The Origin of the Universe mentions that , " The expansion of the universe is not a movement

of galaxies through space, away from a central point, but an expansion of space itself. The galaxies are moving apart because the fabric of space between them is stretching."

Now, if humans were to be this galaxy of blood, bones, muscles and fascias, then the space time which holds a human together, ought to be the vast disarray of eccentric microorganisms. Coming back to our enigmatic HERVs, and their contributions to the placenta. The placenta is a beautiful organ, it is almost like a ginormous banyan tree, on a rancorous forest road. A tree which houses birds, bees and so many other critters alike, protecting them from acrimonious predators, as they build their nests in the comfort of its lean branches. A tree preserves its inhabitants, yet it doesn't discriminate between the predator and its prey, it gives life, a supple shade, bears fruits for the predators and prey alike, yet it has branches high enough, where only birds and bees can reside in peace. So does a placenta, it houses the fetus in a mother's womb by separating the streams of the mother and foetus's blood, while

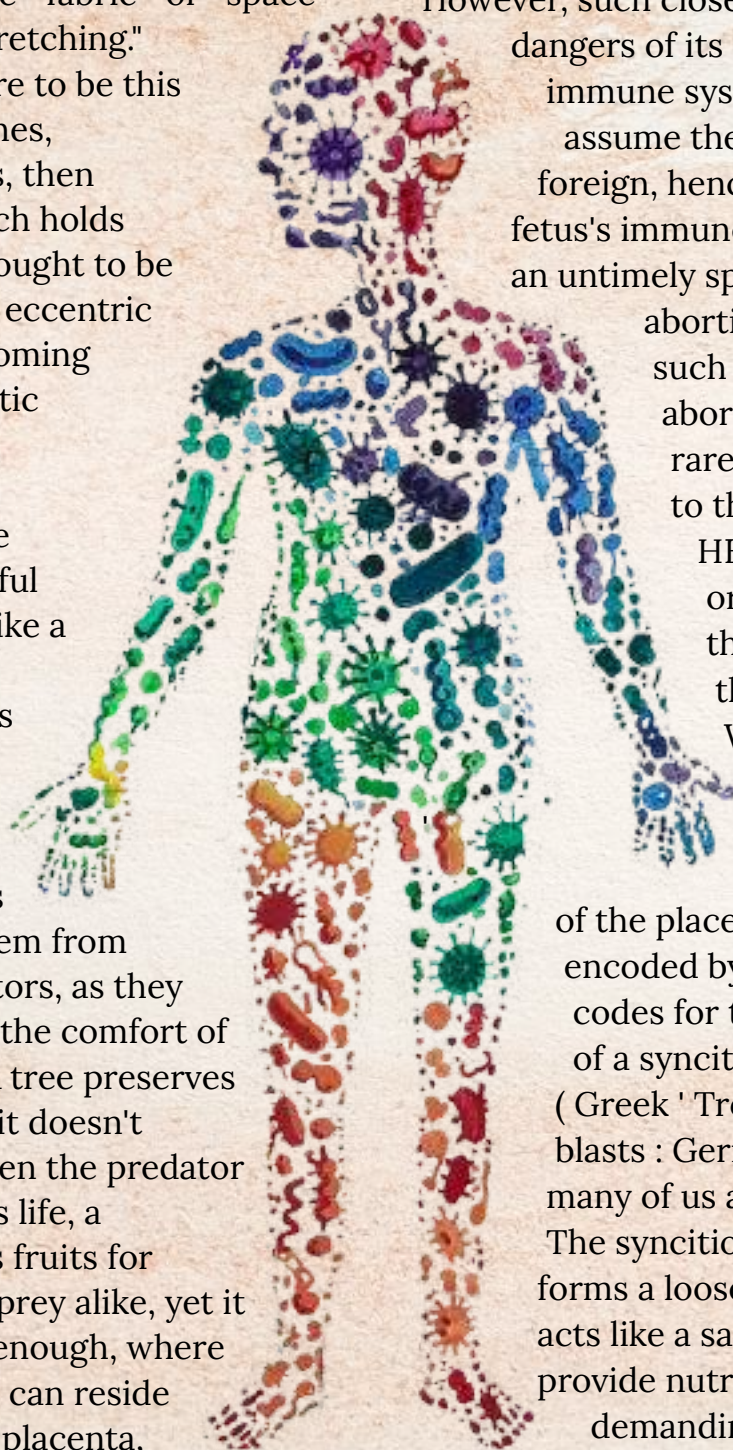
at the same time, it supplies the fetus with oxygen and delivers its wastes to the mother for excretion.

However, such close proximity has dangers of its own, the mother's immune system can sometimes assume the fetus to be foreign, hence attacking the fetus's immune system leading to an untimely spontaneous

abortion. However such spontaneous abortions are incredibly rare in nature, thanks to the prowess of the HERVs! Fetal cells in order to protect themselves from their mother's WBCs fuse with a protein called syncytin at the outer boundary

of the placenta. This protein is encoded by a gene which codes for the formation of a syncytiotrophoblast (Greek ' Trophos : to feed and blasts : Germinating) , a name many of us are familiar with. The syncytiotrophoblast forms a loose ball of cells which acts like a sac, in order to provide nutrients to the energy demanding embryo.

Fusing with the 'syncytin' also removes any gaps between the fetus and maternal white blood cells, which in



term protects the fetus from an immune response by its own mother. However brilliant the 'syncytin' is, we didn't create it on our own. Studies show that 'syncytin' was actually a viral protein. Viruses like HERVs used syncytin to fuse with cells it wanted to infect, then during an ancient viral infection, the virus went on to insert its envelope gene onto the host genome. This probably got passed down through generations and generations of our reptilian - mammalian ancestors, to be repurposed by the mammals of today, as the protein which helps fuse the cells together in a placenta. Bewildering, isn't it?

As Pranay Lal writes in his book - *Invisible empire, The Natural History of Viruses* - " We may think of ourselves as uniquely human, but the truth is far messier. Strikingly as much as 8 percent of our genome consists of remnants of ancient viruses that infected our ancestors millions of years ago. We are in a very literal biological sense, walking museums of viral history. Along with other microbes, viruses regulate the activities of Carbon, Phosphorus, Nitrogen and Sulphur - the absolute building blocks of life. They prevent fellow microbes from being planetary hazards. Without the biochemical cycles that sustain the Earth would stall and complex life would cease to exist. "

We human beings think of ourselves to be uniquely important, we assume that

we are the ones governing this world, sustaining life, preventing extinctions, acting God. I wonder how we ourselves would not have become extinct, if it were not for the cyanobacteriae, who had 3.5 billion years ago, breathed in toxic fumes of agony, in order to gift us, precious oxygen and a chance at life. Who are we, if we didn't have an army of efficient bacteriophages within our biological havens, keeping the "good bacteria in our bodily canals from overturning our cellular mechanisms." In the end, we are, but the amalgamation of genes passed down by multiple organisms, through millions of years of ancestral DNA. We are the kaleidoscope which bears the colourful imagery of millions of microorganisms co existing .

Those tiny, half a nano meter beings have time and again humbled us, taught us, be it as a malicious pathogens or as ultimate building blocks of our genomic code, they have taught us how this Earth is as much theirs, as ours. Yet we wage wars, resort to petty meagerness and live with the squalor of hatred towards each other. We forget who we are in this grand scheme of things. We forget, how we are the resilient work of thousands of species, animate or micro animate. No life is to be squandered away on vile grounds. Each and every organism is but a part of this beautiful ecosystem, that has existed since time and beyond. The virus is us, so are the bacteria so being the first tetrapod fish - 'Tiktaalik 'who walked on land, the

very first to do so, one feeble step a time, so that today we, get to walk on the moon. When we are waging wars, killing each other out of spite, who are we fighting against? We are fighting against the beautiful, living breathing fossils, living museums of ancestral bacteria, virus and other prehistoric beings. It is shameful how we choose to destroy one another for the sake of caste, creed or greed, as we are in turn destroying the beautiful canvases, safe havens of nature's most absurd tiny little beings. These organisms breathed, so that one day we could see the first rays of the sun glisten on a mountain peak or feel the soft caress of an afternoon breeze.

Viva la Vida, live and let live.

Reference:

Invisible Empire: The Natural History
Of Viruses by Pranay Lal

Illustration : Ishita Sinha (2025-26)



YOU ARE PERFECTLY ABSURD

Durga Aggarwal

Batch 2023-24

There comes a time in everyone's life when they start questioning the people around them, the world they live in, and everything they have always accepted as reality. And all this because they first questioned their own existence.

But what made them question themselves?? It's you! It's the society!!

A child is so curious ; they explore everything in the most silly way, make mistakes and embrace the world with innocence yet no-one calls them a fool! But when the same child grows older, the society expects only maturity from them. The moment they try to live freely or act without restraint, they are judged.

The problem doesn't lie with a few individuals rather it's the problem of the whole world being obsessed with perfection and the concept of appearing complete without any flaw.

The irony is that no one can truly be perfect. Everyone carries their own absurdity which makes them unique. Behind every polished image that is created under pressure hides countless thoughts , emotions, abandoned dreams and some silent insecurities.

As William Shakespeare wrote “ The world is a stage and all men and women are performing.” In this context, I realised, may be, the one living happily, whom we often tend to call “fools” is merely a poor actor.

When someone asks , “ How are you?” , we rarely answer them honestly because we feel it's easier to say “I'm fine” than exposing our true emotions and risking judgement.

I have talked to both the young and the old which made me realise that in old age , people finally understand that perfection, seriousness and glamour are illusion so they throw away their masks to finally become what they always wanted to be - SILLY . Sadly, this realisation arrives when most of their life has already passed.

The day when we learn to perform less and address our emotions more.

The day we find the courage to be silly again.

The day we start carrying the rarest form of authenticity comfortably again is the day we finally become “PERFECTLY ABSURD”.

SLEEP DEBT: THE SILENT EPIDEMIC STEALING YOUR LIFE WHILE YOU CHASE IT

Dr. Najesh Afroj

Postgraduate Trainee, MD Psychiatry

Introduction: The Unseen Burden We All Carry

In the modern world, where ambition often takes precedence over well-being, sleep has quietly become the most sacrificed necessity. While society claps for the relentless worker burning the midnight oil, few realize the cost at which that applause is earned. We have glamorized being busy, idolized sleeplessness, and mistaken fatigue for progress.

But lurking beneath this glorification is an invisible enemy: sleep debt. It's not a financial burden, yet its price is steep. We don't receive a bill in the mail for it, but we pay daily with our health, memory, emotions, and even our future. One less hour of sleep may not seem like a big deal, but like water dripping slowly into a

bucket, the debt accumulates quietly and steadily until it overflows. And by then, it has already stolen something irreplaceable.

What is Sleep Debt? The Science Behind the Yawn

Sleep debt is the difference

between how much sleep your body needs and how much it actually gets. If your body needs eight hours but you sleep only six, that's two hours of debt. Do that for five days, and you're ten hours in the red.

Behind this simple

math is a complex orchestra in the brain. One section is the circadian rhythm, a 24-hour internal clock managed by a tiny region of the brain called the suprachiasmatic nucleus (SCN). This clock regulates when we feel alert and when we feel drowsy.

“Sleep is the golden chain that ties health and our bodies together.”

— Thomas Dekker



The other is homeostatic sleep pressure, a biological drive that intensifies the longer you stay awake. It's primarily governed by a substance called adenosine that accumulates in your brain throughout the day. The longer you resist sleep, the more adenosine builds, pressing your brain into submission. These two systems usually dance in harmony. But when disrupted by binge-watching shows at midnight or answering emails at 2 a.m., your body struggles. And you don't just lose sleep, you lose function.

The Myth of 'Catching Up' on Sleep

It's a comforting thought that we can cheat sleep during the week and repay it on weekends. But this idea, unfortunately, is a myth.

Science shows that while weekend lie-ins may relieve some symptoms of fatigue, they do not reverse the long-term effects of sleep deprivation. Chronic sleep loss alters brain chemistry, impairs memory, slows reaction times, and disrupts emotional stability. In fact, studies have found that consistent sleep reduction, even by just an hour or two a night, can result in cognitive deficits similar to being legally intoxicated.

Once sleep is lost, its restorative functions such as cellular repair, hormone regulation, and memory consolidation are also lost for that night. Recovery is not as simple as

sleeping longer the next day. It's like skipping meals and expecting one giant feast to compensate.

A Real Story from History: Randy Gardner's 11 Days Awake

In 1964, a 17-year-old high school student named Randy Gardner set out to break the world record for the longest time without sleep. He stayed awake for 264 hours, or nearly 11 full days. Initially, it was a science experiment. But by day three, Randy began to suffer from severe cognitive and emotional issues. He was moody, forgetful, and delusional. He couldn't concentrate and started to hallucinate.

Doctors monitored him throughout, and though he recovered after several nights of sleep, the experiment left lasting impressions on the scientific community. Gardner's story became a landmark case, helping researchers better understand the devastating effects of sleep deprivation, even in the short term. If eleven days could do that to a healthy teenager, imagine what years of poor sleep could do to the rest of us.

Sleep and the Brain: Glymphatic Clearance – Your Brain's Detox Cycle

One of the most critical functions that happens during sleep is something invisible to the naked eye: the cleaning of your brain.

Our brain has a unique waste clearance

system called the glymphatic system, which activates primarily during deep sleep. Think of it as a nighttime cleaning crew that washes away toxins, waste products,

and harmful proteins like beta-amyloid, a key player in Alzheimer's disease. These toxins accumulate in the cerebrospinal fluid (CSF) and, if not cleared, can impair brain function.

When we cut short our sleep, we interrupt this cleaning process. It's like sweeping a house halfway, leaving behind enough dust to irritate and harm. Over time, that dust becomes damage, and the damage becomes disease.

Sleep Debt and the Risk of Dementia and Alzheimer's

Science has now shown a direct connection between chronic sleep deprivation and the increased risk of neurodegenerative diseases, especially Alzheimer's and other forms of dementia. Poor sleep disrupts the glymphatic system, allowing toxic proteins to accumulate in the brain. These proteins then interfere with neuron communication, leading to memory loss, cognitive decline, and emotional instability.

Studies have shown that people who consistently sleep fewer than six hours a night in midlife are significantly more likely to develop dementia later in life.

The brain simply doesn't get the downtime it needs to reset, repair, and protect itself. Years of sleep neglect silently erode the very organ we depend on to define who we are.

Why Sleep Debt Is Worse Than Any Financial Debt

Unlike money, you can't earn sleep back with interest. You can't take out a loan, restructure it, or get bailed out. Once lost, the restorative functions of



sleep are gone for that night, and no Sunday nap can bring them back.

Chronic sleep debt impairs your mood, increases your risk of heart disease and diabetes, affects your hormone levels, and even weakens your immune system. You become more emotionally volatile, socially withdrawn, and less productive, not just tired, but depleted.

Over time, this becomes a dangerous



cycle. And like any debt, it accumulates until you start paying for it with your health.

The Hormonal Havoc: Sleep Regulates More Than Dreams

While we sleep, our bodies perform a hormonal symphony. Growth hormones repair tissues. Cortisol levels fall, helping the body de-stress.



Each organ becomes a soloist playing out of tune.



Melatonin resets our clock. Insulin sensitivity adjusts to control blood sugar.

But sleep deprivation breaks this rhythm. It raises ghrelin, the hunger hormone, and lowers leptin, the satiety hormone, making us hungrier and less full. It messes with our insulin balance, increasing the risk of type 2 diabetes.

These changes make us eat poorly, gain weight, and feel irritable. Sleep doesn't

just make us rest, it regulates who we are, from our skin to our gut to our mood.

The Master Clock and Peripheral Clocks: When Harmony Becomes Chaos

Our body has a master timekeeper: the suprachiasmatic nucleus. It synchronizes the biological clocks of all major organs, heart, liver, kidneys, lungs, ensuring they perform at the right times.

When we're sleep-deprived, this synchronization breaks down. The heart doesn't pump as efficiently. The kidneys filter poorly. The liver struggles to detoxify. Each organ becomes a soloist playing out of tune.

And like a badly conducted orchestra, the result is disharmony: fatigue, illness, and accelerated aging.

The Psychological Toll: Sleep and the Soul

The emotional impact of sleep debt can be devastating. A sleepless mind is a fragile mind. We become short-tempered, anxious, and disconnected. Our ability to feel joy diminishes. We stoplaughing easily. We cry more. We feel lonely even in a crowd.

Sleep deprivation increases the risk of depression, anxiety disorders, and



even psychosis. For those already vulnerable, such as patients with bipolar disorder, it can trigger full-blown episodes.

Sleep is more than rest; it's emotional regulation. It's the difference between reacting and responding. Between surviving and thriving.

Obstructive Sleep Apnea (OSA): When Debt Turns Deadly

Sleep debt often leads to weight gain, and excess weight is one of the biggest risk factors for obstructive sleep apnea (OSA), a condition in which the airway becomes blocked during sleep, causing repeated breathing interruptions

These interruptions often go unnoticed but have profound consequences. OSA fragments sleep, increases blood pressure, stresses the heart, and deprives the brain of oxygen. People with untreated OSA are at a much higher risk for stroke, heart failure, and premature death.

Illustration : Sania Yasmin (2025-26)



Protocol No. 47

Dr. Dharmendra Kumar Gupta

Postgraduate Trainee, MD Physiology

Please Do Not Use Your Brain
Without Authorization

Issued in the interest of
standardization, optimization,
compliance, accreditation, litigation
avoidance, and all other modern
healthcare virtues.

Dear Doctor,

Congratulations.

After approximately twenty-five
years of education, countless
examinations, several emotional
breakdowns, and enough cups of
tea to fill a small reservoir, you have
finally become a doctor.

You have spent years studying
anatomy, physiology, pathology,
pharmacology, medicine, surgery,
and the mysterious art of
deciphering illegible handwriting.
You have been trained to think
critically, solve problems, analyze
evidence, and make difficult
decisions under pressure.

We regret to inform you that these
skills are now largely unnecessary.

Medicine has evolved.

In the past, doctors were expected
to evaluate patients, consider
unique circumstances, weigh risks
and benefits, and make
individualized decisions. This
process was often referred to as
“clinical judgment.”

Unfortunately, clinical judgment
suffered from a major flaw: it
required thinking.

Thinking is variable.

Protocols are not.

Therefore, in the interest of
consistency, efficiency, and
administrative peace of mind, we
have developed Protocol No. 47.

Please do not use your brain
without authorization.

Should a patient present with



symptoms, kindly refer to the appropriate flowchart.

If the flowchart does not apply, consult the guideline.

If the guideline is unclear, consult the protocol.

If the protocol contradicts the guideline, consult the committee.

If the committee disagrees with itself, kindly wait for the next update.

The patient can remain symptomatic during this process.

We understand that some doctors may occasionally experience an urge to think independently.

This is a recognized condition known as Acute Clinical Judgment Syndrome (ACJS).

Symptoms include:

- * Asking, "But what is best for this particular patient?"
- * Using phrases such as "in my experience."
- * Considering social, financial, psychological, or cultural factors.

* Wondering whether guidelines can possibly cover every human being on Earth.

If you experience any of these symptoms, please take a deep breath and repeat the following affirmation:

"The protocol knows best."



Three times daily, preferably before ward rounds.

Please remember:

If you follow the protocol and the patient improves, the system deserves credit.

If you follow the protocol and the patient deteriorates, the disease is



responsible.

If you ignore the protocol and the patient improves, an explanation will be required.

If you ignore the protocol and the patient deteriorates, several explanations will be required.

This arrangement has been carefully designed to encourage compliance.

Modern medicine has become remarkably efficient at measuring everything.

We measure blood pressure.

We measure blood sugar.

We measure oxygen saturation.

We measure patient satisfaction.

We measure hospital performance.

We measure physician productivity.

We measure waiting times.

We measure costs.

We measure outcomes.

Soon, we may measure the number of independent thoughts generated per physician per month and recommend reducing them for quality assurance purposes.

Naturally, all of this is done in the best interests of patients.

At least that is what every meeting concludes.

The truly fascinating part is that nobody intended this outcome.

Evidence-based medicine was created to help doctors make better decisions.

Guidelines were developed to support clinical practice.

Checklists were introduced to reduce errors.

Documentation was designed to improve accountability.

Protocols were meant to create consistency.

Each step appeared perfectly reasonable.

Yet somehow, after combining all these good intentions, we created a system in which the most highly educated person in the room often feels least comfortable making a decision.

That is the beauty of perfectly absurd things.

They do not arise from bad intentions.

They emerge from good intentions taken to their logical extreme.



Medical students are taught to think critically.

Postgraduate trainees are examined on clinical reasoning.

Conference speakers celebrate innovation.

Researchers publish papers challenging established ideas.

But when a young doctor finally enters practice, he discovers a curious truth:

Everyone loves independent thinking.

Provided it arrives at the approved conclusion.

The irony is almost poetic.

We train doctors to become experts.

Then we spend considerable effort ensuring that experts do not behave too much like experts.

Of course, protocols have saved lives.

Guidelines have improved care.

Standardization has reduced errors.

No sensible person would wish to return to a world without evidence.

That is not the problem.

The problem begins when guidelines stop being guides.

When recommendations become commandments.

When fear replaces judgment.

When documentation becomes more important than conversation.

When avoiding blame becomes easier than taking responsibility.

And when a patient gradually transforms from a unique human being into a checkbox waiting to be completed.

Perhaps the greatest absurdity is that patients still expect something beautifully old-fashioned.

When they enter the consultation room, they do not ask to meet a protocol.

They do not seek guidance from a checklist.

They do not place their trust in an algorithm.

They look for a doctor.

A fellow human being.

Someone who can listen, understand, interpret, and decide.

Someone willing to carry uncertainty when certainty is impossible.



Someone capable of seeing the individual hidden behind the diagnosis.

Medicine has always lived in that space between science and humanity.

Evidence provides direction.

Judgment provides meaning.

Compassion provides purpose.

Remove any one of them, and

**The practice
of medicine
remains what it
has always been:**

**One human
being trying to
help another
human being.**

and something essential is lost.

So perhaps Protocol No. 47 should be revised.

Not abolished.

Just revised.

Maybe it should read:

“Use evidence wisely.

Follow guidelines thoughtfully.

Document carefully.

But never surrender the responsibility to think.”

Because despite all our advances, despite all our protocols, pathways, metrics, audits, and flowcharts, the practice of medicine remains what it has always been:

One human being trying to help another human being.

Messy.

Complicated.

Uncertain.

And, at times,

perfectly absurd.

No protocols were harmed during the writing of this article.

Illustration : Shruti Priya Rajhans (2024-25)



THEORY of MODERN DAY LOVE

Amit Kumar

Batch 2025-26

We have seen and heard in movies that love lies in friendship, that it's a miracle which changes our lives. There are a man and a woman that fall in love and fight everything against their love to get each other in the end for forever which ultimately leads to their happy ending. But we never get the answer that what truly is love? What makes them feel so drawn to each other?

Well, today I would like to present my view on what love is and how it affects our modern day relationship.

To understand something as complicated as a relationship, we shall divide it into 4 stages namely:

Stage 1: Attraction

Stage 2: Addiction

Stage 3: Opportunity

Stage 4: Madness

Now let me give you a breakdown of the following stages.

STAGE 1: ATTRACTION

Every relationship always starts with attraction. This is the most

crucial step of a relationship because most of the love stories die at this very initial stage. In my opinion there is no such thing as love at first sight, it's all about being attracted at the first glance. Being attracted to their smile, their eyes, the way they talk, they behave and of course their physical appearance. Attraction varies from person to person. Men usually always fall for pretty eyes, charming smile, melodious voice, fair complexion. Some like a bold and confident female whereas some prefer the shy and timid types. Women on the other hand look for something more deeper, someone with a protective nature, economic prosperity, a good social standing, some want men with a dominant nature, a bit toxic type of a man. On the other hand some look for someone a bit nerdy, soft spoken, well behaved and like a sweet guy. And nothing about it is wrong. It's not only about humans, it's the law of nature. For example, peahen get attracted towards peacock with beautiful feathers, similarly kangaroos attract their mating



partners by showing their muscles, frogs call their partners by showing off their vocal chords. And now once the attraction starts, then comes the next most important question, "Do they feel the same about me? And if they don't, what can I do to change it? How do I make myself attractive to them?" And here comes the role of continuous efforts and good communication skill and approaching techniques like some prefer direct flirting, eye contact or a slow approach. At the end of the day it all comes to one thing, if the other person doesn't find you attractive it's sadly the end of that story. And if luck is on your side and the attraction is from both sides then we move to the next stage.

And now for those of you that say Looks don't matter, ask yourself this: Why don't you fall in love at first sight with just anyone, why are some ugly and some pretty to you? Why don't you fall in love with someone who's physical appearance is not as ideal as you think?

STAGE 2: ADDICTION

Addiction can be further classified into 3 substages: Rise, Peak and Decline.

After attraction comes the talking stage. This is where Addiction starts rising from, talking to someone for hours, texting them the whole day eventually brings two people closer. Biologically when we spend more time with anything, we start getting attached to it or we become

habituated with it. For example, you get attached to your pet, your phone, your bed, could be a cigarette or even drinking. We start craving for that thing more day by day, this is what happens when we give it a lot of our time. The very characteristic feature of this stage is denial. When you ask someone who has newly started a relationship that what will you do if it doesn't work out? Their response is Their response is usually that it won't bother me too much, I will just move on. This is where Addiction rises.

If the other person doesn't find you attractive, it's sadly the end of that story.

Our mind always does opposite of how we want it to react, habituated with it. For example, you get attached to your pet, your phone, your bed, could be a cigarette or even drinking. We start craving for that thing more day by day, this is what happens when we give it a lot of our time. The very characteristic feature of this stage is denial. When you ask someone who has newly started a relationship that what will

you do if it doesn't work out? Their response is usually that it won't bother me too much, I will just move on. This is where Addiction rises. Our mind always does opposite of how we want it to react, just remember the times you have wanted to fix your sleep schedule and ended up getting no sleep that night, or deleting social media to focus on life only to end up downloading it within an hour. Similarly the more we think about it not bothering us, the more it starts working in our favour cause



**Our mind
always does
opposite of
how we
want it to
react...**



somewhere deep down we want it to. This is how attachment turns into addiction. Some habits which start as fun like smoking or drinking turns into something dangerously addictive. Same works with relationship, a casual interaction later turns into something you can't live without and that is what is the second substage of this phase . in this phase you will find the couples making promises to live together till

last breath, fight against the whole world to support each other. they do crazy things like travel hundreds of mile for just a glance of their partner. You don't find anything or anyone attractive anymore, nothing brings you the excitement that talking to your partner does. Everything about them feels surreal, the way they t just remember the times you have wanted to fix your sleep schedule and ended up getting no sleep that night, or deleting social media to focus on life only to end up downloading it within an hour. Similarly the more we think about it not bothering us, the more it starts working in our favour cause somewhere deep down we want it to. This is how attachment turns into addiction. Some habits which start as fun like smoking or drinking turns into something dangerously addictive. Same works with relationship, a casual interaction later turns into something you can't live without and that is what is the second substage of this phase . in this phase you will find the couples making promises to live together till last breath, fight against the whole world to support each other. they do crazy things like travel hundreds of mile for just a glance of their partner. You don't find anything or anyone attractive anymore, nothing brings you the excitement that talking to your partner does. Everything about them feels surreal, the way they talk, eat, walk. Many people mistaken this for true love but this is actually nothing but the notorious act of dopamine, the



ultimate high of "love". Now the question is how long will this phase last. It solely depends on the progression of the relationship, the quicker you finish your fantasies, the quicker it ends for them. Just like the more time you spend on foreplay the longer the intercourse lasts. Similarly in a relationship there are limited fantasies and expectations from the partner. And after a time there is nothing new left and the expectations slowly start dying. This is what philosophers call the end of ignition or spark. After this relationship becomes more of a duty or a necessity rather than the feeling of excitement you initially feel in it. This is the 3rd substage I told you about, the declination phase. Now the high of the dopamine starts wearing off, the habits you once found surreal now become their flaw, their voice turns annoying, the constant texting seems like a waste, everything contradictory to what you felt during the peak stage. Now we progress to the most problematic stage.

STAGE 3: OPPORTUNITY

After the declination of Addiction starts, a stage is reached consciously or subconsciously where we eventually want to discontinue the relationship. This is where the spark has ended at least from their side. Some actively looking for a better option whereas some wait for the opportunity to come to them, but in both the cases they are

ready to grab their way out of this situation. Opportunity doesn't always mean finding better, it could also be a way to change the relationship like going ahead with marriage. For example, if there are fights during the peak stage of the relationship, when there are a lot of unfulfilled goals, it almost always gets fixed. On the other hand when these fights occur during the later stages, when the attraction is gone, we find ourselves wondering whether saving a relationship like this is even worth it anymore or not. All the



**Now the high
of the dopamine
starts wearing
off, the habits
you once
found surreal
now become
their flaw.**



little things become a big barrier between those two, and that's where they start looking for newer opportunities. Then on the other hand we see couples where they have better opportunities but they never grab it, and yet again we mistaken it for love... which it isn't. I would like to explain it better by giving you a hypothetical situation- Imagine working in a company for over 10 years and you get



an offer of a 20% increment from some other firm. But with this increment you will also have to change the place you live, change in people around you, your work environment everything. It's pretty evident that you won't leave your company for such a small raise, similarly when the attachment is gone, it's common that you will find other people attractive but being with them could be a complete change in your comfort zone, a change in friend circle, lifestyle, habits everything. At that point staying with the same person



This stage is the most problematic, complex and horrifying.



seems more feasible, but if you get the opportunity where you find the person more valuable than the social fear you have, you will definitely go for it, just like a 100% increment won't make you think about the new environment. It's all about weighing your options and what seems suitable at that point of time.

Now there are two cases: Case 1: Both the partners find a better opportunity,

they move on and the relationship between them ends for good.

Case 2: One partner finds a better opportunity and leaves, the other person will first try to coax them into getting back. If that doesn't work, they will look for something new as well, but when that doesn't happen either, they enter into the fourth stage which is of suffering.

STAGE 4: MADNESS

This stage is the most problematic, complex and horrifying. This stage is similar to a sudden de-addiction, all of a sudden the attachment is gone and the fantasies are unfulfilled, what we commonly call a heartbreak. We lose our appetite, our patience, just like withdrawal syndrome. The results of this stage have a huge variety. There is madness and anger in that person which leads to acid attacks, rape, murder, threats. They want the same feeling again with the same person and they want to achieve it by hook or by crook. There are cases of blackmail, suicide attempts. They go to a stage where consequences don't matter as much as getting the person back does. On the other extremity, the person either gives up on everything, they lose their attachment from everyone and are someone completely different. And when nothing works, the last stage is that of self sabotage where the person starts destroying themselves or everything around them, they fall into the worst habits, hurt themselves just



to make the other person feel guilty, to make them believe that they are responsible for the condition that person is in. That is what Devdas did as well, he compelled Paro to come to him to make him stop, he reached a stage so miserable that the guilt automatically fell on her. I know it sounds illogical but if you ever found logic, it won't be called madness.

And on a leaving note, I would like to address some doubts which I commonly hear when I tell people about this:

Q1) Why some lovebirds get married? Is it not love?

It's not love, it's also a fantasy, a happy married life, having a dream family. When the partners share the same fantasies, it goes to marriage. But when the fantasies are over after marriage, the stage of attachment ends and they look for opportunities, this is where we find cases of extra marital affairs. You will find on Google that majority of these affairs occur in love marriage.

Q2) Why marriages last for a lifetime, would that be love?

I don't think it's true love, in my opinion, they either never got the opportunity they wanted or the opportunity was like a 20% increment and sometimes the social fear stops them from grabbing the opportunity they got. It could be their fantasy of spending their life with the same person, or maybe just a duty they have to fulfill.

Q3) What can we do to make our relationship longer?

First thing you can do is to achieve your goals or fantasies slowly, give it time, take it step by step.

Second thing you can do is keep creating new goals and slowly embed it in your partner's mind. If you say it directly it may sound very one sided. Express your fantasies in a way that it slowly becomes their fantasies as well, like discussing old age together, planning trips after marriage.

Third thing is try your best to never expose them to a better opportunity, if you think something can harm your relationship keep that far away from your relationship.

NOTE: Fantasies aren't always sexual, they are also about your needs in my life, the dreams you plan to achieve with someone, your goals, your ambitions.

Well that's my theory for all of you, think about it, maybe it will help you find something new about yourself. And I would love to know about your thoughts on my theory.

Signing off,
Your truly,
Amit Kumar.
BATCH 2025-26





उज्जर

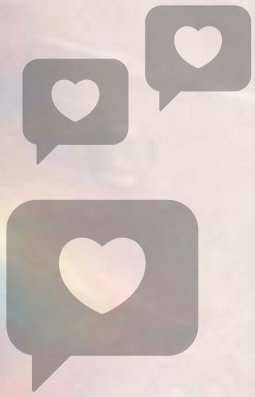


अनुक्रमणिका

• प्रस्तावना	I
• संपादकीय	
आरम्भ की दहलीज़ पर (श्रुति प्रिया राजहंस)	II
हमारी कलम का उद्गार (श्याम कुमार)	IV
• कविताएँ	
एक लड़की (रेवती शर्मा)	02
आइना (भाग्यश्री बिष्ट)	03
नक्राबपोश हकीकत (आतंरिक हालदार)	04
• कहानी	
अनुपस्थित: मैं (श्रुति प्रिया राजहंस)	06
• लेख	
आभासी बनाम यथार्थ: संतुलन ही जीवन है (श्याम कुमार)	10
गौरतलब, वो चाँद (कशिश कृति)	12

रील्स बनाम रियलिटी

प्रस्तावना



संचार के इस दौर में दुनिया बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है, क्षणभर में ही अनगिनत अनुभव, भावनाएँ एवं जीवन हमारी स्क्रीन से होकर गुज़र जाते हैं। जहाँ इस तीव्र गति ने जीवन को अधिक सहज बनाया है, वहीं दूसरी ओर आभास तथा यथार्थ के बीच की दूरी को भी बहुत कम कर दिया है। यह कह पाना कठिन हो चुका है की किसी कहानी का कितना हिस्सा सत्य है और कितना भ्रम।

“रील्स बनाम रियलिटी” सिर्फ एक विषय नहीं, बल्कि जो दिखता है और जो वास्तव में होता है उसके बीच के अंतर को समझने का एक प्रयास है।



संपादकीय

आरंभ की दहलीज़ पर



श्रुति प्रिया राजहंस
सह संपादक,
उद्गार

प्रिय पाठकों,

आप सभी का हमारे अपने बर्दवान मेडिकल कॉलेज की प्रथम पत्रिका “मेड-दर्पण” के आरंभिक संस्करण के इस हिंदी खंड “उद्गार” में स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है।

मेडिकल कॉलेज में दिन भर हम जहाँ शरीर को समझते हैं, वहीं मन को समझने की एक छोटी कोशिश है साहित्य...मन, शब्दों में उतारा हुआ। भावनाओं का एक अनोखा संकलन है साहित्य और भावनाओं का उद्गार ही तो अंततः रचनाओं का पथ प्रदर्शित करता है।

“वास्तविकता कभी इतनी आकर्षक नहीं रही, और भ्रम कभी इतना विश्वसनीय नहीं था।”

हम सभी एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ एक छोटी सी स्क्रीन पर हम पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, महज़ कुछ क्षणों में हज़ारों मील दूर रहने वाले ना जाने कितने लोगों की ज़िन्दगी हमारी आँखों के सामने से गुज़र जाती हैं। एक क्षण हम पहाड़ों में होते हैं और अगले ही क्षण समुद्र की लहरों के बीच, कभी किसी की सफलता पर मुस्कुराते हुए दिखते हैं तो अगले ही पल किसीके दुख पर आंसू बहाते। आभासी तथा यथार्थ का फासला दिन पर दिन घटता ही जा रहा है।

“रील्स बनाम रियलिटी” इसी आभासी और यथार्थ के बीच की धुंधली रेखा के ऊपर प्रश्न है, वो रेखा जहाँ स्मृतियाँ कल्पना से मिलती हैं और सबसे विश्वसनीय भ्रम सच को भी भ्रमित कर देता है।

इस खंड की सभी रचनाओं ने अपने-अपने ढंग से इस रेखा को छूने का प्रयास किया है। कुछ प्रश्न पूछेंगी, कुछ उत्तर खोजेंगी और कुछ आपको खुद आत्ममंथन करने पर मजबूर कर देंगी।

शायद साहित्य का उद्देश्य भी यही है- दूसरों की रचनाओं में खुद की पहचान ढूंढ़ लेना।

शुभकामनाओं के साथ,
श्रुति प्रिया राजहंस
सह-संपादक, संपादकीय मंडल
बर्दवान मेडिकल कॉलेज

संपादकीय

हमारी कलम का 'उद्गार'



श्याम कुमार
सह संपादक,
उद्गार

प्रिय पाठकों,
अत्यंत हर्ष और गौरव के साथ हम आपके समक्ष बर्दवान मेडिकल कॉलेज की प्रथम पत्रिका "मेड-दर्पण" का पहला संस्करण प्रस्तुत कर रहे हैं। किसी भी चिकित्सा संस्थान के लिए उसकी पहली पत्रिका सिर्फ पन्नों का संकलन नहीं होती, बल्कि यह इस बात का जीवंत प्रमाण है कि मोटी-मोटी किताबों, अस्पताल के गलियारों और मरीजों की तीमारदारी के बीच भी हमारे भीतर का संवेदनशील कलाकार पूरी शिद्दत से ज़िंदा है।

यह पत्रिका हमारे साथियों की वैचारिक परिपक्वता, उनके सपनों और उनकी अनकही कला का एक पारदर्शी आईना है। सच कहें तो जब हमने इस भगीरथ प्रयास की शुरुआत की थी, तब हमारे हाथ में सिर्फ एक कोरा कागज़ था और मन में ढेरों शंकाएं। लेकिन आज हमारे सहपाठियों की कविताओं, रेखाचित्रों और विचारों ने इसमें जीवन के जीवंत रंग भर दिए हैं।

मानव शरीर की जटिल संरचना और औषधियों के गूढ़ विज्ञान की दुनिया से परे, यह हमारी भावनाओं की एक उन्मुक्त उड़ान है। हमें पूरा विश्वास है कि "मेड-दर्पण" आपके दिलों को छुएगी। यह तो बस पहला कदम है, आने वाले वर्षों में यह कारवां और भी समृद्ध और खूबसूरत होता जाएगा।

इस पहले प्रयास को पढ़िए, मुस्कराइए और अपनी अमूल्य प्रतिक्रियाओं से हमें ज़रूर अवगत कराइए, क्योंकि आपकी सराहना ही हमारी इस रचनात्मक यात्रा की असली ऊर्जा है।

शुभकामनाओं के साथ,
श्याम कुमार
सह-संपादक, संपादकीय मंडल
बर्दवान मेडिकल कॉलेज

कविताएँ

The background of the page is a light, textured surface, possibly paper or fabric, with a soft, warm glow. Overlaid on this background are several dark, silhouetted leaves, likely from a tree, scattered around the central text. A single, long, golden feather with a detailed, barbed structure is positioned vertically, passing through the center of the text. The feather's tip points upwards, and its base is at the bottom. The overall composition is artistic and evocative, with a focus on natural elements. The text 'कविताएँ' is written in a large, elegant, serif font, colored in a light blue-grey. The entire page is framed by a thin, golden border.

एक लड़की

-रेवती शर्मा
(2023-24)



चित्र: सोहा आफरीन(2025-26)

देखी खिड़की से रास्ते का एक टुकड़ा जो,
लगी वही पूरी दुनिया उसकी ।

नंगे पाँव को धूप सेंकने की जब आदत लगी,
पगली समझी यही दिनचर्या उसकी ।

देखी जो एक छाया उसने,
सिर्फ वही सच माना उसने ।

देखी संगम प्रयाग में,
ढूँढ़ लिया अपना भी मिलन उसमें ।

पलकों के बाल जब आँख पर सजे रहे तो
लोग सुंदर दिखे,
जब टूटकर उसकी आँखों में गिरे तब पीड़ा
हुई ।

कोहरे से ढका रास्ता जैसा किरदार है
उसका,
लोगों के लिए,
और सच समझने के लिए सूर्य बनना
पड़ेगा ॥



आईना

-भाग्यश्री बिष्टु
(2025-26)



चित्र: श्रुति प्रिया राजहंस(2024-25)

सबके झोले भरे-भरे हैं, फिर मन कहीं अधूरा लगता है
परदा हटाकर देखो ज़रा, हर नज़ारा सुनहरा लगता है।

कभी स्क्रीन पर हँसते चेहरे, कभी आँखों में वीरानी है
कितनी गहराई पानी में ये डूबने वाला ही समझता है।

बारिश में झूमना-गाना या प्रिय गीत के साथ चाय बनाना,
अकेलेपन की असली क्रीमत, अकेला जीवन जानता है।

प्रेम के माने चार गुलाब, वीडियो, तस्वीर, कुछ गाने,
जब नहीं थे ये सब द्वापर में, फिर क्या था राधा-कृष्ण में?

लंबी-चौड़ी स्टोरी लगाएँ, या पोस्ट करके दुख मानाएँ,
न्याय तब मिलता, जब सब अपने अपने फ़र्ज निभाएँ।

झूठी चमक, आभासी सम्मान, बनावटी गर्व का संसार है,
गोद उठाके या थप्पड़ मारके ज़िंदगी राह दिखाती है।

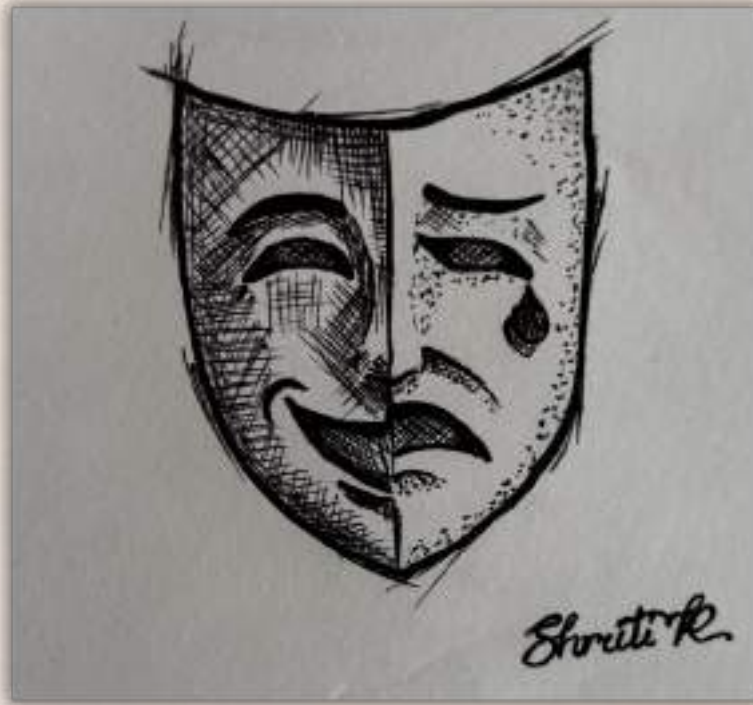
पॉज़ होता है रील्स मर्ज़ी से, रिज़्यूम भी हो जाता है,
घड़ी पर न रुकती वक़्त, न लम्हा लौट आता है।

माना, आसान नहीं आँसू छुपाना, फ़िल्टर लगाना, आईना तोड़ना,
रोना आये तो रो लेना, खुद को धोखा क्यों देना?

खुदको सामने खड़ा करके, जीने की वजह पूछ ही लेना,
दिन तो हँस के निकाल दोगे, कैसे बीतेगी झुलस्ती रैना?

नक्राबपोश हकीकत

-आतंरिक हालदार
(2025-26)



चित्र: श्रुति प्रिया राजहंस(2024-25)

नक्राबपोश चेहरे, उलझे हुए मन,
यहाँ कौन झूठा, और सच्चा कौन?

अधरों पर सदा सजी मुस्कान,
अंतरमन ही जाने भीतर का मसान।

"पूर्व सफलता तो है बड़ी आसान!"—
रीलों के पर्दे पर झूठा भाषण।

एक पल का बस एक हिस्सा,
मानो कह दे पूरे जीवन का किस्सा।

बनावटी दुनिया से करके तुलना,
क्यों है खुद को बदलना?

क्या मैदान के पार ही आकाश का अंत?
रील महज़ एक झलक, हकीकत अनंत।

कहानी



अनुपस्थित : मैं

-श्रुति प्रिया राजहंस
(2024-25)

यादों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वे हमें याद दिलाती हैं कि हमने सच में ज़िंदगी जी है।

यादें सबसे सच्ची होती हैं, ऐसा मुझे लगता है। जो जी लिया, उसे भला कैसे झुठलाया जा सकता है?

लोग तस्वीरें सहेज कर रखते हैं, मुझे हमेशा यादें संभाल कर रखना अच्छा लगता था।

हर किसी की कुछ ऐसी यादें होती हैं जो हर बार उनके चेहरे पर मुस्कान ला देती हैं। मेरी भी थीं... बहुत सी।

चाहे वो पहाड़ों पर बीती सुबह हो या बारिश में भीगे वर्षावन की पगडंडियाँ।

एक कप चाय पर चलने वाली वो घंटों लम्बी बातें, समुद्र किनारे बिताई तारों के छाँव के नीचे वो खूबसूरत रातें।

हर एक बात मुझे आज भी याद है, उतनी ही साफ, उतनी ही स्पष्ट। मानो सब कल की ही बात हो।

माँ हमेशा कहती है, "क्यों हर वक़्त इस फ़ोन में लगा रहता है?"



चित्र: श्रुति प्रिया राजहंस(2024-25)

अब उन्हें कैसे समझाता कि इस फ़ोन में मेरी कितनी बड़ी एक दुनिया थी। जिसमें मेरे अपने थे, जिसमें मेरी सबसे खूबसूरत यादें थीं।

दोस्त कहते थे कि मैं बदल गया हूँ, शायद सच भी था। उनके साथ बैठा होता, पर बातें किसी और की ही करता था।

कॉलेज की छुट्टियों में जब सबका घूमने का प्लान बनता तो मैं मना कर देता, मुझे उसमें कोई रुचि नहीं होती, मैं तो वो सारी जगहें पहले ही जा चुका होता। कभी हिमाचल, कभी असम तो कभी समुद्र के किनारे...

लोग पूछते थे, “कब गया था?”

मैं तारीख के साथ अपना पूरा अनुभव व्यक्त कर देता था। आखिर यही तो मेरी सबसे अनमोल यादें थीं।

एक दिन अंश ने हँसकर बोला, "भाई, तू जितनी जगह जा चुका है, उतनी तो हमने गूगल मैप्स पर भी नहीं देखी।"

मैं भी हँस दिया, "तुझे भी साथ चलना चाहिए था फिर।"

अंश ने कहा, “चल फोटो ही दिखा दे।”

"फोटो?"

“हाँ तस्वीरें तो होंगी ना यात्रा की” वह बोला।

मैंने बिना सोचे अपना फोन निकाला और गैलरी खोली...उसपे पहली तस्वीर को देखा, कुछ पल बस देखता रहा, फिर दूसरी तस्वीर, फिर तीसरी...

तस्वीरें तो थीं, सभी यात्राओं की...पर उनमें मैं नहीं था।

मैंने हड़बड़ाकर फोन बंद कर दिया और मुस्कुराकर बोला, "शायद दूसरे फोल्डर में होंगी।"

अंश कुछ देर बस मुझे देखता रहा पर कुछ बोला नहीं। उसकी नज़र में कुछ तो अजीब था...क्या वह मुझपर हँस रहा था? नहीं, ऐसा लग रहा था कि उसे मुझ पर तरस आ रहा है। पर क्यों? ये मैं समझ नहीं पाया...

उस रात मुझे नींद नहीं आई। मेरे दिमाग में अंश के साथ हुई वो बात घूम रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि तस्वीरें क्यों नहीं थीं?

मैं गया तो था, मुझे सब याद था, वो वादियां, वो ठंडी हवाएं, उस छोटी सी दुकान में बैठ कर चाय पीना। लेकिन फिर...तस्वीरें कहाँ गईं?

आखिर में मैंने दोबारा गैलरी खोलने का निर्णय लिया। मैंने “मनाली” फोल्डर खोला, वो तस्वीरें दोबारा देखी। वही पहाड़, वही सड़कें और वही चाय की दुकान, ये सब वही था... बस दर्जनों स्क्रीनशॉट, ट्रेवल ब्लॉग, रील्स के भीतर...

ऐसा लगा कि अंदर कुछ टूट गया हो। वो चाय की दुकान, वो तो मुझे इतनी साफ याद थी। क्या वहाँ मैं कभी गया ही नहीं? बस देखा था?

“नहीं...मैं वहाँ गया था” मैंने खुद से कहा।

“यादों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वे हमें याद दिलाती हैं कि हमने सच में ज़िंदगी जी है।”

मैंने जल्दी जल्दी अपनी सभी यादें टटोलनी शुरू की, अलग अलग फोल्डर खोले।

बारिश में भीगा वह वर्षा वन...एक यात्रा रील थी। “संयोग होगा!”

समुद्र किनारे वो रात...एक ब्लॉग था।

“ऐसा नहीं हो सकता है!”

वो मशहूर पेस्ट्री शॉप...एक फूड क्रिएटर का वीडियो थी।

“नहीं नहीं...ये कैसे संभव है?”



चित्र: श्रुति प्रिया राजहंस(2024-25)

एक एक करके मेरी यादें मेरी स्क्रीन बनकर
खुलने लगी।

मैंने फोन एक तरफ रख दिया। कमरे में एक
खामोशी छा गई थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा
था।

मैंने भारी मन से गैलरी दोबारा खोली...
स्क्रीनशॉट...रील...रील...ब्लॉग...स्क्रीनशॉट...
सहेजी हुई पोस्ट।

मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि मेरी यादों में
मैं ही कहीं नहीं था। मैंने एक-एक करके उन सभी
को डिलीट करना शुरू किया। और फिर एकदम
से मेरे हाथ रुक गए। उनको डिलीट करना अपनी
यादों को डिलीट करने जैसा था।

“अगर आज ये भी मिट गए...तो फिर मेरे पास
क्या बचा?” मैंने धीमी आवाज में कहा। “और
अगर ये भी उधार की हैं...तो मेरी अपनी यादें कहाँ
हैं?” कमरे में फिर से खामोशी थी, मुझे अपने
सवाल का उत्तर नहीं पता था।

आखिर में मेरी उंगली एक पुरानी धुंधली तस्वीर
पर पड़ी, मेरे बचपन की तस्वीर, मैं अपनी माँ का
हाथ पकड़कर मुस्कुरा रहा था। वो देख कर मेरी
आंखें नम हो गई।

मैं बहुत देर तक उस धुंधली तस्वीर को देखता
रहा। वह पहली तस्वीर थी जो किसी रील का
हिस्सा नहीं थी, उसमें ना कोई फिल्टर था ना वो
स्क्रीन की मोहताज थी।
था तो बस...मैं।

लेख



आभासी बनाम यथार्थ: संतुलन ही जीवन है

-श्याम कुमार
(2024-25)



चित्र: बिक्रम मजूमदार(2025-26)

"चेहरे पर सजी मुस्कान है या छलावे का कमाल? आइए देखते हैं इस आभासी दुनिया का जंजाल।"

आज का युग संजाल-माध्यमों का युग है। कुछ क्षणों के चलचित्रों ने मनोरंजन, ज्ञान और अभिव्यक्ति के तौर-तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है।

"पन्ने पलटते-पलटते उंगलियाँ थक जाती हैं, पर यह मायाजाल खत्म नहीं होता..."

इन चंद क्षण के दृश्यों में वैभवशाली यात्राएँ, आधुनिक जीवनशैली और 'रातों रात सफलता' की कहानियाँ परोसी जाती हैं। इन्हें देखने वाले को अक्सर भ्रम होने लगता है कि यही वास्तविक जीवन है और शेष संसार उससे कहीं अधिक सुखी और संपन्न है।

परंतु वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत होती है। यहाँ प्रदर्शित जीवन अधिकांशतः लोगों की ज़िंदगी के 'चुनिंदा सुनहरे पन्नों का संग्रह' मात्र है, संपूर्ण सत्य नहीं।

इसका सबसे गहरा और मर्मतक प्रहार हमारे युवाओं पर हो रहा है। दूसरों के इस 'कृत्रिम और आदर्श' जीवन से अपने साधारण जीवन की तुलना करने के कारण, युवाओं में आत्म-विश्वास की कमी और मानसिक अवसाद बढ़ रहा है।

इस मायाजाल से मुँह मोड़ने के 5 व्यावहारिक सूत्र:

हम जानते हैं कि आज के युग में इन साधनों का त्याग पूरी तरह संभव नहीं है, परंतु इन 5 व्यावहारिक सूत्रों को जीवन में उतारकर संतुलन बनाया जा सकता है:

'मौन-वेला' का नियम अपनाएँ:

शयन से कम से कम 30 मिनट पूर्व अपने चल-दूरभाष को विश्राम दे दें। सुबह उठते ही आदिकाल के 15 मिनट केवल स्वयं के एकांत को दें।

'दूरभाष वर्जित क्षेत्र' का निर्माण करें:

जब आप मित्रों के साथ किसी बैठक में हों या परिवार के साथ रात्रिभोज कर रहे हों, तो एक मनोरंजक नियम बनाएं। सब अपने दूरभाष मेज के मध्य में उलटे रख दें। जो सबसे पहले अपनी व्याकुलता पर नियंत्रण खोकर उसे छुएगा, उस सामूहिक भोज का व्यय वही वहन करेगा!

अपनी दृष्टि को 'परिष्कृत' करें:

उन पृष्ठों और व्यक्तियों को देखना बंद करें जो आपके भीतर हीन भावना का संचार करते हैं। इसकी जगह केवल उन विचारों को स्थान दें जो आपको आत्मिक रूप से समृद्ध करें।

समय की लक्ष्मण-रेखा तय करें:

इन माध्यमों के प्रयोग के लिए प्रतिदिन 30 या 45 मिनट की एक निश्चित समय-सीमा निर्धारित कर दें और उस पर अडिग रहें।

'सर्जक' बनें, मात्र 'भोक्ता' नहीं:

जब भी इस आभासी संसार में प्रवेश करें, तो एक संकल्प रखें— "मैं यहाँ दूसरों के जीवन की झाँकी देखने नहीं, बल्कि अपनी प्रतिभा को निखारने या कुछ नया सीखने आया हूँ।"

आभासी बनाम यथार्थ: संतुलन ही जीवन है

यहाँ यह समझना भी अनिवार्य है कि यह माध्यम पूरी तरह विषैला या नकारात्मक नहीं है। इनके द्वारा शिक्षा, चेतना, कला, व्यापार और सामाजिक संदेशों को भी अत्यंत प्रभावी ढंग से जन-जन तक पहुँचाया जा रहा है।

निष्कर्ष

यह आभासी दुनिया हमें आकर्षित कर सकती है, प्रेरित भी कर सकती है, परंतु वास्तविक सफलता और चिरंतन सुख केवल यथार्थ की भूमि पर किए गए पुरुषार्थ से ही प्राप्त होगा।

इस रंगमंच के चाहे आप 'सर्जक' हों या 'दर्शक', परंतु अपने मूल जीवन के 'सूत्रधार' सदैव आप स्वयं रहें! अगली बार जब किसी के चकाचौंध भरे दृश्य को देखकर आपको अपनी ज़िंदगी फीकी लगने लगे, तो मंद मुस्कुराइए और स्वयं से कहिए — "पूर्णविराम! यह केवल एक अभिनय है, यथार्थ नहीं।"

"इस चमक-दमक में असल ज़िंदगी न भुला देना, ये दिखावटी दुनिया है, इसे हकीकत न बना देना।"

गौरतलब, वो चाँद

-कशिश कृति
(2023-24)



चित्र: सोहा आफरीन(2025-26)

सूरज और चांद में बहुत अंतर है। यानी लोग जब समझाते हैं तो इस तरह कि चाँद में जो शीतलता है वो रात को अंधेरी से ज्यादा शांत बनाती है। और दिन का जो सूरज है उसके तेज़ से ही तो हमें कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। और अब तक ना कवि जैसे चाँद को बताते थे, मैं तो बिल्कुल उसमें फंस चुकी थी।

“चाँद शीतल है, चाँद प्यारा है, कितना सुंदर है और तो और उसके धब्बे बस उसके असल होने का सबूत देते हैं, वगैरह-वगैरह।”

देखो रात का इंतज़ार मुझे भी होता है कि अब रोशनी से थक गई, कोई आराम दे। पर अब जब हम कमरों में इतना समय बिताते हैं तो धूप रोज़मर्रा की ज़िन्दगी में अपने घर पर ही कुदरत का एक छोटा-सा टुकड़ा रख जाती है। और सुकून जो हम उस रात के लिए कहते हैं, वो सुकून जब खिड़की से धूप के अंदर आने का रास्ता दिखाई देता है तो भी हमारी हर छूटती अंगड़ाई के साथ महसूस होती है।

और इसे आदि की जिद कह लो कि जब वो पास आता है तो सिर्फ एक रंग दिखा कर नहीं जाता, अपनी सारी कशिश से सातों रंगों की कृति करता है, चाहे बूंद में कैद होकर या आसमान में बिखर कर। और तुम चांद से रंगों की क्या बात करोगे जब उसकी रोशनी भी किराये की है।

देखो, तुम चांद को निहार सकते हो पर उसकी तरफ से कितनी कोशिश है, ये कभी पता नहीं चलता और वो अलबेला इसी का फायदा उठा कर सदियों से हमारे साथ खेल रहा है। पर अगर तुम आदित्य की तरफ देखोगी तो वो तुम्हारी तरफ देखता है और शायद तुम से भी ज्यादा बेताबी से, इतने तेज़ से कि शायद तुम आँखें चुरा लो। बहरहाल ये भी अहसास दिला दे कि उसे पाने की चाहत एक मिथक है।

हाँ पर अगर तुम देखती रहो, कभी नीचे, कभी कहीं और या पर्दे की ओट से, पर इंतज़ार करो तो वो शाम बनकर तुम्हारे पास आएगा। और तुम थककर किसी कोने में बैठे हो पर शाम की किरणें हौले से तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर अपनी ओर मुड़ा लेंगीं। और फितरत जो है इनकी शाम आँखों में आँखें डाले ही बीतेगी और तीव्रता उस ओर से कितनी है इसमें तुम्हें धोखा शाम खत्म होने तक भी नहीं मिलेगा।

भाई चांद तो किधर है तुम ढूँढते रहो। बादल का बहाना तो दोनों करते हैं पर महीने में एक-दो दिन की चोरी तो चाँद मुफ्त की करता है।

तो मेरी नज़र से देखो तो चाँद रील की तरह एक मृगतृष्णा है, वहीं सूरज हर पल एक सा अकथित सच (रियलिटी)। बस यार अब मैं चली, अपने सूरज को और इंतज़ार नहीं करा सकती।





not all those
who wander
are lost.

Wanderlust



the
is
an
wh
tre
on
pe

WITHOUT ঝঞ্ঝাট, ব্যান্ডেলে বিভ্রাট

তারিখটা ঠিক মনে নেই। তবে ২০২৫ সালের নভেম্বরের শেষেই হয়তো—হঠাৎ করে ঠিক করেছিলাম যে কাছাকাছি কোথাও ঘুরে আসতে হবে একদিনে। গল্পটা বলি তাহলে শুনুন।

ওই সময় বর্ধমানের উৎসব ময়দানে খাদ্যমেলায় সমাহার। নানাবিধ লোভনীয় আহারের টানে পৌঁছে গিয়েছিলাম আমি ও আমার এক বন্ধু। কিন্তু দুজনেই খেতে বেশি পারলাম না। ওই যে কথায় বলে, “ঘ্রাণেন অর্ধভোজনম্”—আমরা দুজনেও তারই শিকার হয়েছিলাম। কিছু কাটলেট আর মোমো গলাধঃকরণ করেই দুজনে ঠিক করেছিলাম যে এখানে নৈশভোজ সেয়েই বাড়ি ফিরব আমরা। গল্প করতে করতে আমি বললাম—

- এ সপ্তাহে ফাঁকা আছিস?
- একটাম তো শেষ—হ্যাঁ, ফাঁকাই আছি।
- কাছাকাছি কোথাও ঘুরে আসি চল তাহলে—
- কাছাকাছি বলতে কোথায়? শান্তিনিকেতন?
- শান্তিনিকেতন তো দেখা আছে; ব্যান্ডেল গেছিস কোনোদিন?
- ব্যান্ডেল একদিনে ঘোরা যায়?
- চল দেখি একদিনে যতটা ঘুরে দেখা যায়; কাছেই তো—এক ঘণ্টার ট্রেন জার্নি মাত্র।

অতঃপর আমাদের আহার এসে হাজির। কিছুক্ষণ খেতে খেতে সে বলল, “পরশুদিন যাবি?”। ব্যাস! যে মন কথাতে মন কাজ। মাঝখানে শুধু একটাই সমস্যা—

পরীক্ষা শেষে ছুটির আমেজে সকলেরই পরমানন্দে মাসির বাড়ি, মামার বাড়ি ঘুরতে যেতে বা কখনও কখনও নিজেরই বাড়িতে আয়েশের টানে ফিরে যেতে ইচ্ছা করে। তাই ভ্রমণ-পরিকল্পনা ভেসে যাওয়ার আশঙ্কাতেই আমার বন্ধু হঠাৎ রাতে মেসেজ করে জানায়—

- কী রে—
- কী?
- পালিয়ে যাসনি তো?
- কোথায়?
- বাড়ি...



শ্রী গঙ্গেশ্বরী মন্দির



শ্রী গঙ্গেশ্বরী মন্দির

BUNDLE

WEST BENGAL

— নাহ্ রে! চাপ নিস না, সোমবার পাক্কা যাব।

— ওক্কে। (আহ্লাদে-আটখানা ইমোজি)

জানি না সকলের এটা হয় কি না—কিন্তু প্রতি বার কোথাও যখন একটু নতুনত্বের, যথা নতুন স্থান, নতুন দৃশ্য, নতুন পরিবেশ অনুভব করার আভাস পাই, সেই উত্তেজনায় রাত্রে ঘুমানো খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে ওঠে। সকাল হলো। প্রয়োজনীয় সামগ্রী ব্যাগে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ঘর থেকে।

প্রথমতঃ বর্ধমানের মতো ব্যস্ত স্টেশনে একে অপরকে খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর। তারপরে টিকিট কেটে সকাল ৮টা ৫০ মিনিটের বর্ধমান-হাওড়া মেন লাইন গ্যালপিং লোকালে দুজনে রওনা দিলাম ব্যান্ডেলের উদ্দেশ্যে। ধীরে ধীরে ট্রেন তার মন্থর গতিতে, ছান্দিক ধ্বনিতে শহরের ডামাডোল ছেড়ে—এলো বিস্তৃত উর্বর ক্ষেত্রে।

গাংপুর স্টেশন পেরোতেই দূরে দেখা যেতে লাগল শক্তিগড়ের প্রসিদ্ধ সেই দোকানগুলো—ল্যাংচা মহল, ল্যাংচা নিকেতন, আদি ল্যাংচা নিলয় প্রভৃতি। সেগুলো দেখতে-দেখতেই মনে পড়ে গেল যে প্রাতঃরাশের অভাবে দুজনেরই মধ্যে একটু ক্ষিদের দেখা মিলেছে। তৎক্ষণাৎ আমার জাদুকরী ব্যাগ থেকে বেরিয়ে পড়ল চিড়ে ভাজা আর তা দিয়েই হলো আমাদের সাময়িক ক্ষুধানিবৃত্তি।

আমার ব্যাগকে জাদুকরী বলার কারণ আছে। বন্ধুদের মাঝে একটা কথার প্রচলন আছে যে—কলেজ হোক বা অনুষ্ঠান, আমি আমার ব্যাগকে ছুটির অবসর দিই না। যেখানে আমি যাই, সেখানেই আমার ব্যাগও যায়। আর পৃথিবীতে এমন কিছুই নেই যেটা প্রয়োজনের সময়ে আমার ব্যাগে পাওয়া যাবে না। বৃষ্টি হলে ছাতা, জ্বর হলে ওষুধ, তেষ্টা পেলে জল আর স্টুডেন্ট ডিসকাউন্টের জন্য আইডি কার্ড—সবই আমার ব্যাগে পাওয়া যায়।

জানলার ধারে বসে হকার ও যাত্রীদের কোলাহলের মাঝে স্কুলজীবনের স্মৃতিচারণ করতে করতেই দুজনে পৌঁছে গেলাম ব্যান্ডেল স্টেশনে। নেমে দেখলাম স্টেশনের ঝুলন্ত ডিজিটাল ঘড়িতে তখন বেলা ১০:২৫। স্টেশনের পাশেই অটোস্ট্যান্ড থেকে চাতক পাখির মতো জুলজুল চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে অটোচালকরা। ভাবলাম, জিজ্ঞাসা করে দেখি একটু—

— দাদা, ব্যান্ডেলের টুরিস্ট স্পটগুলো ঘুরিয়ে দেখানোর কোনো ব্যবস্থা আছে?

— হ্যাঁ দাদা! শরৎচন্দ্র ভবন, লাহিড়ী বাবার আশ্রম, হংসেশ্বরী মন্দির, ব্যান্ডেল চার্চ, হুগলির ইমামবাড়া নিয়ে "পাঁচটা স্পট" দেখাব—সব নিয়ে "আটশো টাকা"।

— অ্যাঁ! কত টাকা?

— "আটশো টাকা" দাদা।



সূর্যঘড়ি



হুগলির ইমামবাড়া

BUNDLE

WEST BENGAL

আমি অবাক নয়নে আমার বন্ধুর দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলাম—

- ১০০ টাকাই বলছে তো?
- হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে।
- ভালোই তো! সম্ভায় হয়ে যাচ্ছে—চ' উঠে পড়ি তাহলে?
- চল।

খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগিজ নাবিক ও ব্যবসায়ীদের হাতে গড়ে ওঠে এই ব্যান্ডেল শহর। ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট আকবরের অনুমত্যানুসারে, পর্তুগিজরা তাদের কলোনি গড়ে তোলে এখানে।

অটো করে আমরা যাচ্ছিলাম দেবানন্দপুরের উদ্দেশ্যে। যতই তোমরা ব্যান্ডেলকে শহর বলো, আমার মতে ব্যান্ডেলকে মফঃস্বল বলাই শ্রেয়। ব্যান্ডেলে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগলেও শহরে চাঞ্চল্য সেখানে শ্রিয়মাণ; জালকাকারে বিস্তৃত আঁকা-বাঁকা সিমেন্টের পথ, কোথাও পাকা বাড়ি, কোথাও বা গোয়াল, আবার কোথাও বা সারি সারি বাঁশগুচ্ছের বিস্তার বাগান—ব্যান্ডেলের শান্তিপূর্ণ, গ্রামীণ, মন্থরী স্বভাবকেই দর্শায়।

প্রায় তিন কিলোমিটার যাত্রার পর আমরা পৌঁছালাম কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পৈতৃক ভবনে। ভিতরে ঢুকে দেখলাম কতকগুলো পুনঃসংস্কাররত বিক্ষিপ্ত একতলা বাড়ির সমাবেশ আর তার মাঝখান দিয়ে এগিয়ে গেছে বাঁধানো সংকীর্ণ গৃহপথ। সেখানে বৈঠকখানা, বাসভবন ছাড়াও একটা সূতিকাগৃহের দেখা মেলে। সাধারণত তৎসময়ে প্রসবের পরে মা ও নবজাতকের বিশেষ যত্নের জন্য এই ধরনের ঘর ব্যবহার করা হতো।

বেরোনোর সময় দেখলাম এক ছাত্রীদল তখন স্ফটিকের দণ্ডায়মান শরৎচন্দ্রের মূর্তির সঙ্গে সেলফি তুলতে ব্যস্ত। তবে তাদের "স্মাইল" বলাতে কথাশিল্পীর স্ফটিক হৃদয়ে বিন্দুমাত্র হাসির সঞ্চার হলো না। বেরিয়েই আমাদের অটোচালককে জিজ্ঞাসা করলাম—

- স্মৃতি মন্দিরটা কোন দিকে দাদা?
- ম্যানেজার "ছুটিতে" বাড়ি পালিয়েছে—আজ মিউজিয়াম "বন্ধ"।

সোমবারে আমাদের মতো জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থীদের জ্ঞান আহরণে বাধা দিয়ে ম্যানেজারের প্রমোদ-পিপাসায় নিজেকে সিক্ত করা কি শোভনীয়, বলুন তো? তবে জানা গেল যে ১৯৪৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এই সংগ্রহশালার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

রওনা দিলাম লাহিড়ী বাবার আশ্রম তথা অধরালয়ের উদ্দেশ্যে। হঠাৎ মাঝপথে অটোচালক আমাদের জিজ্ঞাসা করল—



শরৎচন্দ্রের পৈতৃক ভবন



শরৎ স্মৃতি মন্দির

BUNDLE

WEST BENGAL

— এখানে কাছাকাছি "দুটো" আশ্রম আছে দাদা, "দুটোই" দেখবেন? নাকি শুধু লাহিড়ী বাবার আশ্রমে নিয়ে যাব?

— তুমিই জানো দাদা, তুমিই রথ চালাচ্ছ। তুমি যেখানে নিয়ে যাবে আমরাও সেখানেই যাব।

শেষে অটো গিয়ে প্রথমে দাঁড়াল গায়ত্রী আশ্রমে। প্রাকৃতিক বিশাল আকারের গাছ-গাছালি, অর্চনাগৃহ ও বিভিন্ন ভাস্কর্যের সৌন্দর্যের সন্নিবেশ ঘটেছে এখানে। এখানে আছে ভগবান শিব, মা কালী, রাধাকৃষ্ণের পুজোর জন্য পৃথক পৃথক অর্চনাগৃহ, আছে যোগ্যকুণ্ড; এছাড়াও একটা গোয়াল ও একটা শিশু উদ্যানের দেখা মেলে এইখানে।

আর সেই শিশু-উদ্যানে আমাদের মতো নিষ্পাপ শিশুদের স্ফূর্তির ঠিকানা নেই। এদিকে আমরা দোলনা, সি-সতে (Seesaw) ঝুলছি আর অন্যদিকে বয়স্করা ভাবছে যে এরা গড়নেই বড়, মনে শৈশবও টপকাতে পারেনি এখনও।

এরপরে পৌঁছালাম লাহিড়ী বাবার আশ্রমে। আশ্রমের সৌন্দর্য কল্পনা করিয়ে পাঠকদের কষ্ট দেব না আর। এর পরিসর গায়ত্রী আশ্রমের তুলনায় অনেকটাই বেশি। ফুলবাগান, শিবঠাকুরের গুহা, কৃত্রিম নদী, কাঠের সেতু, পাখিরালয়, সংগ্রহালয়—সব মিলিয়ে জায়গাটা বৃন্দাবনের কোনো প্রমোদকানন বলে মনে হতে পারে। সব থেকে অনির্বচনীয় মনোমুগ্ধকর হলো এখানকার শ্বেতমন্দির।

এবার একটু শহরের দিকে ফিরে আসা যাক। গ্রামের অলিগলি পেরিয়ে মেন রোড ধরে প্রায় ১০ কিলোমিটার আমাদের অটো এই তিন মানুষের বোঝাকে বহন করে—ফেলল বাঁশবেড়িয়ায় শ্রী হংসেশ্বরী মন্দিরের সামনে। মন্দিরে প্রবেশ করার আগেই বাঁদিকে কিছু দূরে এক হলুদ জমিদার বাড়ি অবস্থিত, যা বিরাট হলেও জরাজীর্ণ। প্রথম দেখাতেই হঠাৎ মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারির কথা মনে পড়ে।

এই হংসেশ্বরী মন্দির যেন আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পৌঁছে দিল। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে রাজা নৃসিংহদেব এই মন্দিরের নির্মাণকার্য শুরু করেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে এর নির্মাণ স্থগিত হয়ে যায়। পরবর্তী কালে তাঁর বিধবা পত্নী রাণী শঙ্করী ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে এর নির্মাণকার্য শেষ করেন।

তৎকালীন সময়ে এইরূপ মন্দির প্রতিষ্ঠা বিস্ময় ছাড়া আর কিছু নয়। ১৩ রত্নবিশিষ্ট পাঁচতলা উঁচু এই মন্দিরে সে সময়ের প্রচলিত নকশার পরিবর্তে প্রকাশিত হয়েছে শালুক বা পদ্মের পাপড়ির ন্যায় ভাস্কর্য। রত্ন বলতে প্রকৃতপক্ষে চুড়া বোঝায়। এই মন্দিরের অন্দরে একটি কাঠের হংসেশ্বরী দেবীর মূর্তি স্থাপিত আছে। হংসেশ্বরী মন্দিরের পাশেই অবস্থিত সপ্তদশ শতাব্দীর একটি পোড়ামাটির একরত্নবিশিষ্ট বাসুদেব মন্দির—যার পোড়ামাটির ফলকে ফুটে উঠেছে যুদ্ধের দৃশ্য, নৌকায় সিপাহী, বন্যজন্তু, ভিক্ষুক, রাম-রাবণের যুদ্ধ প্রভৃতি দৃশ্য।



বাঁশবেড়িয়ায় এক জমিদার বাড়ি



গায়ত্রী আশ্রম

BUNDLE

WEST BENGAL

শীতকাল হলেও দুপুরের গরমে আমাদের চোখ গেল রাস্তার ধারে বসা এক ডাবওয়ালার দিকে। এত ধকলের পর, ডাবের জল আর নারকেলের কোয়া আমাদের কাছে যেন অমৃত।

ধীরে ধীরে দুপুর যত বাড়তে লাগল, আমাদের ক্ষুধাঘির শিখা মাথায় উঠতে শুরু করল। ঠিক করলাম ব্যান্ডেল চার্চ পৌঁছে তারপরে ক্ষুধাঘিতে জল ঢালার ব্যবস্থা করতে হবে।

দুপুর তখন দেড়টা। আমরা এসে পৌঁছালাম ‘দ্য ব্যাসিলিকা অফ দ্য হোলি রোজারী’ তথা ব্যান্ডেল চার্চে। এটাই আমার চার্চে প্রবেশের প্রথম অভিজ্ঞতা। প্রবেশদ্বার পেরোনোর সময়ই আমরা অভিভূত—কারণ দর্শনার্থীদের জন্য খুলে রাখা সরু প্রবেশদ্বারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা মোটা স্টিলের পিলার—সে যেন সকলকে নির্দেশ দিচ্ছে স্বাস্থ্য-সচেতন হওয়ার জন্য; কারণ চওড়া মানুষের ক্ষেত্রে ঢোকা সত্যিই দুরূহ ব্যাপার। কখনও কখনও দেখতে পাবেন ‘কোনি’ উপন্যাসের বিষ্টুধরের মতো কোনো অতিকায় ব্যক্তি ল্যাম্পপোস্টের ন্যায় হাত তুলে, শ্বাস আটকে, পেট কুঁচকে প্রবেশ করছে।

এগোতেই দেখলাম সামনে মুক্ত প্রাঙ্গণ ও বাঁদিকে এক বিশাল মাস্তুলদণ্ড। কথিত আছে, বঙ্গোপসাগরে এক জাহাজ তীর ঝড়ের প্রকোপে পড়লে জাহাজের ক্যাপ্টেন মাতা মারিয়ার কাছে প্রার্থনা জানান ও প্রতিশ্রুতি দেন যে রক্ষা পেলে মাস্তুলদণ্ডটা তিনি গির্জায় প্রদান করবেন। ৭০ ফুট মাস্তুলটা পতাকাস্তম্ভ হিসেবে প্রধান প্রবেশদ্বারের পাশে স্থাপিত ছিল, কিন্তু ২০১০ সালের সাইক্লোনে তা ভেঙে যায় এবং এখন তা সংরক্ষিত করে রাখা আছে।

আমাদের মতো ভবঘুরেরা এইরূপ প্রকাণ্ড চার্চে হারিয়ে গেলে, স্বাভাবিকই অবাক হওয়ার কিছু নেই। ভিড় যদিকে হাঁটছিল আমরাও সেদিকে যাচ্ছিলাম—পৌঁছালাম প্রধান প্রার্থনা কক্ষে। প্রার্থনা কক্ষে শান্তি বজায় রাখা অবশ্য পালনীয়। এই কক্ষে সাধারণের বসার জায়গাকে ‘নেভ’ (The Nave) বলে এবং সারিবদ্ধভাবে রাখা বেঞ্চগুলিকে ‘পিউস’ (The Pews) বলা হয়। কক্ষটির সামনের অংশে সুদৃশ্য মূল বেদি রয়েছে, যেখানে যিশু খ্রিস্ট ও কুমারী মেরির মূর্তি শোভা পায়।

এবার আমরা চলে এলাম চার্চের মাঝের ক্ষুদ্র অঙ্গনে আর সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলাম ছাদে। যেহেতু এইটা আমার চার্চে প্রবেশের প্রথম অভিজ্ঞতা, তাই অনেক কিছুই আমার ধারণার বাইরে ছিল, যা দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। তার মধ্যে একটা হল—ধূপকাঠির ব্যবহার। দর্শনার্থীদের অনেকেই ছাদে একটা মাটির প্লাটফর্মে ধূপকাঠি লাগিয়ে দিচ্ছিল।

আবার সেই পিলার আর প্রবেশদ্বারে পৃষ্ঠ হয়ে চার্চ থেকে বেরিয়ে, পেটকে তৃপ্ত করতে ঢুকে পড়লাম কাছেই এক রেস্টোরাঁতে। প্রায় দুপুর আড়াইটার সময় আমরা পৌঁছালাম আমাদের শেষ গন্তব্য—হুগলির ইমামবাড়াতে।

১৮৪১ থেকে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ২০ বছর ধরে, মানবপ্রেমী হাজী মহম্মদ মহসিনের রেখে যাওয়া অর্থের দ্বারা হুগলি নদীর তীরে গঠিত হয় এই ইমামবাড়া। প্রকৃতপক্ষে নবী হযরত মহম্মদের নাতি ইমাম হুসেন ইরাকের কারবালা ময়দানে তৎকালীন শাসকের বিরুদ্ধে...



ইমামবারার হুগলি উপস্থিত
ঘর্টসমূহ



তথ্যসংগ্রহ

BUNDLE

WEST BENGAL

...ইসলাম ধর্মকে রক্ষা করতে শহীদ হয়েছিলেন এবং তাঁর আত্মবলিদানের স্মরণেই ইমামবাড়ার প্রতিষ্ঠা হয়।

এখানে ইমামবাড়া-প্রবেশদ্বারের উপর একটি চূড়া আছে, যেখানে তিনটি ঘণ্টাবিশিষ্ট একটি বিশাল ঘড়ি লাগানো আছে, যার উভয় মুখে একটি করে ডায়াল উপস্থিত। এই ঘড়ির মাঝারি ও ছোট ঘণ্টাটি ১৫ মিনিট অন্তর এবং বড় ঘণ্টাটি ১ ঘণ্টা অন্তর বাজে। সেই চূড়ায় উঠতে গেলে প্রায় ১৫০-এর বেশি ঘূর্ণায়মান সিঁড়ি চড়তে হয়, যেটাতে আমার বন্ধু অর্ধেক আর আমি পুরো উঠেছিলাম আর হাঁপাতে হাঁপাতে নেমেছিলাম।

এখানকার সবচেয়ে বিস্ময়কর স্থান হল এখানকার পুরোনো আমলের পুরোনো ধাঁচে তৈরি স্নানাগারটি। এখানে তৎকালীন সময়ের 'Scented Water Haus'-ও বর্তমান।

ইমামবাড়ার পিছনের দরজা দিয়ে নদীর দিকে এগোলে দেখতে পাবেন একটি সূর্যঘড়ি বা Sundial, যা এখনও সঠিকভাবে সময় নির্দেশ করে যাচ্ছে।

ঝঞ্ঝাটবিহীন এই ভ্রমণে কিছু একটা কারণে একটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম, কিন্তু সেটার কারণ কিছুতেই ঠাহর করতে পারছিলাম না। প্রায় সাড়ে তিনটার সময় যখন ব্যান্ডেল স্টেশনে পুনরায় পৌঁছালাম, সেখানে আমাদের অটোচালককে ১০০ টাকা ধরাতেই সে বলে উঠল—

— "আটশো টাকা?"

— তুমি-ই তো বললে ১০০ টাকা।

— "একশো" নয়, "আটশো" বলেছিলাম, দাদা!

ততক্ষণে আমার চোখ কপালে উঠে গেছে। বললাম—

— অ্যা! আটশো?

— হুম্।

আমি একটু মায়াভরা স্বরে বলার চেষ্টা করলাম—"একটু কমাও দাদা। আমরা স্টুডেন্ট— বুঝতেই তো পারছ।"

অন্তিমে অটোচালককে সাড়ে সাতশো ধরিয়ে, ত্রিশ টাকার টিকিট কেটে দুই ভবঘুরে তাদের বাসায় ফিরে এল।

~রুদ্মনীল বাগ (বর্ষ: ২৪-২৫)



ব্যান্ডেল চার্চের শহুরে দৃশ্য



পোড়মাটির বাগুদেব মন্দির

উড়িষ্যা ওয়াটার শং

২০১৯ শালে ডিসেম্বর মাসের শুরুর দিকে আমরা চার বন্ধু মিলে দু দিনের জন্যে পুরী বেড়াতে গেছিলাম। রাতের হাওড়া পুরী সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস ধরে সকাল এ পৌঁছে সকলেই ঠিক হলো চিন্তা হ্রদ দেখতে যাব। হোটেল থেকেই গাড়ি ঠিক করে, এগারোটার দিকে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। দুপুরে ওখানেই ভাত আর কাঁকড়ার ঝাল খেয়ে নৌকো ভাড়া করে বেরিয়ে পড়লাম জল পথে।

দিনের আবহাওয়া খুব সুন্দর থাকায় বেশ মজা হচ্ছিল। আকাশের মেঘের মতো হালকা হওয়ার সাথে দুলে দুলে নৌকো চলছিল আর আমরা মাঝে মাঝে মাঝি দাদার থেকে মোটরের হ্যান্ডেল টা নিয়ে নৌকোটা চালাচ্ছিলাম। বেশ কিছুক্ষন চলার পর একটা জায়গায় এসে আমাদের বলা হলো জলের দিকে তাকিয়ে থাকতে। কিছু সময় এক দৃষ্টি তে তাকিয়ে থাকার পরেই আমরা জলে কিছু একটা দেখতে পেলাম, মাগুর মাছের মতো জলের ওপর থেকেই পিঠটা ঘুরিয়ে আবার নিচে চলে গেলো। এটাই ছিল ইরাবতী ডলফিন।

আকাশে মেঘ, হালকা ঝির ঝির বৃষ্টি, সময় ওই তিনটে নাগাদ, ইরাবতী ডলফিন ও অনেক রকমের নাম না জানা পাখি দেখে আমাদের নৌকো, ফেরার পথে রওনা দিলো। মাঝি বলল ঝড় আসতে পারে তাই লাইফ জ্যাকেট গুলো বার করে দিলো। আকাশে কিছুটা দূরে আমরা ঘন কালো মেঘ দেখতে পাচ্ছিলাম।

কিছুক্ষণ পরেই আকাশটা পুরো কালবৈশাখীর মতো কালো হয়ে গেলো আর হওয়ার বেগ জোরে হওয়ায় আমাদের নৌকো বেশ দুলতে শুরু করলো। আমাদের সাথেই আরও একটা নৌকো চলছিল একটু দূরে কিন্তু আমরা সেটাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। আমরা সবাই সাঁতার কাটতে জানতাম কিন্তু সেই সময় জলে পড়লে এতে কোনো লাভ হতো না কারণ যা জোর চেউ আর হওয়া দিচ্ছিল দুলন্ত নৌকোর ওপরেই আমাদের যমরাজকে দেখা হয়ে গেছে।

তারপর শুরু হলো তুমুল বৃষ্টি। এতক্ষণ এ চারিদিক অন্ধকার আর আমাদের অবস্থা – ছোটো মাছ ধরার কাঠের নৌকো, কোনরকম একটা শেডের তলায় আমরা বসে আছি। শেড ছিল কিন্তু চেউ আর বৃষ্টির জলে আমরা চুপচুপে ভিজেগেছিলাম। প্রতিটি চেউ যেন পাহাড়ের মতো উঠে এসে আমাদের ওপর ভেঙে পড়ছিল। বাতাসের হুঙ্কার কানে আর বুকের ভেতর বাজছিল। বৃষ্টির ধারালো ফোঁটাগুলো মুখে এসে বিঁধছিল। বিদ্যুতের ক্ষণিকের ঝলকে দেখতে পাচ্ছিলাম মৃত্যুর মতো কালো চেউগুলো ফেনায় সাদা হয়ে গেছিল। আমি প্রাণপণে নৌকার ধার আঁকড়ে ধরে ছিলাম। মনে হচ্ছিল হাতের সাথে আমার জীবনটাও যেন সেই কাঠের গায়ে আটকে আছে।

সেই সন্ধ্যার প্রতিটি মুহূর্তে মনে পড়ছিল মা বাবার মুখ, অসমাপ্ত স্বপ্নগুলো, আর সেই সব কথা যা কখনো কাউকে বলা হয়নি। মৃত্যুকে এত কাছে থেকে আগে কখনো দেখিনি। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর ঝড়ের মাঝেও কোথাও যেন একটুকরো বিশ্বাস বেঁচে ছিল—হয়তো আরেকটি চেউ পার হলেই পারে পা দেবো।

এর মধ্যে আমাদের মাঝি দাদার অবস্থা টা উল্লেখযোগ্য। সে নৌকোর পিছনে শুধু মোটরের হ্যান্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। কিভাবে ওই হাওয়া আর ওই চেউ আর মাঝে নৌকোটাকে সামলেছে ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়। আমার এখনও মনে আছে আমি তাকে দেখেছিলাম, তার মুখ দেখে মনে হয়েছিল সে যেনো কাঁদছে কিন্তু ভয়, সাহস আর নৈপুণ্যতার মাঝে অক্ষর কোনো জায়গাই ছিল না। তার দারুণ দক্ষতা আর অসম্ভব মনের জোর না থাকলে আমরা হয়ত সেদিন জলে তলিয়ে যেতাম।

ODISHA

THE SOUL OF INCREDIBLE INDIA

ছোট্ট নৌকোটি উত্তাল ঢেউয়ের বুকে একটা কাগজের টুকরোর মতো
তুলতে তুলতে হঠাৎ একটা জোর ধাক্কায় আমরা সবাই কেঁপে উঠলাম।
মনে হলো যেনো এবার আমাদের নৌকো হাল ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু মাঝি
দাদার কথা থেকে হঠাৎ এসে চিৎকার করে বলে " নামো নামো"।
যেই চোখ ভয়ে বন্ধ করে রেখেছিলাম খুব সাহস করে পিছনে ঘুরে দেখি
আমরা পারে এসে গেছি।

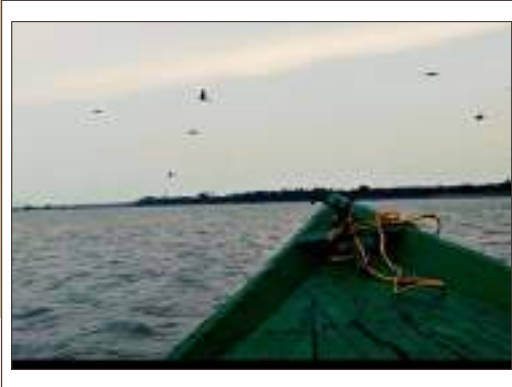
আমরা সবাই একে অপর কে ধরে নৌকো থেকে নেমে দেখি, পারে কিছু
লোকজন আমাদের অপেক্ষা করছিল। আমাদের গাড়িটাও এগিয়ে
এসেছিল। যেখান থেকে জল যাত্রা শুরু করেছিল শেষটা অল্প জায়গায়
হয়েছে। বুদ্ধি করে আমাদের মাঝি দাদা নৌকো আগেই পারে তুলে
দিয়েছিল। তখনও খুব জোরে বৃষ্টি পড়ছিল আর হওয়া দিচ্ছিল বলে
আমরা নেমে একটুও না দাঁড়িয়ে গাড়িতে উঠে পড়েছিলাম আর ফিরে
এসেছিলাম। মাঝি দাদার সাথে আর কোনো যোগাযোগ নেই। তখন
ফোন নম্বর নেবার সময় ছিল না। সবাই একটা কারণ এ ব্যস্ত হয়ে
পড়েছিল তখন।

আমাদের সাথে যেই নৌকোটা আসছিল, যেটা আমরা দেখতে
পাচ্ছিলাম আগে, সেটা ডুবে গেছিল। শুনেছিলাম ওটায় একটা পরিবার
ছিল।

হোটেল ফেরার সময় আমরা কেউ একটা কথা বলিনি।

একবার ড্রাইভার কাকুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম সেই নৌকোর কথা, সে
কোনো খবর পায় নি তখনও বলে আর আমরা কিছু জানতে পারিনি।

~অরিত্র গাঙ্গুলী (বর্ষ: ২৫-২৬)



A JOURNEY THROUGH THE SOUL OF RAJASTHAN: LAND OF KINGS, FORTS, AND ENDLESS SANDS

Rajasthan is not merely a state; it is a living saga of valor, romance, and timeless beauty. From the bustling pink hues of its capital to the golden whispers of its deserts, every corner tells stories of Rajput warriors, opulent palaces, and sacred traditions that have endured for centuries. I set out on this odyssey with a heart full of wonder, tracing a route that unveiled the grandeur of Jaipur, Bikaner, Jaisalmer, the windswept Sam Desert and Indo-Pak border, Jodhpur, Udaipur, Chittorgarh, and the serene divinity of Pushkar.

JAIPUR: THE PINK SYMPHONY OF ROYALTY

My journey began in Jaipur, the vibrant Pink City, where history and modernity dance in perfect harmony. As the morning sun kissed the honey-colored walls of the Amer Fort, I ascended on an elephant's back (a traditional yet now responsibly managed experience), marveling at the intricate mirror work, frescoes, and sweeping views of Maota Lake below. The fort's Sheesh Mahal shimmered like a jewel box under lantern light in my imagination. Descending into the old city, the Hawa Mahal—the Palace of Winds—stood like a giant honeycomb, its 953 latticed windows once allowing royal ladies to gaze upon the streets unseen. The City Palace complex, with its museums of royal artifacts, weapons, and costumes, spoke of unparalleled opulence. Nearby, Jantar Mantar, the UNESCO-listed astronomical observatory built by Maharaja Jai Singh II, felt like stepping into an ancient laboratory of the cosmos. Evenings were spent at Nahargarh Fort, watching the city lights twinkle like scattered diamonds, while savoring a royal thali under the stars.



HAWA MAHAL



AMER FORT



JAIPUR CITY PALACE



NAHARGARH FORT



JANTAR MANTAR



MAGNIFICENT SHEESH MAHAL IN AMER FORT

BIKANER: WHERE LEGENDS AND THE UNEXPECTED MEET

From Jaipur, the road led northwest to Bikaner, a city that balances rugged desert charm with refined elegance. The mighty Junagarh Fort rose imposingly, its red sandstone bastions and palaces adorned with exquisite carvings, gold leaf, and lacquer work. Inside, the Karan Mahal and Anup Mahal transported me to eras of courtly intrigue. A truly unique pilgrimage awaited at the Karni Mata Temple at Deshnok known as the Rat Temple. Thousands of sacred rats (kabas) roam freely here, believed to be reincarnations of devotees. It was surreal yet deeply spiritual. Rampuriya Haveli is a masterpiece of Bikaner's architectural heritage, adorned with exquisite red sandstone carvings and intricate jharokhas. Walking past its magnificent façades feels like stepping into the grandeur and timeless elegance of Rajasthan's royal past. Bikaner's streets buzzed with the aroma of fiery mirchi bada and sweet rasgullas, fueling my wanderlust.



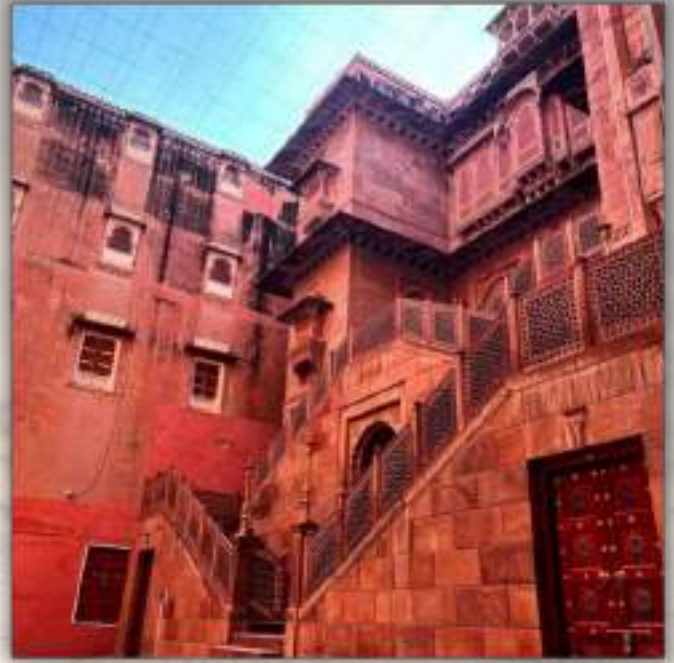
JUNAGARH FORT COURTYARD



ANUP MAHAL ADORNED WITH 56 KG GOLD



RAMPURIYA HAVELI



RED SANDSTONE CARVINGS OF JUNAGARH FORT

JAISALMER: THE GOLDEN CITADEL IN THE DESERT

As the landscape turned arid, Jaisalmer—the Golden City—emerged like a mirage. The magnificent Jaisalmer Fort, one of the world's largest living forts, crowns a yellow sandstone hill, its ramparts glowing ethereally at sunset. It reminded me repeatedly of the film "Sonar Kella" by great Satyajit Ray after which the tourism was promoted there. Wandering its narrow lanes felt like time travel: intricately carved Jain temples.



JAISALMER FORT AT SUNSET



A BEAUTIFUL JAIN TEMPLE INSIDE JAISLAMER FORT

The majestic PATWON KI HAVELI with its five interconnected mansions and frescoes, and the quaint Nathmal Ki Haveli and Salim Singh Ki Haveli.

At GADISAR LAKE, I watched migratory birds glide across tranquil waters as the fort reflected in the distance—a perfect postcard moment. But the true magic lay ahead.



GADISAR LAKE



PATWON KI HAVELI

SAM DESERT AND THRILL OF THE INDO-PAK BORDER

The Sam Sand Dunes, about 40 km from Jaisalmer, were the heart of my desert romance. As the sun dipped, I mounted a camel for a safari across undulating golden waves. The silence was profound, broken only by the soft padding of camel feet and the occasional folk song of my guide. That night, under a star-studded sky, I enjoyed a cultural performance with fire dancers, traditional music, and a lavish Rajasthani dinner in a desert camp. The dunes at sunrise painted the sky in hues of rose and saffron—pure poetry in motion. A short drive took me to the Indo-Pak Border near Tanot Mata Temple and Longewala War Memorial . Standing at the border fence, watching the ceremonial Beating Retreat, was profoundly moving—a reminder of history, sacrifice, and the pride of Indian soldiers. The vast, empty expanse evoked deep respect and a sense of vastness.



SAND DUNES



PAKISTANI TANK



DESERT JEEP SAFARI



INDO PAK BORDER

JODHPUR: THE BLUE JEWEL OF MARWAR

Next came Jodhpur, the Blue City, where every house seems painted in indigo to keep cool and ward off insects. Dominating the skyline is the formidable Mehrangarh Fort, perched on a rocky hill. Its museums house royal palanquins, armor, and miniature paintings, while the cannon-scarred walls narrate tales of bravery. The panoramic view of the blue-washed old city below is breathtaking.

The opulent Umaid Bhawan Palace (one of the world's largest private residences) blends Art Deco with Rajput style. Strolling through the bustling Sardar Market near the Clock Tower, I savored kachoris and mawa kachori, soaking in the vibrant chaos of spices, textiles, and handicrafts.



UMAID BHAWAN PALACE



MEHRANGARH FORT



SHEESH MAHAL



MEHRANGARH FORT



CLOCK TOWER JODHPUR

UDAIPUR: THE CITY OF LAKES AND ETERNAL ROMANCE

The road south led to Udaipur, the most romantic of all—the Venice of the East. Lake Pichola shimmered like a mirror, with the iconic City Palace complex sprawling along its banks. Boat rides at dusk past the Lake Palace (now a luxury hotel) felt straight out of a fairy tale. I explored the crystal galleries, courtyards, and museums within the palace, then wandered the lush gardens of Sahelion Ki Bari.

A drive to the Monsoon Palace (Sajjangarh) offered sweeping views of the city and lakes, especially magical during golden hour. Udaipur's sunsets over the water, accompanied by classical music performances, healed the soul.

City Palace, Udaipur is a magnificent palace complex built on the banks of Lake Pichola, constructed over nearly 400 years starting in 1559 by Maharana Udai Singh II, the founder of Udaipur. It showcases a stunning blend of Rajasthani and Mughal architectural styles, featuring intricate mirror work, courtyards, towers, and domes. Today it houses a museum with royal artifacts, and offers breathtaking views of the lake and surrounding Aravalli hills.

Gangaur Ghat, located near City Palace on the banks of Lake Pichola, transforms into a magical spot at night with the lake reflecting shimmering lights from the surrounding palaces and buildings. It's a peaceful place for an evening stroll, offering cool breezes and a romantic, serene atmosphere away from the daytime crowds.



CITY PALACE UDAIPUR



CITY PALACE UDAIPUR



GANGAUR GHAT

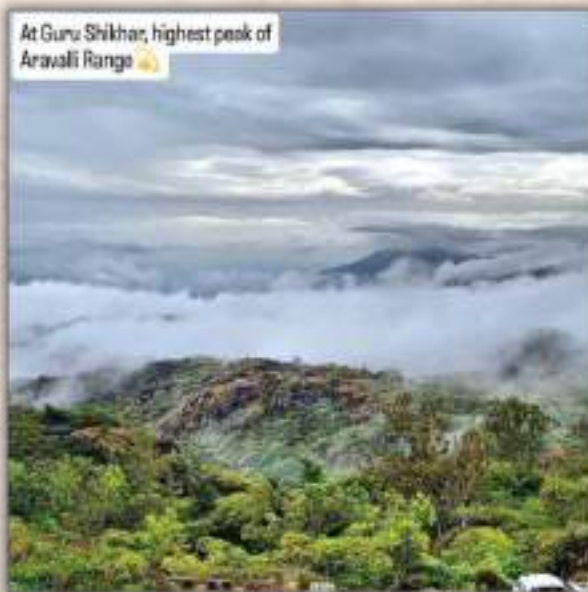


CITY PALACE UDAIPUR

MOUNT ABU: ONLY HILL STATION OF RAJASTHAN

Mount Abu is Rajasthan's only hill station, nestled in the Aravalli Range at an altitude of around 1,220 meters. Known for its cool climate, lush greenery, and scenic beauty, it offers a refreshing escape from the desert heat of Rajasthan. Nakki Lake is the heart of Mount Abu, a serene artificial lake surrounded by hills, popular for boating and evening walks. According to legend, Nakki Lake was dug out by gods using their nails, giving it its name. Guru Shikhar is the highest peak in the Aravalli Range, standing at about 1,722 meters above sea level. It houses the Guru Dattatreya Temple and offers panoramic, breathtaking views of the surrounding landscape.

The Dilwara Jain Temples are a group of exquisitely carved marble temples dating back to the 11th-13th centuries. They are renowned worldwide for their extraordinarily intricate marble carvings and detailed ceiling designs. Mount Abu also attracts nature lovers, honeymooners, and pilgrims, making it a versatile tourist destination. Overall, Mount Abu beautifully combines natural beauty, spirituality, and architectural marvels into one memorable experience.



GURU SHIKHAR PEAK



NAKKI LAKE

CHITTORGARH: FORTRESS OF VALOR AND SACRIFICE

Chittorgarh Fort, a UNESCO site and symbol of Rajput honor, stands as a towering testament to resilience. The climb revealed the massive fort complex with its victory tower—Vijay Stambh—and the elegant Kirti Stambh. Legends of Rani Padmini's jauhar and the heroism of Maharana Pratap echoed through the ruins of palaces, temples, and reservoirs. The scale and history here are humbling; one feels the weight of centuries of defiance and pride.



VIJAY STAMBHA



RESERVOIR INSIDE CHITTORGARH



RUINS OF THE FORT

PUSHKAR: DIVINE SERENITY BY THE SACRED LAKE

My journey culminated in the holy town of Pushkar, nestled around its serene lake. Dedicated to Lord Brahma, the only major temple to the creator god in the world draws pilgrims and travelers alike. The ghats bustling with rituals, flower offerings, and chants created an atmosphere of profound peace. The annual Pushkar Camel Fair transforms the desert into a colorful carnival of trading, folk performances, and cultural exchange. Luckily I visited during

the period of camel fair and could become a witness of its grandeur for the rest of life. I spent quiet mornings walking around the lake, shopping for silver jewelry and tie-dye fabrics, and reflecting on the journey.



BRAHMA TEMPLE PUSHKAR



PUSHKAR LAKE AT NIGHT

REFLECTIONS ON RAJASTHAN

Rajasthan enchanted me with its contrasts: the fiery spirit of its forts and warriors, the soft romance of its lakes and palaces, the raw beauty of its deserts, and the deep spirituality woven into daily life. The warmth of its people, the explosion of colors in turbans and lehengas, the soul-stirring folk music, and the unforgettable flavors of dal baati churma, gatte ki sabzi, and endless sweets remain etched in my memory.



This land doesn't just show you sights—it awakens something ancient and royal within. Whether you seek history, adventure, romance, or spirituality, Rajasthan welcomes you with open arms and leaves you forever changed.

Finally in one word : Mharo Rajasthan!

-Soham Acharya(Batch 2023-24)

OPERATION PAUCI-MAUCI: THE FISH THAT FLEW HOME



People often ask me, "Mountains or beaches?" My answer comes without even a second of thinking.

Beaches. Always beaches.

India is blessed with almost everything nature can offer, majestic mountains, dense forests, endless deserts, beautiful rivers, historical monuments, and breathtaking coastlines. While many people lose their hearts in the Himalayas, mine was stolen long ago by the sea.

There is something magical about sitting alone on a beach. The endless waves seem to quietly collect every worry from my mind and carry it far away into the ocean. I don't know where they take my stress, but thankfully they never return it.

There is another practical reason behind my love for beaches.

My mother and my wife both have a unique talent, they start feeling nauseous the moment someone merely mentions a mountain trip. They don't even have to reach the hills. Planning the trip itself is enough! Last year, while discussing a vacation to the mountains, both of them complained of motion sickness before we had even booked the tickets. Since then, our family travel committee has unofficially banned mountains

So, beaches it is. I have visited Digha 27 times. People often ask, "Isn't there nothing new to see there?"

Exactly.

Every time I go, I happily confirm that there is still nothing new to see, and yet I keep returning. The sea never gets old.

My love affair with the ocean actually began when I was just six years old. My father took me to Puri for the first time. Standing on the beach, I stared at the horizon and honestly couldn't understand where the sea ended and the sky began. For several minutes, I genuinely believed the giant blue thing in front of me was the sky lying on the ground. That memory still makes me smile.

This February, we visited the Andaman Islands.

The beaches there looked almost unreal. Crystal-clear blue water. Soft white-golden sand. Colourful fish swimming around your feet. Corals visible with the naked eye. Every island looked like someone's desktop wallpaper had suddenly become real.

Island hopping became our daily routine. While the rest of us admired nature, my son had a completely different mission.

He wasn't looking at the sea.

He was looking inside the sea.

Soon he discovered tiny colourful crabs running across the sand. Somewhere on the beach he found an empty plastic bottle, carefully collected a few tiny crabs, and proudly announced that he had adopted new pets.

From that moment onwards, the bottle travelled everywhere with us.

Breakfast? Bottle beside him.

Boat ride? Bottle beside him.

Sleeping? Bottle beside him.

The crabs had unknowingly become full-time tourists.

Then disaster struck.

He saw dozens of beautiful little fish swimming near the shore.

The crabs instantly became old news.

"Dad," he declared, "I need a fish."

Need.

Not want. Need.

Thus began one of the most difficult wildlife rescue missions in history. Armed with nothing more than his cap using as fish-net, he spent nearly three hours trying to catch a fish.

The score remained:

Fish: 247

My Son: 0

The fish clearly had excellent reflexes and probably laughed at him underwater.

Eventually, his eyes filled with tears. As every responsible father knows, this was no longer a holiday. This had become a national emergency. I rolled up my trousers and entered the battlefield. Operation Fish Catch officially began. The enemy was tiny. The battlefield was slippery. Witnesses included several amused tourists. After countless failed attempts, dramatic dives, and enough splashing to entertain half the beach.....

Victory!

A tiny fish was finally caught. You would have thought we had discovered a new continent.

My son immediately released every crab back into the sea with full honours. "Your service is appreciated," he seemed to say. The bottle was washed thoroughly, filled with fresh seawater and clean sand, and converted into a luxury fish apartment. Soon he found a slightly larger plastic container with a handle. The fish was upgraded to a deluxe bungalow.



Then came the naming ceremony. "Ladies and gentlemen," my son proudly announced, "Meet Pauci-Mauci."

Just like that, our family had gained one more member.

Unfortunately, Pauci-Mauci had no idea what was coming next.

The journey home.

Our driver looked at the container and laughed.

"Sir, airport security will never allow this." Other tourists agreed. Even my own family suggested, "Let's release him into the sea before going to the airport." It sounded sensible.

But somewhere inside me another voice whispered, "At least try once."

And so began Operation Fly the Fish.

Every security checkpoint felt like crossing an international border with a secret passenger.

On the ferry...

Nobody stopped us.

On the road...

Nobody noticed.

Hope slowly returned.

Finally we reached Sri Vijaya Puram Airport. This was the final boss level. My son carefully placed Pauci-Mauci inside my backpack. himself crossed security within minutes. Then he stood on the other side, watching me nervously. His eyes asked only one question. "Will Pauci-Mauci make it?"

My bag entered the X-ray scanner.

It came out.

Stopped.

My heart stopped with it.

A security officer looked at me.

"Sir, please open your bag."

This was it.

Game over.

Slowly I opened the backpack.

My family had already accepted defeat.

I mentally prepared myself to say goodbye to our brave little traveller.

The officer pointed seriously.

"What's this?"

I froze.

Then he pointed - not at the fish.

At my blood pressure machine.

"And this?"

My stethoscope.

I almost burst into laughter.

Being a doctor had unexpectedly saved the day.

I demonstrated both instruments.

He nodded politely.

"Okay, Sir."

Bag closed.

No one even asked about the tiny fish quietly sitting inside.

Mission successful.

Pauci-Mauci had officially become what was probably one of the very few little fish to complete an airplane journey from the Andaman Islands to Kolkata.

Back home, preparations began immediately.

A proper aquarium.

Fish food.

Water heater.

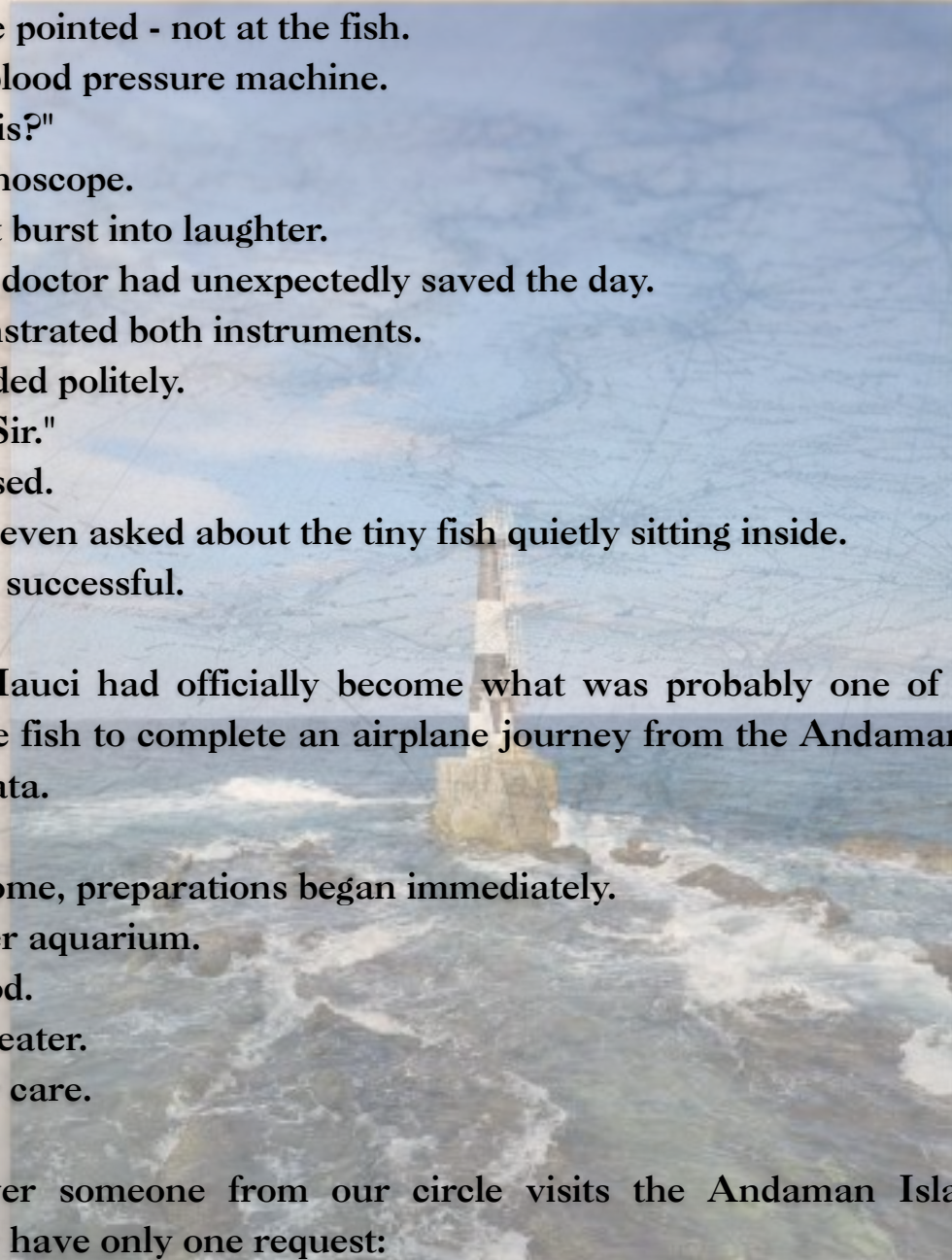
Regular care.

Whenever someone from our circle visits the Andaman Islands, we jokingly have only one request:

"Please don't forget to bring at least one litre of seawater."

Not for us.

For Pauci-Mauci.



Today, our tiny Andaman traveller is happily living with us.
Sometimes I sit beside the aquarium and smile.
We travelled to see the sea.

Instead...

The sea came home with us.

And every time Pauci-Mauci swims happily around his little world, I'm reminded that the best souvenirs are never bought from gift shops.

Sometimes...

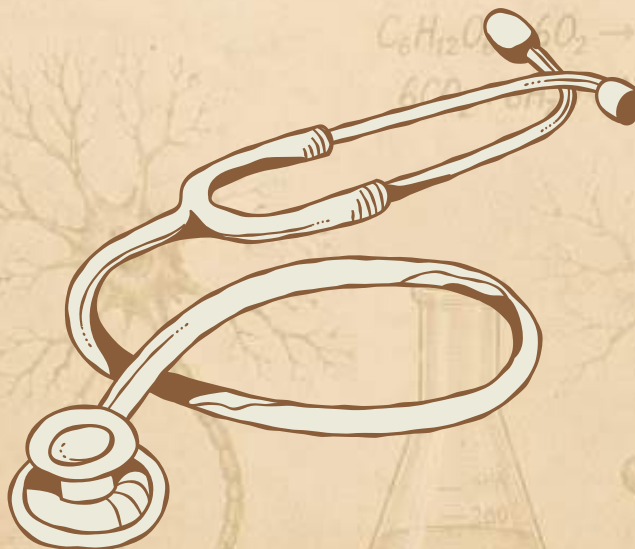
They swim into your life.

P.S. Airport security successfully inspected my blood pressure machine, my stethoscope, and probably my heartbeat—but somehow thankfully completely ignore and allow the smallest passenger on the flight!



**-Dr. Pramit Goswami,
Assistant Professor,
Department of Community Medicine,
Burdwan Medical College**

THE REMEDY RECORDS



BURDWAN MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL

Department of Ophthalmology

A Landmark Journey in Glaucoma Care

FIRST AADI SURGERY AT BMCH

Aurolab Aqueous Drainage Implant (AADI)-Neovascular Glaucoma Case

June 2026

"From Blindness to Breakthrough — A Young Patient's Story of Hope"

FIRST NON-VALVED GLAUCOMA DRAINAGE DEVICE (AADI) SURGERY
— Proud Moment for Eye Care —
BURDWAN MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL



A Historic Milestone in Glaucoma Care

First Non-Valved Glaucoma Drainage Device (AADI) Implantation performed successfully at Burdwan Medical College and Hospital.

TEAMWORK | SKILL | COMPASSION | INNOVATION
Setting a New Benchmark in Eye Care for a Better Tomorrow

GLAUCOMA SHUNT AADI
AUROLAB

DEPARTMENT OF OPHTHALMOLOGY
BURDWAN MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL
Excellence in Eye Care

The Ophthalmology Unit / Team — BMCH

21-Year-Old
Male Electrician

First AADI Surgery
at BMCH

Neovascular
Glaucoma

Successful Outcome

Understanding the Disease- What is Glaucoma?

Before diving into this case, let's understand the condition at the heart of it all.

Term	Plain English Explanation
• The Eye	Think of your eye like a sink. Fluid is constantly produced inside and must drain out.
• In Glaucoma	The drainage channel gets blocked. Fluid builds up, pressure rises, and this pressure damages the optic nerve.
• Optic Nerve	Once the optic nerve is damaged, vision is lost — and this loss is permanent.
• Silent Danger	Most types of glaucoma cause NO pain and NO early warning signs.

What Makes Neovascular Glaucoma (NVG) Especially Dangerous?

- NVG is caused by abnormal new blood vessels growing over the drainage angle of the eye.
- These new vessels block the drain, causing extremely high eye pressure — sometimes 3–4× the normal level.
- The underlying cause is lack of oxygen to the retina (the camera film at the back of the eye), which sends distress signals that trigger these harmful new vessels.
- NVG is one of the hardest forms of glaucoma to treat — medicines alone rarely work, and surgery carries higher risks.
- In this patient, the root cause was a Central Retinal Vein Occlusion (CRVO) — a blood clot in the main vein of the retina.

Meet the Patient- Who came to Us?

Patient Detail	Information
Age	21 years
Gender	Male
Occupation	Electrician
Chief Complaints	Sudden, severe pain in the right eye with near-total loss of vision — for 3 days
Previous Health	No known prior illness (previously healthy)
Social Background	Limited financial resources; family unable to afford refer to a higher center

What the Patient Felt — Symptoms on Arrival

- Intense eye pain — unlike anything he had experienced before
- Redness of the eye — visible even to bystanders
- Severe blurring of vision — almost no useful vision remaining in the right eye
- No history of diabetes, hypertension, or previous eye disease
- Fellow (left) eye was completely normal

■ Despite being only 21 years old and previously healthy, this young man was on the verge of permanent blindness.

What the Doctors Found- Examination Findings

Eye Examination on Admission

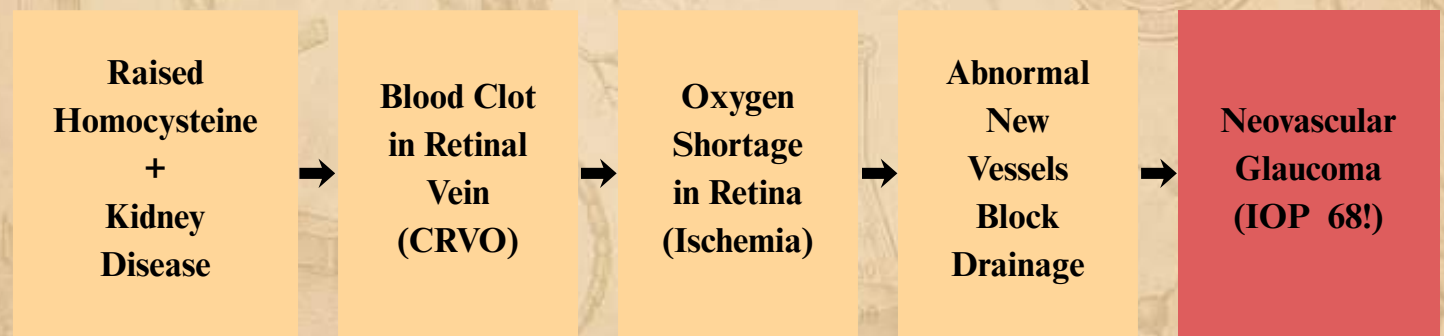
Finding	What it Means in Plain Language
Visual Acuity (Right Eye)	Perception of light only — nearly blind
Intraocular Pressure (IOP)	68 mmHg (Normal: 10–21 mmHg — nearly 3× the upper limit!)
Cornea	Marked cloudiness (edema) — the front of the eye was hazy
Iris	360° neovascularization — abnormal new blood vessels covering the entire Iris.
Anterior Chamber Angle	Angle closure- the drainage channel was completely blocked
Posterior Segment	Not visible due to media haze (the cloudiness blocked the view)
Fellow Eye (Left)	Completely normal — no abnormalities

Digging Deeper- Investigations to Find the Root Cause

When a 21-year-old presents with such severe eye disease, the question every doctor asks is: WHY? An extensive workup was done to find the hidden cause.

Investigations	Results & Significance
Renal Function Tests	ELEVATED — kidney function was impaired
Serum Homocysteine	RAISED — a marker linked to abnormal clotting in blood vessels
USG KUB (Kidneys)	Kidney stones (nephrolithiasis) detected
B-Scan Ultrasonography (Right Eye)	Posterior vitreous detachment detected (the gel inside the eye had separated from the retina)
Fundus Examination (after IOP reduced)	Ischemic Central Retinal Vein Occlusion (CRVO) confirmed — a blood clot in the main vessel.
OCT Anterior Segment	Confirmed angle closure — drainage channel completely blocked by new vessels.

The Root Cause- Connecting the Dots



The Treatment Journey - Step by Step Timeline

This patient's care involved multiple steps over several weeks. Each step was carefully planned to stabilise the eye before the final surgery.

Day 1

Admission & Emergency Treatment

- Patient admitted with IOP of 68 mmHg and near-total blindness
- Intensive anti-glaucoma eye drops started immediately to bring pressure down
- Topical anti-inflammatory drops and cycloplegics (to relax the eye muscles) added
- Systemic investigations ordered to find the root cause

Day 3

Improvement & Fundus Visibility

- IOP reduced to 26 mmHg — a significant improvement with medicines
- Corneal clarity improved — the front of the eye became less cloudy
- Fundus examination now possible — retina could finally be visualised
- Ischemic CRVO confirmed as the underlying cause

Day 4

Anti-VEGF Injection

- Intravitreal Anti-VEGF injection administered inside the eye
- Anti-VEGF = Anti-Vascular Endothelial Growth Factor
- Purpose: To dry up and shrink the abnormal new blood vessels
- This helps reduce IOP and makes the drainage angle safer for surgery

Day 5-14

Laser Treatment (PRP)

- Pan-Retinal Photocoagulation (PRP) performed over 3 sessions
- PRP = Laser treatment to the entire retina
- Purpose: Destroy oxygen-starved retinal tissue to stop the signal driving new vessel growth
- This treats the root cause at the retinal level

Post PRP

IOP Rises Again — Surgery Needed

- Despite all medical treatment, patient developed severe eye pain again
- IOP rose to 46 mmHg — medicines were no longer sufficient
- Decision made: surgical drainage is the only way to save this eye
- AADI implant surgery planned

AADI Surgery — The Historic Moment

- Aurolab Aqueous Drainage Implant (AADI) successfully implanted
- First such surgery ever performed at Burdwan Medical College & Hospital
- No intraoperative complications — procedure completed smoothly
- Surgery performed by Unit I Ophthalmology Team under Prof. Dr. Somnath Mukherjee

Recovery & Follow-Up

- IOP well-controlled after surgery
- AADI implant in stable, correct position
- No post-operative complications observed
- Patient under regular monitoring and recovering well

The Surgery- What is AADI and How Does It Work?

What is the AADI? (In Simple Words)

The Aurolab Aqueous Drainage Implant (AADI) is a tiny device smaller than a coin that acts like a new drainage pipe for the eye. When the eye's natural drainage is blocked, this implant creates a new pathway for the excess fluid to escape, reducing the pressure.

Feature	Details
Full name	Aurolab Aqueous Drainage Implant
Also known as	AADI / Glaucoma Shunt / Glaucoma Tube Implant
Type	Non-Valved (no one-way valve — fluid flows freely)
Manufacturer	Aurolab, India (Madurai, Tamil Nadu)
Material	Medical-grade silicone — safe, inert, stays in the eye permanently
Size	Plate: 350 mm ² surface area Tube: tiny flexible silicone tube
Purpose	Create a new route for fluid to drain out of the eye, bypassing the blocked natural channel.
CE Marked	Yes (0197) — internationally certified for safety

How Does It Work?- The Analogy

- Normal Eye Fluid drains naturally through the trabecular meshwork(drainage angle)

- Glaucoma Eye Drainage blocked by abnormal vessels. Pressure builds up dangerously.

- After AADI Surgery A new tube is placed. Fluid flows through the tube to a plate under the eyelid, then absorbs safely.

The Surgery- Step- by-Step Procedure

The AADI implantation surgery was performed under local anaesthesia in the operating theatre. Here is how the procedure was done, in simple terms:

Step 1

Preparation & Anaesthesia

The patient is made comfortable. Local anaesthetic is injected around the eye to numb it completely. The surgical area is cleaned and draped. A speculum (eyelid holder) keeps the eye open during surgery.

Step 2

Placing the AADI Plate

The surgeon makes a tiny opening in the conjunctiva (the thin layer covering the white of the eye). The silicone plate of the AADI is carefully positioned and stitched securely under the conjunctiva, behind the upper eyelid where it stays hidden and safe permanently.

Step 3

Inserting the Tube

A very fine tube (thinner than a matchstick) attached to the plate is carefully guided into the front chamber of the eye (the space between the cornea and the iris). This tube will act as the new drain for excess fluid.

Step 4

Tube Ligation (Temporary Tie)

Since AADI is non-valved (no inbuilt valve), the tube is temporarily tied with a special absorbable stitch to prevent too much fluid from draining too quickly in the early post-op period. This stitch dissolves on its own over weeks.

Step 5

Covering the Tube

A small patch (from donor tissue or biological material) is placed over the tube where it enters the eye to protect the overlying conjunctiva and prevent erosion.

Step 6

Closing the Wound

The conjunctiva is carefully sutured closed. Eye drops and ointment are applied. The eye is padded and the surgery is complete.

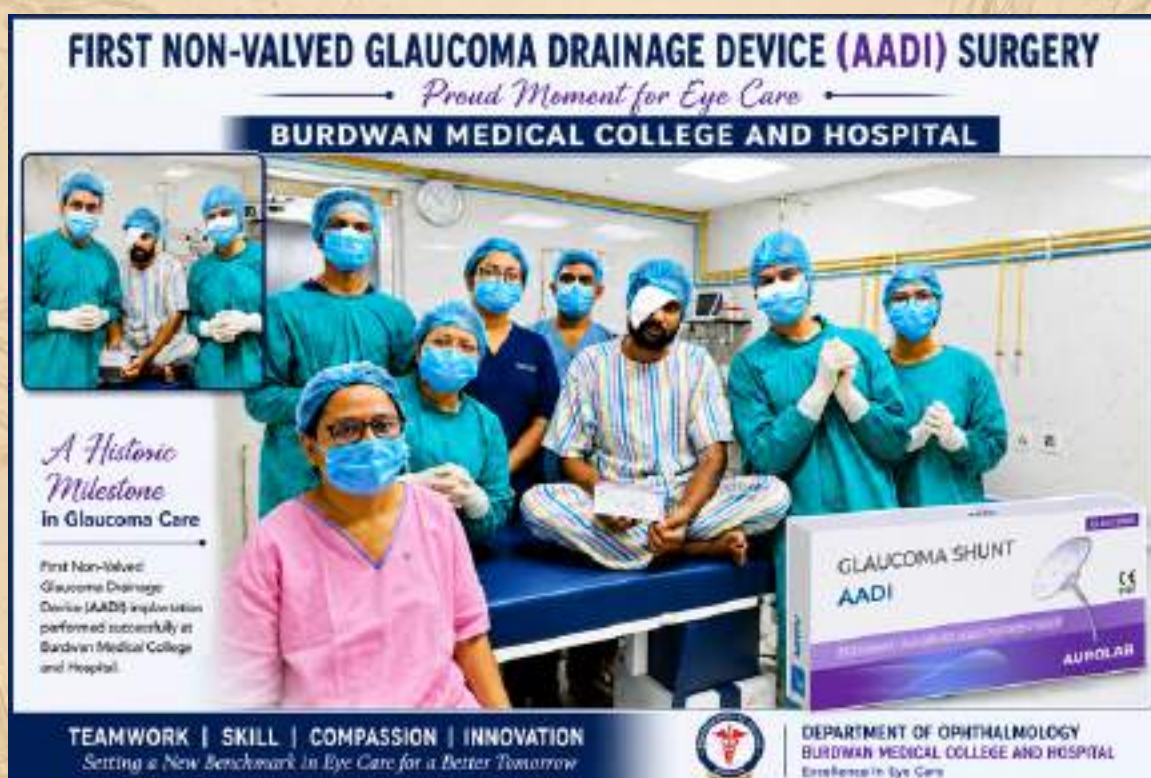


Operative photographs — AADI implantation surgery in progress at Burdwan Medical College & Hospital (June 16, 2026)

The Team Behind the Milestone

This historic procedure was a team effort. Every member played a vital role in ensuring the safety and success of this surgery.

Name	Designation	Role
Prof. (Dr.) Somnath Mukherjee	Head of Department, Ophthalmology	Team Lead & Consultant Surgeon
Dr. Indrajit Sarkar	Assistant Professor, Ophthalmology	Surgeon
Dr. Anamika Paul	Senior Resident & Glaucoma Fellow	Surgical Team & Glaucoma specialist
Unit I Ophthalmology Team	Residents, Nurses & Support Staff	Surgical Assistance & Patient Care



*The Ophthalmology Unit I Team of BMCH with the patient following the successful AADI implantation surgery
June 2026*

Inset: The AADI Device Used

The device used was the **Aurolab Aqueous Drainage Implant (AADI)** — 350 mm² plate, manufactured by Aurolab (India), which is CE certified and designed specifically for complex glaucoma cases. It is non-valved, meaning fluid drains passively without a one-way valve, offering more predictable long-term pressure control.

Why This Mattered — Compassion & Accessibility

Medical decisions are not just clinical — they are deeply human. Here is why performing this surgery at BMCH was the right choice:

- **Financial Constraint**

The patient's family lacked the resources to seek treatment at a private hospital or specialised tertiary centre. Referral would have meant significant additional costs for transport, accommodation, and higher procedure fees.

- **Time-Critical Situation**

Glaucoma damage is permanent. Every additional day of high IOP (46 mmHg) meant more optic nerve fibres dying. Delay for referral could have meant irreversible additional vision loss.

- **Institutional Capability**

The Department of Ophthalmology at BMCH had the trained team, the expertise, and the necessary equipment to perform this surgery safely. The only barrier was precedent — and that was broken on June 16, 2026.

- **Patient-Centred Care**

Keeping the patient close to home allowed his family to be present and support him during recovery. Familiar surroundings and trusted doctors made a genuine difference to his wellbeing.

Outcome & What This Means for the Future

Post-Operative Outcome

Parameter	Status
IOP Control	Well-controlled (within normal range) after surgery
AADI Position	Implant in correct, stable position — confirmed on examination
Complications	None — no post-operative complications observed
Patient Status	Recovering well, under regular follow-up monitoring
Vision	Being monitored — further recovery depends on the extent of prior optic nerve damage.

Why This is a Milestone for BMCH

- **First AADI implantation** ever performed at Burdwan Medical College & Hospital
- Establishes BMCH's **capability to manage complex glaucoma** cases that previously required referral
- Opens doors for future patients with **refractory glaucoma** to receive advanced care at a state government hospital
- Demonstrates the power of **multidisciplinary teamwork** — ophthalmology, nephrology, and systemic medicine working together
- **Recognised in the local press** — a testament to the hospital's growing reputation in specialised care
- **Aurolab's AADI device** (Made in India) enables world-class glaucoma care at an affordable cost — a success for Make in India in healthcare

68 mmHg Peak IOP
on arrival (Normal:
10-21)

21 Years Age of
patient
— youngest AADI
case at BMCH

3 Weeks From
admission to
successful surgery

1st First ever AADI
at BMCH — June
16, 2026

জটিল অস্ত্রোপচারে নতুন নজির গড়ল বর্ধমান মেডিক্যাল

নিম্নস্ব স্ববাবদাতা
বর্ধমান

ডান চোখে তীব্র যন্ত্রণা, বৃষ্টিশক্তি হারানোর মতো পরিস্থিতিতে হাসপাতালে ভর্তি হন বছর একুশের এক তরুণ। তাঁর চোখে সফল ভাবে 'অরোল্যাব অ্যাকুয়াস ড্রেনেজ ইমপ্লান্ট' (এএডিআই) প্রতিস্থাপন অস্ত্রোপচার করে নতুন নজির গড়ল বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। চক্ষুরোগ বিভাগের চিকিৎসকদের দাবি, হাসপাতালে প্রথম বার এই ব্রকমের অস্ত্রোপচার হল। উন্নত গ্লুকোমা চিকিৎসার ক্ষেত্রে এটি হাসপাতালের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, ভর্তির পরে পরীক্ষা করে দেখা যায়, তাঁর ডান চোখের অভ্যন্তরীণ

চাপ আভ্যন্তরীণ তুলনায় অনেক বেশি। কনিয়া ফুলে গিয়েছে। লক্ষ্য করা যায়, চোখের সামনের অংশে অস্বাভাবিক রক্তনালীর বৃদ্ধিও হয়েছে। চিকিৎসকেরা রোগটি 'নিওভাসকুলার গ্লুকোমা'-র 'আইসল-ক্রোজার' বলে নির্ণয় করেন। চোখের ভিতরে নতুন রক্তনালী তৈরি হয়ে বর্ধন তরল নিষ্কাশনের পথ বা 'আউসেল' বন্ধ করে দেয়, তখন এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। প্রথমে ওষুধের মাধ্যমে চোখের চাপ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়। সঙ্গে রোগের মূল কারণ অনুসন্ধানে একাধিক পরীক্ষা হয়।

কয়েক দিনের চিকিৎসার পরে কনিয়ার অবস্থা কিছুটা উন্নত হলে চোখের ভিতরের অংশ পরীক্ষা করে চিকিৎসকেরা দেখেন, রোগী 'ইন্টেনসিভ সিআরডিও'-এ আক্রান্ত। অর্থাৎ চোখের রেটিনা থেকে রক্ত

বহনকারী প্রধান শিরাতিকে রক্ত জনটি বেঁধে রক্ত চলাচল কমে গিয়ে, অগ্নিভেদের অভাবে রেটিনার শিরো-উপশিরার ক্ষতি হচ্ছে। চিকিৎসকদের মতে, এই সমস্যার জেরেই জটিল গ্লুকোমা তৈরি হয়েছে। চিকিৎসা চলেও তরুণের চোখের চাপ আবার বেড়ে যায় এবং তীব্র ব্যথাও ফিরে আসে। ওষুধে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসায় অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকেরা। রোগীর আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে তাঁকে অন্যত্র না পাঠিয়ে বর্ধমান মেডিক্যালসেই এএডিআই প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। চক্ষুরোগ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সোমনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে চিকিৎসকদের সল অস্ত্রোপচারটি করেন। বলে ছিলেন সহকারী অধ্যাপক ইন্দ্রজিৎ সরকার, মিনিমাল ট্রেসিডেন্ট ও গ্লুকোমা কেলো অনামিকা পাল-সহ অন্য চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। হাসপাতাল সূত্রে স্বরূপ, অস্ত্রোপচারের সময় কোনও জটিলতা দেখা যায়নি। বর্তমানে রোগীর চোখের চাপ নিয়ন্ত্রিত আছে। প্রতিস্থাপিত ইমপ্লান্টও সঠিক অবস্থানে রয়েছে। চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে তাঁকে। চিকিৎসকদের দাবি, এই সাক্ষ্যে জটিল গ্লুকোমার আক্রান্ত রোগীদের উন্নত চিকিৎসা পরিবেশা ফেওয়ার নতুন সম্ভাবনা তৈরি হল।

Local Bengali newspaper coverage of this landmark surgery at Burdwan Medical College & Hospital

A New Chapter in Eye Care

"The successful completion of the first AADI implantation at Burdwan Medical College & Hospital not only transformed the course of a young patient's vision-threatening disease but also marked the beginning of a new chapter in advanced glaucoma care at our institution."

Key Takeaways for Everyone

- **Government hospitals can deliver world-class care** — this case proves it
- **Glaucoma is treatable** — but only if caught and treated in time. Regular eye check-ups are essential
- **Systemic diseases affect the eye** — conditions like kidney disease and homocysteine abnormalities can lead to blindness
- **Don't ignore eye pain** — sudden pain with blurred vision is an emergency. Seek help immediately
- **Surgery is not always the first step** — medicines and laser are tried first; surgery is a last resort
- **Patient care goes beyond medicine** — social, financial, and emotional aspects all matter in treatment decisions

TEAMWORK | SKILL | COMPASSION | INNOVATION
Setting a New Benchmark in Eye Care for a Better Tomorrow

*Department of Ophthalmology, Burdwan Medical College & Hospital | First AADI Implantation-
June 16, 2026 | Excellence in Eye Care*

Case Presentation

IVF Twin Pregnancy

(IVF যমজ গর্ভাবস্থা)

বিভাগ: Obstetrics & Gynaecology | Unit II
BMCH, Burdwan, West Bengal

পরিচালনায়:

Prof. Dr. Malay Sarkar (Unit In-charge)
Dr. Debobroto Roy • Dr. Krishna Pada Das

রোগিণীর পরিচয় (Demographic Details)

বয়স (Age):	৪১ বছর
লিঙ্গ (Sex):	মহিলা (Female)
হাসপাতাল:	BMC&H, Burdwan
বিভাগ:	Obstetrics & Gynaecology
Unit:	Unit II
ভর্তির তারিখ:	১১/০৭/২০২০
ভর্তির সময়:	রাত ৮:৫৯ মিনিট

রোগিণীর নাম গোপনীয়তার স্বার্থে উল্লেখ করা হয়নি।

প্রধান অভিযোগ (Chief Complaints)



Bleeding Per Vagina

যোনিপথে রক্তপাত

রোগিণী হাসপাতালে আসার আগেই যোনিপথে রক্তপাত অনুভব করেছিলেন। এটি IVF গর্ভাবস্থায় একটি গুরুতর লক্ষণ, যা তৎক্ষণিক চিকিৎসার প্রয়োজন নির্দেশ করে।

Abdominal Pain

পেটে ব্যথা

পেটে তীব্র ব্যথা ছিল, যা গর্ভস্থ সমস্যার ইঙ্গিত দিচ্ছিল। এই দুটি লক্ষণ একসঙ্গে দেখা দেওয়ায় অবিলম্বে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

পূর্ব ইতিহাস ও প্রসব ইতিহাস (History)

IVF (In Vitro Fertilization) কী?

এটি একটি কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি, যেখানে শরীরের বাইরে ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলন ঘটিয়ে জ্রণ (Embryo) তৈরি করা হয় এবং সেই জ্রণ জরায়ুতে স্থাপন করা হয়। যেসব দম্পতির স্বাভাবিকভাবে সন্তান হয় না, তাঁদের জন্য এটি একটি আশীর্বাদস্বরূপ।

১০/০৩/২০২০ LMP (শেষ মাসিক) - রোগিণীর শেষ স্বাভাবিক মাসিকের তারিখ।

২৪/০৩/২০২০ Embryo Transfer - জ্রণ জরায়ুতে স্থাপন করা হয়। IVF-এর দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় এটি সফল হয়।

১১/০৭/২০২০ হাসপাতালে ভর্তি - রক্তপাত ও পেটে ব্যথা নিয়ে BMCH-এ ভর্তি হন।



গুরুত্বপূর্ণ : এর আগে ১ম IVF প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। এটি ছিল ২য় এবং সফল IVF প্রচেষ্টা।

ভর্তির সময় USG পরীক্ষার ফলাফল (USG Findings on Admission)

USG (Ultrasonography): শব্দতরঙ্গের সাহায্যে গর্ভের ভিতরের ছবি দেখার একটি নিরাপদ ও ব্যথাহীন পরীক্ষা।

1

প্রথম জন্মের হৃদস্পন্দন — হৃদস্পন্দন অনুপস্থিত
প্রথম জন্মের (First Twin) কোনো হৃদস্পন্দন (Cardiac Activity) পাওয়া যায়নি। এর অর্থ, প্রথম জন্মটি আর জীবিত ছিল না।

2

Cervical Os (জরায়ুমুখ) — খোলা (Open)
জরায়ুমুখ খোলা ছিল, যা প্রসব শুরু হওয়ার ইঙ্গিত দেয়। এটি একটি জরুরি পরিস্থিতির লক্ষণ।

3

দ্বিতীয় জন্মের হৃদস্পন্দন — স্বাভাবিক
দ্বিতীয় জন্ম (Second Twin) সম্পূর্ণ জীবিত ও সুস্থ ছিল। তার হৃদস্পন্দন স্বাভাবিক পাওয়া যায়, যা আশার আলো জাগায়।

প্রথম জন্মের নিষ্ক্রমণ ও প্রাথমিক ব্যবস্থাপনা (১২/০৭/২০২৩)

১২/০৭/২০২৩, সন্ধ্যায়:

প্রথম জন্মটি প্রায় ১২৫ গ্রাম ওজনের product of conception হিসেবে কোনো হৃদস্পন্দন (Heartbeat) ছাড়াই বেরিয়ে আসে। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা হলেও, চিকিৎসকদের প্রধান লক্ষ্য ছিল দ্বিতীয় শিশুটিকে নিরাপদ রাখা।

1

Placenta জরায়ুতে রাখা হয়

প্রথম জন্মের Placenta (গর্ভফুল) জরায়ুর ভেতরেই রেখে দেওয়া হয়। কারণ, এটি বের করলে দ্বিতীয় শিশুর জন্য ঝুঁকি তৈরি হতে পারত।

2

Umbilical Cord বেঁধে দেওয়া

নাভিরজু (Umbilical Cord) সাবধানে বেঁধে কেটে দেওয়া হয়, যাতে কোনো সংক্রমণ না হয়।

3

পুনরায় USG পরীক্ষা

পুনরায় USG করে নিশ্চিত করা হয় যে দ্বিতীয় জন্ম ও তার Placenta সম্পূর্ণ অক্ষত রয়েছে।

4

Placenta-র অবস্থান

প্রথম জন্মের Placenta জরায়ুর সামনের দেয়ালে (Anterior Wall) নিচের দিকে (Low-Lying) ছিল। তাই ভবিষ্যতের জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়।

সংরক্ষণশীল চিকিৎসা পদ্ধতি (Conservative Management)

Conservative Management কী? অস্ত্রোপচার না করে ওষুধ এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে রোগিণীকে নিরাপদ রাখা, যাতে দ্বিতীয় শিশুটি স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে।



KGW (Antenatal Ward)-এ ভর্তি রাখা

সমগ্র গর্ভাবস্থাজুড়ে রোগিণীকে Antenatal Ward-এ রেখে ২৪ ঘণ্টা নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়।



নিয়মিত Routine Investigations

নির্ধারিত সময়ে রক্ত পরীক্ষা, প্রস্রাব পরীক্ষা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ল্যাবরেটরি পরীক্ষা করা হয়।



নিয়মিত USG পর্যবেক্ষণ

শিশুর বৃদ্ধি, অবস্থান ও হৃদস্পন্দন নিয়মিত USG-এর মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়।



Standard Antenatal Check-up

রক্তচাপ, ওজন, শিশুর নড়াচড়াসহ সকল নিয়মিত প্রসবপূর্ব পরীক্ষা করা হয়।



Anomaly Scan — স্বাভাবিক

শিশুর শরীরে কোনো জন্মগত ত্রুটি আছে কি না তা জানার জন্য Anomaly Scan করা হয় এবং রিপোর্ট সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আসে।



Inj. Dexamethasone প্রয়োগ

সময়মতো Dexamethasone-এর পূর্ণ ডোজ এবং প্রয়োজন হলে Rescue Dose দেওয়া হয়, যাতে শিশুর ফুসফুস পরিপক্ব হতে পারে।

Inj. Dexamethasone — কী এবং কেন দেওয়া হয়?

Dexamethasone হলো একটি Corticosteroid ওষুধ।

গর্ভকালীন সময়ে—বিশেষত সময়ের আগে প্রসবের (Preterm Birth) আশঙ্কা থাকলে—এই ইনজেকশন দেওয়া হয়।



মূল উদ্দেশ্য

গর্ভস্থ শিশুর ফুসফুস (Lungs) দ্রুত পরিপক্ব করা, যাতে সময়ের আগে জন্ম হলেও শিশুটি নিজে নিজে শ্বাস নিতে পারে এবং Respiratory Distress Syndrome (RDS)-এর ঝুঁকি কমে।



Routine Dose (নিয়মিত ডোজ): গর্ভাবস্থার নির্দিষ্ট সময়ে ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে ২টি ইনজেকশন দেওয়া হয়।



Rescue Dose (পুনরায় ডোজ): গর্ভাবস্থার নির্দিষ্ট সময়ে ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে ২টি ইনজেকশন দেওয়া হয়।

সঠিক সময়ে Dexamethasone প্রয়োগ শিশুর জন্মের পর সুস্থাস্থ্য নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রসবের সিদ্ধান্ত (Delivery Plan) — Elective Caesarean Section

Caesarean Section (C-Section) কী?

এটি একটি অপারেশন পদ্ধতি যেখানে পেট কেটে জরায়ু থেকে সরাসরি শিশুকে বের করা হয়। “Elective” মানে পূর্বপরিকল্পিত — জরুরি নয়, বরং নিরাপদ সময়ে পরিকল্পনামতো করা হয়।

কেন Caesarean Section-এর সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো?

1. IVF গর্ভাবস্থায় ঝুঁকি বেশি থাকে।
2. প্রথম জন্মের Placenta low-lying ছিল — স্বাভাবিক প্রসবে রক্তপাতের ঝুঁকি।
3. রোগিণীর বয়স ৪১ বছর — উচ্চঝুঁকির গর্ভাবস্থা।
4. দীর্ঘ হাসপাতাল পর্যবেক্ষণের পর নিরাপদ প্রসবের সুযোগ।

নির্ধারিত তারিখ: ১৪/১১/২০২৩ — Elective Caesarean Section

প্রসবের ফলাফল (Delivery Outcome) — ১৪/১১/২০২৩

সময়:	দুপুর ২:২৮ মিনিট	প্রসব :	Caesarean Section-এর মাধ্যমে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম
শিশুর ওজন:	২৯০৬ গ্রাম (স্বাস্থ্যকর ওজন)	Log No.:	4678
জন্মের পর:	শিশুটি তৎক্ষণাৎ কান্না করে — এটি সুস্থাস্থ্যের ইঙ্গিত।	Vital Signs:	সকল Vital Parameters সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

নবজাতকের যত্ন (Neonatal Resuscitation)

ডেলিভারির সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত Paediatrician Dr. Mukut Banerjee (Associate Professor) Operation Theatre-এ উপস্থিত ছিলেন এবং নবজাতককে প্রয়োজনীয় Resuscitation প্রদান করেন।

অপারেশনের পরে মা ও নবজাতক উভয়ের Vital Parameters সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল। কোনো জটিলতা দেখা দেয়নি।

অপারেশন দলের বিবরণ (Operative Team)

অপারেশনকারী দল (Surgical Team)

- Prof. Dr. Malay Sarkar — S1 (প্রধান অপারেশনকারী, Unit In-charge)
- Dr. Debobroto Roy — S2 (Assistant Professor)
- Dr. S. P. Roychowdhury (Senior Medical Officer)
- Dr. Krishna Pada Das (Assistant Professor)
- Dr. Arpita Pramanik (Senior Resident)

Anaesthesia দল

- Prof. Dr. Sumanta Ghosh Maulik (HOD, Anaesthesia)
- Dr. Soumen Mandal (Associate Professor)
সংশ্লিষ্ট PGT চিকিৎসকবৃন্দ

শিশু বিশেষজ্ঞ (Paediatrics Team)

- Dr. Mukut Banerjee (Associate Professor, Paediatrics)
- নবজাতকের তৎক্ষণাৎ যত্ন ও Resuscitation নিশ্চিত করেন।

চূড়ান্ত ফলাফল ও কৃতজ্ঞতা (Final Outcome & Acknowledgement)

সফল ফলাফল

IVF যমজ গর্ভাবস্থায় প্রথম জ্ঞন হারানোর পরও, চিকিৎসকদের দক্ষতা ও নিবিড় পরিচর্যায় দ্বিতীয় শিশু সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছে। মা ও শিশু উভয়েই সুস্থ আছেন এবং সম্পূর্ণ নিরাপদ আরোগ্যের প্রত্যাশা রয়েছে।

এই কেসের মূল শিক্ষা

1. IVF যমজ গর্ভাবস্থায় একটি জ্ঞন নষ্ট হলেও অপরটিকে বাঁচানো সম্ভব।
2. Conservative Management-এর মাধ্যমে জটিল পরিস্থিতি সফলভাবে সামলানো যায়।
3. দলগত প্রচেষ্টা ও নিবিড় পর্যবেক্ষণ সফল প্রসবের চাবিকাঠি।

আমরা আমাদের Principal Mam এবং MSVP Sir-এর নিরবিচ্ছিন্ন সহযোগিতা, দিকনির্দেশনা ও আন্তরিক সমর্থনের জন্য আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

[illegible]

Limb Salvage via Femoral Embolectomy

Acute Lower Limb Ischemia and Restorative Revascularization in a 63-Year-Old Patient

BURDWAN MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL

EMERGENCY ADMISSION

Clinical Presentation & History

Patient Demographics & Complaints

Patient Identity

63-year-old female admitted with critical limb ischemia.

Chief Complaints

Blackish discoloration of the Right lower leg and foot persisting for 3 weeks, accompanied by severe persistent pain and dry burning sensation.

Clinical Status

Acute onset dry gangrene established over the Right foot with huge skin blistering, signaling severe tissue hypoxia.

Comorbidities

Known history of Hypertension (HTN) under active medical management for 4 years.

Pre-Operative Investigations

USG Color Doppler Findings

Crucial diagnostic vascular imaging revealed major occlusive arterial pathology:

- Occluding Thrombus:** Significant blood clot noted extending from the **Right Femoral Artery** down to the **Popliteal Artery**.
- Absent Pulsations:** Complete lack of flow pulsations in distal arteries: Anterior Tibial (ATA), Dorsalis Pedis (ADP), and Posterior Tibial (PTA).
- Proximal Flow:** Monophasic waveform noted at the proximal segment of the femoral artery, indicating high-grade proximal obstruction.

Laboratory Reports & Prep

Routine baseline blood panels collected prior to immediate surgical intervention:

- Hematology:** Hemoglobin (Hb%) measured at 10.8 g/dL; Platelet count stable at 3.07 Lakhs.
- Infection / Ischemia Marker:** Elevated Total Leukocyte Count (TLC) of $14.7 \times 10^3 / \mu\text{L}$, reflecting localized tissue necrosis and inflammation.
- Viral Profile:** Non-Reactive (NR) for standard viral screening.
- Pre-op Plan:** Patient prepared for emergency embolectomy under local anesthesia.

✓ REVASCULARIZATION DONE

Surgical Intervention

Exploratory Arteriotomy

The patient was taken to the operating theatre on 20th April 2026 for urgent limb-saving surgery:

01	02	03
Anesthesia	Procedure	Embolectomy
Conducted safely under Local Anesthesia (LA) due to patient cardiovascular risks (HTN).	Direct surgical exploration of the Right Femoral Artery.	Retrograde and antegrade passage of 4Fr, 5Fr, and 6Fr Fogarty balloon embolectomy catheter
04	05	
Clot Extraction	Pulse Restoration	
Complete thrombus successfully extracted both proximally and distally to full catheter lengths.	Immediate restoration of strong, pulsatile flow through the femoral artery.	

♥ DISTAL PERFUSION RESTORED

Post-Operative Course & Limb Salvage

Post-Operative Management Protocol

Strict clinical care sheet directives were initiated immediately post-surgery.

Anticoagulation

High-dose systemic Heparin infusion (25,000 U in 5% Dextrose) run over 24 hours to prevent acute re-thrombosis.

Antibacterial Cover

Intravenous Inj. Ceftriaxone to prevent secondary infection of compromised tissues.

Analgesia

Inj. Diclofenac administered for surgical pain control.

Amputation Demarcation

The restored proximal arterial circulation successfully limited the length of future amputation. Healthy tissue was salvaged down to the ankle, preventing a devastating major above-knee/below-knee amputation.

The Pillars Of This Achievement

Burdwan Medical College & Hospital



1. Dr. Tina Sadhukhan

2. Dr. Sanjit Kumar Mondal

3. Kalyanendu Naskar

4. Dr. Sudipto Patra

5. Ayan Bhattacharya

Questions & Discussion

A testament to how timely vascular intervention, even in advanced stages of ischemic changes, can preserve vital tissues and dramatically alter clinical outcomes.

Vascular Urgency

Prompt recognition of acute thrombosis in PAD patients is vital. Immediate Doppler mapping guides rapid revascularization.

Fogarty Catheterization

The use of multi-sized Fogarty catheters (4Fr-6Fr) ensures complete proximal & distal thromboembolic clearance.

Limb Preservation

Restoring blood flow limits the amputation segment to the gangrenous foot alone, salvaging vital extremity function.

Department Of Surgery · Burdwan Medical College And Hospital



Handwritten medical notes in cursive script, including phrases like 'Heart', 'Lungs', 'Brain', and 'Spirits'.

Oracle's Insight



ICHTHYOSARCOTOXICOSIS: A DETAILED REVIEW

(Poisoning Caused by Ingestion of Toxic Fish Flesh)

The relationship between Bengalis and fish transcends mere gastronomy; it is a **foundational cultural and literary identity** often encapsulated in the ancient proverb, "**Mache Bhate Bangali**" (Fish and rice make a Bengali). In Bengali culture, fish is not treated merely as a non-vegetarian meat, but practically as a "vegetable of the water," symbolizing life, fertility, and auspiciousness. Even a die-hard **Mohun-Bagan** fan (*like the author himself*) loves devouring Ghoti Ilish (Hilsa), and the craziest of **East Bengal** supporters find their mouths watering at the mere sight of Chingrir Malaikari (Prawn Malai Curry)—because a profound love for fish is woven into the very DNA of every Bengali.

Introduction

Ichthyosarcotoxicosis (also spelt *ichthyosarcotoxism*) is the medical term for poisoning that follows the **eating of toxic fish flesh**. The name itself tells the story – *ichthys* (fish) + *sars* (flesh) + *toxikon* (poison) + *osis* (a diseased condition).

Poisonous animal and Venomous animals are different. The former cause poisoning when eaten, but the latter attack and inject venom. It is important to understand that the fish are not "naturally venomous" in the way a snake or scorpion carries its own venom gland. Instead, the toxin is almost always **acquired from the environment or from improper handling** – through the food chain, through symbiotic bacteria, or through bacterial spoilage after the fish is caught. This single idea is the key to understanding the whole topic, and we will return to it again and again.

Ichthyosarcotoxicosis is distinguished in forensic medicine from two related but separate conditions:

- **Ichthyo-otoxism** – poisoning from toxic fish roe/eggs (e.g., certain catfish and barbel roe).
- **Ichthyo-haemotoxism** – poisoning from toxic fish blood/serum (e.g., moray eel blood), usually only dangerous if it enters broken skin or the eye, or is drunk raw.

FROM SOMEONE WHO STILL DREAMS OF BECOMING A
MARINE BIOLOGIST

This essay deals only with poisoning from the **flesh** of the fish, which is by far the most common and most important of the three for clinical and forensic practice.

Classification – The Four Types of Ichthyosarcototoxicosis

Based on the toxin involved, ichthyosarcototoxicosis is conventionally divided into four types:

Type	Toxin Responsible	Typical Fish	Region Most Affected
1. Ciguatera fish poisoning	Ciguatoxin (and related maitotoxin)	Grouper, snapper, barracuda, moray eel, amberjack	Tropical Indo-Pacific & Caribbean reefs
2. Tetrodotoxin (Puffer fish/Fugu) poisoning	Tetrodotoxin (TTX)	Puffer fish, porcupine fish, globefish, ocean sunfish	Japan, SouthEast Asia, Bengal coast
3. Scombroid (histamine) fish poisoning	Histamine and other biogenic amines	Tuna, mackerel, bonito, skipjack (and some non-scombroid fish)	Worldwide, wherever refrigeration fails
4. Ichthyosarcototoxicism (hallucinatory fish poisoning)	Toxin not fully characterised	Mullet, goatfish, surgeonfish	Tropical reef areas (Pacific)

Source of the Poison

Ciguatera Poisoning – the food-chain story

The story begins with a tiny single-celled alga called a **dinoflagellate, Gambierdiscus toxicus**, which lives on dead coral and seaweed in tropical reefs. This organism produces **ciguatoxin**, a fat-soluble, heat-stable polyether compound.

- Small herbivorous reef fish graze on the algae and pick up small amounts of toxin.
- Larger carnivorous fish (grouper, barracuda, moray eel, amberjack) eat many of these smaller fish over their lifetime.
- Because the toxin is **not broken down or excreted**, it accumulates and becomes more concentrated the further up the food chain you go – a process called **bio-magnification**.
- The toxin is concentrated especially in the **liver, intestines, and roe** of the large fish, which is why eating the viscera of a big reef fish is particularly dangerous.

FROM SOMEONE WHO STILL DREAMS OF BECOMING A
MARINE BIOLOGIST

Tetrodotoxin (Puffer Fish) Poisoning – the "Fugu" story

Tetrodotoxin is produced not by the fish itself but by **symbiotic marine bacteria** (Vibrio and Pseudomonas species) that live in and on the puffer fish. The fish tolerates the toxin in its own tissues (it is resistant to it) and concentrates it in specific organs:

- **Liver** (highest concentration)
- **Ovaries/roe**
- **Intestines**
- **Skin**

The **muscle (flesh)** itself usually has the least toxin, which is why expert Japanese fugu chefs, licensed after years of training, can serve puffer fish safely by removing the toxic organs with extreme precision. Poisoning occurs almost always when fish is prepared by an **untrained person**, or when a fish is wrongly identified and sold as a harmless species.

Scombroid (Histamine) Poisoning – the spoilage story

This is technically not a "fish toxin" in the same sense as the other two – it is a **decomposition product**. Fish of the family Scombridae (tuna, mackerel, bonito, skipjack) – and several non-scombroid fish such as mahi-mahi and sardines – naturally contain **large amounts of the amino acid histidine** in their dark muscle.

- If the fish is **not chilled rapidly** after being caught, bacteria that contaminate the fish (commonly *Morganella morganii*, *Klebsiella pneumoniae*, and others) multiply and produce the enzyme **histidine decarboxylase**.
- This enzyme converts histidine into **histamine**, along with other biogenic amines such as putrescine and cadaverine.
- Because histamine is **heat-stable**, ordinary cooking, smoking, or canning does not destroy it once it has formed - the fish may look, smell, and taste completely normal..

Ichthyosallyeinotoxism

This rarer form follows ingestion of certain tropical mullet, goatfish, or surgeonfish. The exact toxin has not been fully isolated, but it is thought to relate to the fish's diet of particular algae or detritus, similar in spirit to the ciguatera story.

Mechanism of Action

This is the most fascinating part of the topic, because two of the toxins act on **exactly the same target – the voltage-gated sodium channel of nerve and muscle cell membranes – but produce opposite effects.**

Tetrodotoxin – the channel BLOCKER

Tetrodotoxin binds tightly to a specific site (site 1) on the outside of the voltage-gated sodium channel and **physically plugs it**, like a cork in a bottle. Sodium ions can no longer rush into the nerve or muscle cell, so:

- The nerve **cannot generate an action potential.**
- Nerve-to-muscle transmission fails.
- The result is a **progressive, ascending flaccid paralysis** – starting at the lips and tongue and moving down to the limbs and finally the respiratory muscles.
- Crucially, because TT does not cross into the brain easily and does not affect higher cognitive centres, **the patient typically remains fully conscious even while completely paralysed** – a chilling and clinically important feature.

Ciguatoxin – the channel that won't close

Ciguatoxin binds to a different site (site 5) on the same sodium channel, but instead of blocking it, it **holds the channel open at the normal resting membrane potential.**

This causes:

- A continuous, uncontrolled leak of sodium into the cell.
- Spontaneous, repetitive firing of the nerve even without a normal trigger.
- Hyper-excitability of sensory nerves – producing the **tingling, burning, and the classically described "reversal of hot and cold sensation"** (Thermal Allodynia -here cold is perceived as hot and vice-versa) that is almost unique to ciguatera poisoning.
- Ciguatoxin also affects calcium channels and the autonomic nervous system, which explains some of the cardiovascular symptoms (bradycardia, hypotension) seen in severe cases.

FROM SOMEONE WHO STILL DREAMS OF BECOMING A
MARINE BIOLOGIST

Scombrototoxin– not a channel poison at all

Here the mechanism is completely different. There is no single "scombrototoxin" molecule – the illness is caused by **histamine acting on its own receptors** (H1 and H2) in blood vessels, skin, and gut, almost exactly mimicking what happens during a true allergic reaction:

- **H1 receptor activation** → flushing, itching, headache, bronchospasm.
- **H2 receptor activation** → increased gastric acid secretion, some of the abdominal symptoms.
- Vasodilation and increased capillary permeability → flushing, hypotension in severe cases.

*Because it resembles an allergy so closely, scombroid poisoning is very often **misdiagnosed as A seafood allergy**.*

Signs and Symptoms

Ciguatera fish poisoning

Phase	Features
Onset	1-6 hours after eating(occasionally up to 30 hours)
Gastrointestinal	Nausea, vomiting, watery diarrhoea, abdominal cramps
Neurological	Numbness and tingling around the mouth and limbs, reversal of temperature sensation (pathognomonic), itching, muscle and joint pain, weakness, unsteady gait
Cardiovascular	Bradycardia, hypotension in severe cases
Course	Acute symptoms last days to a few weeks; paraesthesia and fatigue may persist for months ("chronic ciguatera syndrome")

FROM SOMEONE WHO STILL DREAMS OF BECOMING A
MARINE BIOLOGIST

Ciguatera poisoning

- Intravenous **mannitol** has historically been used to relieve neurological symptoms, though its benefit is debated in more recent reviews.
- **Amitriptyline or gabapentin** for persistent paraesthesia/neuropathic pain in the sub-acute phase.
- **Atropine** for symptomatic bradycardia.
- Patients are usually advised to **avoid alcohol, nuts, and further fish/shellfish** for several weeks, as these are reported to trigger relapse of symptoms.

Tetrodotoxin (Fugu) poisoning

- Early **gastric lavage and activated charcoal**.
- **Mechanical ventilation** is often life-saving if respiratory muscles become paralysed this is the single most important intervention.
- **Atropine** for excessive salivation and bradycardia.
- Since the toxin is gradually cleared by the body, **patients who survive the first 24 hours on supportive care generally recover completely** with no lasting damage.

Scombroid (histamine) poisoning

- **H1-antihistamines** (e.g., diphenhydramine) are the mainstay of treatment.
- **H2-antihistamines** (e.g., ranitidine) are often added for additional relief.
- **Adrenaline (epinephrine)** is reserved for rare severe cases with bronchospasm or significant hypotension.
- Most cases settle within hours even without treatment, but antihistamines speed relief considerably.

Ichthyosallyeinotoxism

- Purely supportive and reassuring care; the condition resolves on its own.

Tetrodotoxin (Fugu) poisoning

Phase	Features
Onset	Rapid – 10 to 45 minutes, occasionally up to a few hours
Early	Numbness and tingling of lips, tongue, and face; excessive salivation; sweating
Progressive	Ascending weakness and flaccid paralysis of limbs, difficulty speaking (dysarthria) and swallowing (dysphagia), unsteady gait
Late/Severe	Paralysis of the respiratory muscles leading to death from respiratory failure - the patient's mind typically remains clear throughout ("conscious paralysis")
Recovery	If the patient survives the first 24 hours (usually with ventilatory support), recovery is generally complete, as the toxin is gradually metabolised and excreted

Scombroid (histamine) poisoning

Phase	Features
Onset	Very rapid- 10 minutes to 2 hours
Features	Flushing of the face and neck, a burning/peppery taste in the mouth, hot sensation, urticarial (hive-like) rash, throbbing headache, palpitations, abdominal cramps, diarrhoea; bronchospasm and hypotension occasionally in severe cases
Course	Usually self-limiting, resolving within 4-6 hours

Ichthyoallyeinotoxism

Onset within 20 minutes to 2 hours; features include visual and auditory hallucinations, vivid nightmares, anxiety, and unsteady gait. The condition is usually self-limiting over a day or two.

FROM SOMEONE WHO STILL DREAMS OF BECOMING A
MARINE BIOLOGIST

Diagnosis

There is no single rapid bedside test for any of these poisonings, so diagnosis rests mainly on:

- **A clear history** of recent ingestion of fish, the type of fish eaten, and where/how it was caught or stored.
- **Recognition of the characteristic symptom pattern** temperature reversal strongly suggests ciguatera; perioral numbness progressing to paralysis with a clear mind suggests tetrodotoxin; flushing with an urticarial rash shortly after eating tuna/mackerel suggests scombroid poisoning.
- **Laboratory confirmation**, where available, by testing a sample of the left-over fish ELISA-based assays for ciguatoxin, and HPLC (high-performance liquid chromatography) for histamine levels in suspect scombroid fish.
- **Excluding other causes** such as bacterial food poisoning, true IgE-mediated seafood allergy, and other marine envenomations.

Management

There is **no specific antidote** for ciguatoxin or tetrodotoxin; management is almost entirely **supportive**. Scombroid poisoning is the one type where a fairly specific treatment (antihistamines) works well, because the mechanism is a known one.

General measures (all types)

- Secure the **airway, breathing, and circulation** first – this matters most in tetrodotoxin poisoning, where respiratory paralysis can be rapid.
- **Gastric lavage or activated charcoal** if the patient presents early (within an hour or two) and is not already vomiting profusely.
- **Intravenous fluids** for hypotension or significant fluid loss from vomiting/diarrhoea.

Prevention

- Avoid eating **large predatory reef fish** (grouper, barracuda, moray eel) from known ciguatera-endemic regions, and especially avoid the **liver and roe**, where toxin is most concentrated.
- Puffer fish should be eaten only **when prepared by a properly licensed and trained chef**, and never prepared at home by an untrained person.
- **Refrigerate or ice scombroid-type fish immediately** after catching, and maintain the cold chain throughout transport and storage – remember that **cooking does not destroy histamine once it has formed**.
- Public health authorities in endemic coastal regions often run **toxin-testing and fish-catch surveillance programmes** to reduce outbreaks.
- General public awareness, especially among tourists and travellers visiting tropical reef regions, is an important and inexpensive preventive measure.

Forensic and Medico-Legal Importance

Ichthyosarcotoxycosis has a place in forensic medicine for several reasons:

- It must be carefully **distinguished from homicidal or accidental chemical poisoning** during death investigations in coastal communities, particularly when several people who shared the same meal fall ill or die together (a pattern that should immediately suggest a food-borne cause rather than a targeted poisoning).
- **Mass outbreaks** following a community feast or restaurant meal often require systematic epidemiological investigation, including examining leftover fish samples, kitchen practices, and the source/supplier of the fish.
- At **Medico-legal autopsy**, examination of stomach contents for fish remnants, along with the clinical history, may help establish the cause of death where direct toxin assay is unavailable.
- Awareness among physicians in **non-endemic regions** is increasingly important because of global seafood trade, travel, and imported fish reaching markets far from where they were caught.

FROM SOMEONE WHO STILL DREAMS OF BECOMING A
MARINE BIOLOGIST

Conclusion

Icthyosarcotoxycosis reminds us that the sea's dangers are rarely as simple as a single venomous animal – they are usually a **story of ecology, food chains, bacteria, and human handling errors**. A reef fish becomes dangerous because of what it ate; a puffer fish becomes dangerous because of bacteria living inside it; and a perfectly ordinary tuna becomes dangerous simply because it was left out of the ice for too long. Recognising the characteristic symptom patterns– temperature reversal, conscious paralysis, or sudden flushing after a fish meal – allows the clinician to make a confident diagnosis even without specialised laboratory tests, and to offer the right supportive treatment promptly, which is, in almost every case, the single most life-saving step.

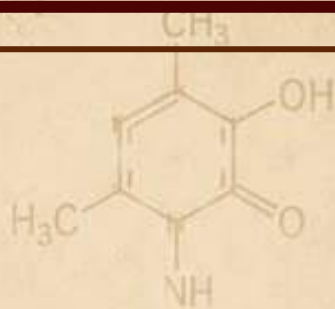
DR. ANIRUDDHA DAS

ASSOCIATE PROFESSOR

DEPARTMENT OF FORENSIC MEDICINE AND TOXICOLOGY

BURDWAN MEDICAL COLLEGE

**FROM SOMEONE WHO STILL DREAMS OF BECOMING A
MARINE BIOLOGIST**



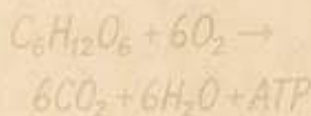
$$E=mc^2$$

Click on the
link below
every article
for further
reading

CLINICAL COMPASS

“From India’s first homegrown antibiotic to Human’s regeneration abilities,
we aim to bring the most cutting edge medical news out there!”

$$F=ma$$



Humans may have hidden regenerative powers

A NEW VIEW OF MAMMALIAN REGENERATION



For generations, scientists have viewed the inability to regrow lost body parts as one of the fundamental limitations of humans and other mammals. New research from the Texas A&M College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences (VMBS), however, suggests that regenerative abilities could be hidden within the body's normal healing machinery, waiting to be activated under the right conditions.

A new two-step treatment is described that has enabled the regeneration of bone, joint structures, and ligaments.

REDIRECTING HEALING AWAY FROM SCAR FORMATION

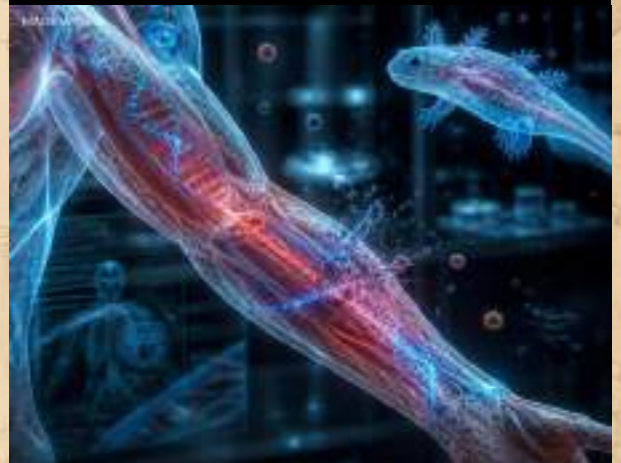
To explore whether mammalian healing could be pushed toward regeneration, the research team developed a treatment that uses two well-known growth factors in sequence. The first step involved applying fibroblast growth factor 2 (FGF2) after the wound had already healed over. By waiting until the initial healing process was complete, the researchers allowed the body to respond normally before intervening. Several days later, the researchers applied a second growth factor, bone morphogenetic protein 2 (BMP2), which prompted those cells to begin building new tissues.

REGROWING BONE, TENDONS, LIGAMENTS, AND JOINTS

Although the regenerated tissues were not exact matches to the original anatomy, the researchers successfully restored all of the major structures that had been removed during amputation, including bone, tendon, ligament, and joint tissue. The regenerated areas contained both skeletal components and connective tissues arranged in patterns resembling natural anatomy.

POTENTIAL BENEFITS OF WOUND HEALING

While the research remains in its early stages, the scientists believe it could have practical applications long before complete regeneration becomes possible. Rather than focusing solely on replacing missing structures, the approach may help improve healing outcomes by reducing scar formation and enhancing tissue repair.



New 6-Month Drug-Resistant TB Regimens Show Excellent Results in India

THE NEW BPaLM AND BPaL REGIMENS FOR DRUG-RESISTANT TUBERCULOSIS IN INDIA(2025–2026)



- The overall treatment success rate of this regimen reached 89.7%, whereas the older regimens had ~50-60% success rates.

- 82.4% of patients became culture-negative within 2 months and 94.3% achieved culture conversion by 4 months.

- MDR/RR-TB patients achieved a success rate of 91.2%. Patients with pre-XDR-TB had a lower success rate of 84.7%, indicating that treatment challenges still exist in this subgroup.

- Loss to follow-up was only 6.2%, suggesting improved adherence with shorter treatment duration.

- Overall mortality during treatment was 4.1%.

Thus, it is confirmed that Indian healthcare settings are replicating the excellent results seen in clinical trials. These regimens will phase out the use of injectable drugs (which comes with several side effects). The study strongly supports nationwide scale-up of BPaL/BPaLM under the NTEP.

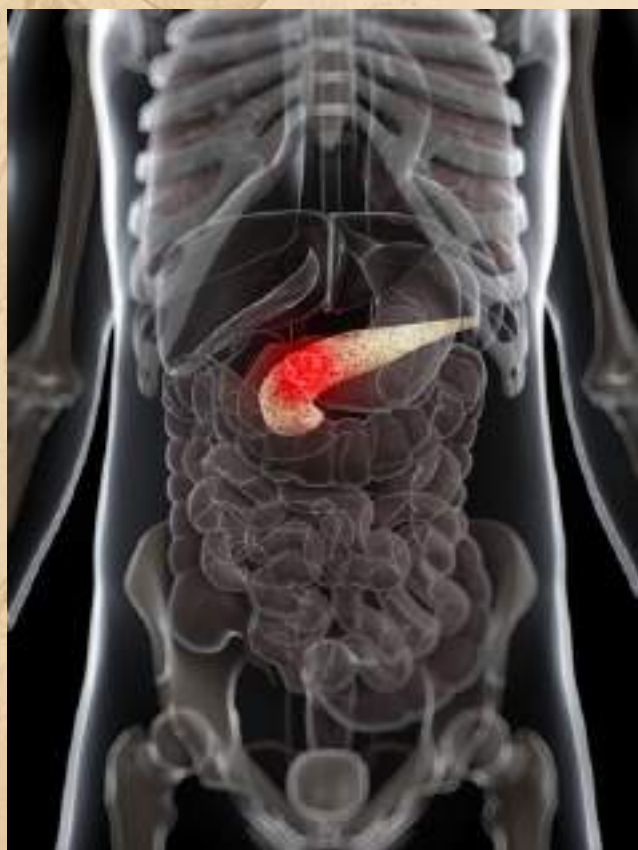
India has transitioned from its earlier lengthy 18–24 month MDR-TB treatments to 6-month all-oral BPaL and BPaLM regimens. BPaL consists of bedaquiline, pretomanid, and linezolid. BPaLM adds moxifloxacin. This systematic review analyzed 42 Indian studies involving 28,436 patients, making it one of the largest evaluations of these regimens in India.

Drug-resistant tuberculosis (DR-TB) remains a major public health challenge in India, with suboptimal outcomes associated with conventional long-duration regimens. The introduction of shorter, all-oral regimens—BPaL (bedaquiline, pretomanid, linezolid) and BPaLM (addition of moxifloxacin)—marks a paradigm shift in DR-TB management.



Daraxonrasib for Pancreatic Cancer: A Revolutionary Breakthrough

PHASE 3 TRIAL RECEIVES A 42 SECOND STANDING OVATION AT ASCO 2026.

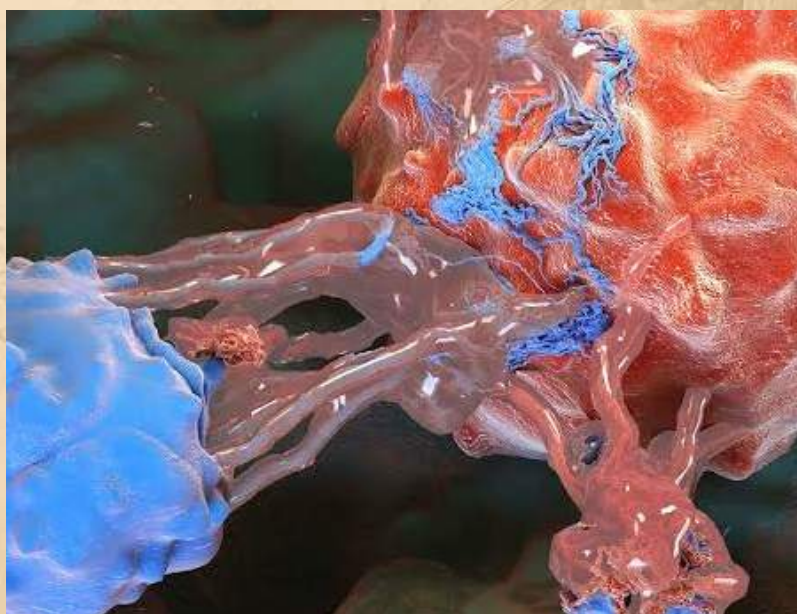


HOW DOES IT WORK?

Daraxonrasib is designed as a noncovalent, multi-selective inhibitor of RAS(ON) proteins. Unlike earlier RAS-targeted agents that were limited to specific alleles, daraxonrasib is designed to address a broader spectrum of RAS variants, which is particularly relevant in PDAC given the diversity of RAS mutations observed in this cancer type.

KRAS mutations have been considered as an impossible therapeutic target for decades, up until this year. Revolution Medicines announced that through this trial, the researchers found evidence that the drug could potentially almost double the survival of patients with metastatic PDAC.

Pancreatic cancer is widely considered one of the most aggressive forms of cancer. Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) accounts for about 90% of the cases. As we know, unique combinations of genetic mutations can cause several forms of cancer. One of which is KRAS (Kirsten rat sarcoma virus oncogene homologue) is found in over 90% of all PDACs.



New GLP-1 diabetes pill delivers major weight loss and blood sugar control

A PROMISING NEW DIABETES PILL COULD MAKE POWERFUL GLP-1 TREATMENTS MUCH EASIER TO USE.



The highest dose reduced HbA1c by up to 1.88 percentage points. Up to 72.3% of treated participants lost at least 5% of their body weight. At the highest dose, average body-weight reduction reached approximately 7.7% by week 26. Research showed that the overall safety profile was generally similar to other drugs in the GLP-1 class.

Researchers tested elecoglipron, a new experimental once-daily oral GLP-1 receptor agonist in people with type 2 diabetes. The study was called SOLSTICE, a Phase 2b clinical trial. Up to 89.6% of participants taking elecoglipron achieved an HbA1c below 7%, which is the standard treatment target for most patients with diabetes. Thus, blood sugar control improved significantly.



Key advantages of Elecoglipron

Compared with injectable GLP-1 drugs:

- No injections required.
- Easier storage and administration.
- May improve patient acceptance and adherence.

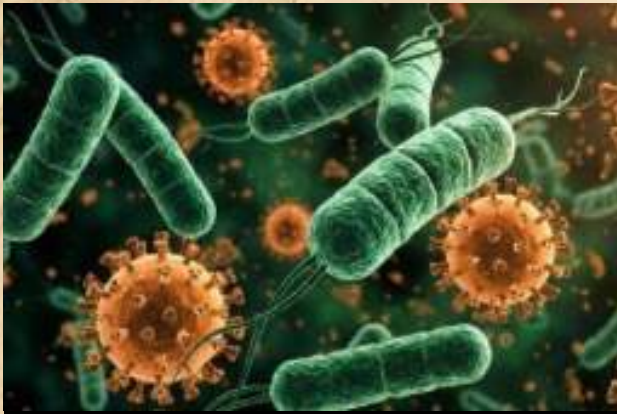
Compared with oral semaglutide:

- No requirement for fasting before dosing.
- No restrictions on eating/drinking.
- Once-daily administration.

If future trials confirm these results, elecoglipron could become one of the first highly effective needle-free GLP-1 treatments, potentially making diabetes and obesity management more accessible and convenient for millions of patients.

INDIA'S FIRST FDA-APPROVED ANTIBIOTIC IS HERE

INDIA'S FIRST HOMEGROWN FDA APPROVED ANTIBIOTIC MARKS A HISTORIC MILESTONE



A Mumbai-based pharmaceutical company Wockhardt has achieved a major milestone with its new antibiotic Zaynich. The drug has become the first medicine fully discovered, developed, and commercialized by an Indian pharmaceutical company to receive approval from the US Food and Drug Administration (FDA).

Zaynich is also a New Chemical Entity (NCE), which means it contains a completely new molecule that did not exist before and had never been approved as a medicine. The FDA recently approved Zaynich as an injectable antibiotic for treating complicated urinary tract infections (UTIs) caused by drug-resistant bacteria. The drug has now entered the global antibiotic market, which is worth around \$9 billion.

WHAT MAKES ZAYNICH DIFFERENT?

Most antibiotics used against resistant bacteria combine an antibiotic with another compound that protects it from enzymes produced by bacteria. Zaynich works differently. It combines cefepime, an existing antibiotic, with zidebactam, a new molecule discovered by Wockhardt.

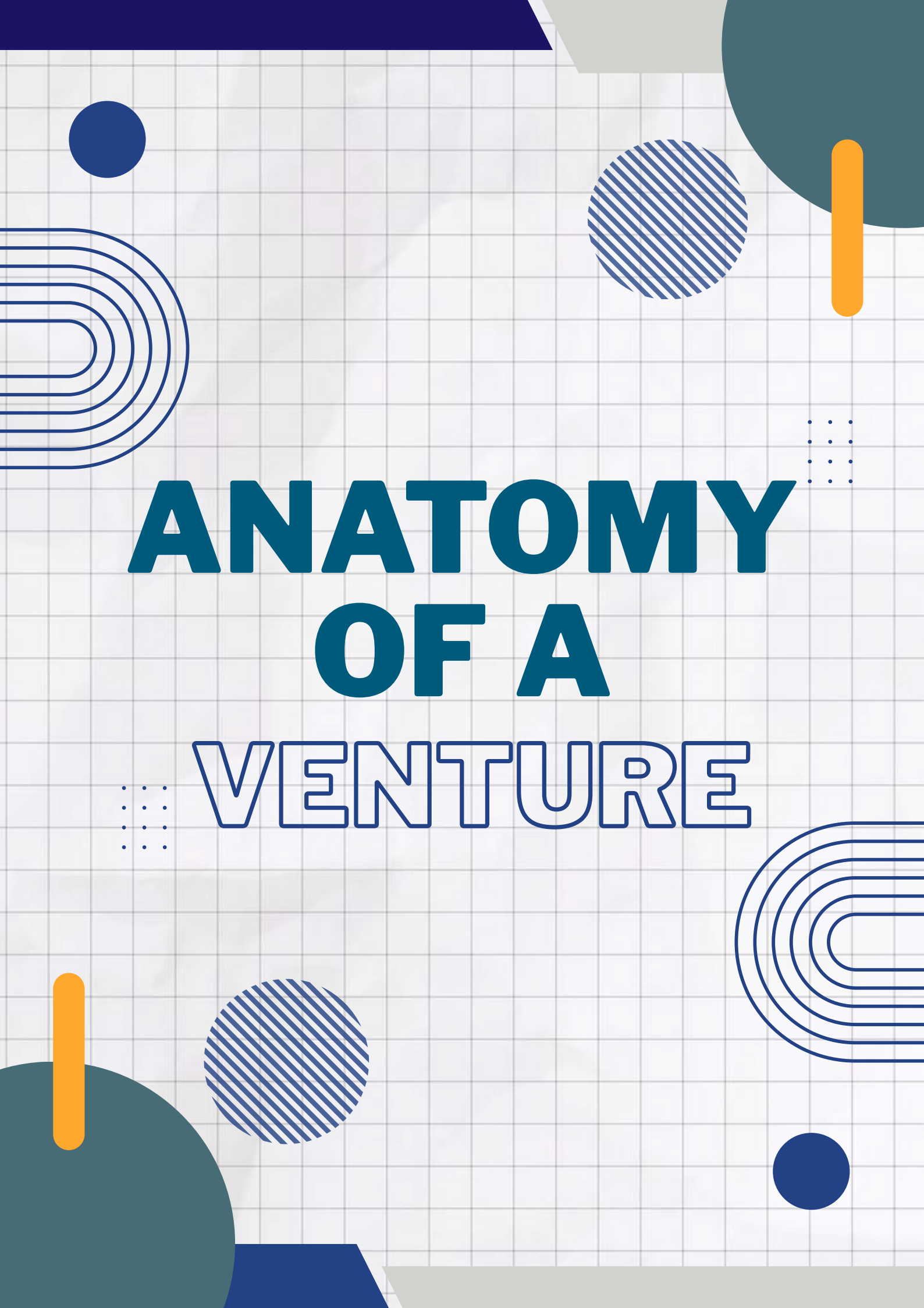
- Cefepime targets a protein called PBP3.
- Zidebactam targets another protein called PBP2.

Both proteins are essential for bacteria to survive and multiply.

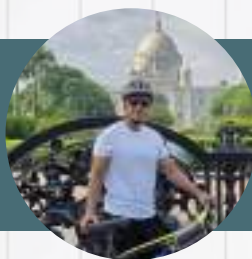
STRONG CLINICAL TRIAL RESULTS

- 89% of patients treated with Zaynich achieved both clinical recovery and complete removal of the infection-causing bacteria.
- In comparison, 68.4% of patients treated with meropenem, one of the most widely used last-resort antibiotics, achieved the same outcome.



The background is a light gray grid. It features several abstract geometric elements: a solid dark blue circle in the top left; a series of concentric blue lines on the left side; a circle with blue diagonal stripes in the top right; a solid orange vertical bar next to a large dark teal circle in the top right; a 3x3 grid of dots in the top right; a 3x3 grid of dots on the left side; a series of concentric blue lines on the bottom right; a solid orange vertical bar next to a large dark teal circle in the bottom left; a circle with blue diagonal stripes in the bottom left; and a solid dark blue circle in the bottom right.

ANATOMY OF A VENTURE



Ayan Sinha
Batch 2022-23

Hi, I'm Ayan Sinha from the final year MBBS batch, and would love to discuss business & finance related aspects of healthcare sector in this magazine column going forward.

As medical students and doctors we naturally prioritize patient care and academics, but in today's healthcare ecosystem, understanding the business side of medicine is equally important for long-term survival. Over the past few years, I have tried a few business ventures. Most of them failed, while a few managed to survive. Through this column, I'll share my own experience as well as insights from seniors who are doing very good (business-wise in medical sector). Any suggestions, corrections, or opinions regarding this section are highly appreciated. You can contact me – ayan170901@gmail.com.

How “They” would turn Doctors into Beggars

For my first article in this magazine, I wanted to choose a title that grabs attention while highlighting a growing concern. The discussion revolves around how “they”—large digital platforms and corporations—could gradually squeeze independent doctors and small healthcare businesses out of the market. This is a vast topic, so I plan to publish it in multiple parts.

Today the discussion is of a Doctor running a diagnostic business and “They” – referring as ‘Digital Platforms’ will target your business and slowly take control.

Imagine you're a radiologist or clinician. After years of hard work saved enough capital, on top of that taken loan worth crores to setup the dream diagnostic center. Now the real game starts- Once the center starts operating, reality sets in. Business is running on toes and patient volume is lower than expected in beginning, barely making profits after all expenses, loan repayments continue to pile up.



At this stage, the digital platforms (Not going to take any name) arrive as angel, their representatives present themselves as a marketing and branding partner – promise to increase patient footfall, for that some commission have to give. At first glance, it seems like an excellent opportunity. Doing partnership with them is signing the death warrant.

Let's take an example.

Suppose the market price of an average MRI Scan is 5000/-. Now this company would come and tell- patients bought through their ...platform payment would be 4500/- to your center. While they'll list the scan on their website for 3000/- only, absorbs a loss of 1500/- on every booking.

Initially, everyone appears to benefit. Patients receive cheaper scans, and your centre experiences increased patient volume. But they have secret agenda, patients would start compare prices by calling your reception and then visiting their platform, and would definitely book scan from the cheaper source. These digital platforms will burn crores of rupees initially, which is peanut for them as they are funded billions of dollars by international VCs.

This is the reason they can afford to operate at a loss for extended periods in order to acquire market share.

Gradually, the platform becomes the primary gateway through which patients access your services and slowly they'll corner the entire market. Now your diagnostic business will be totally controlled by these digital platforms like parasite. A time will come when this platforms will force you to accept lower rates, instead of 4500/-, now maybe 2500/- (Just like CGHS/ Ayushman Bharat rates, where in spite of rising cost of staff salary, consumables, operational & infrastructure cost those insurance package rate is kept same for years, making small hospital owners drowning in water; The

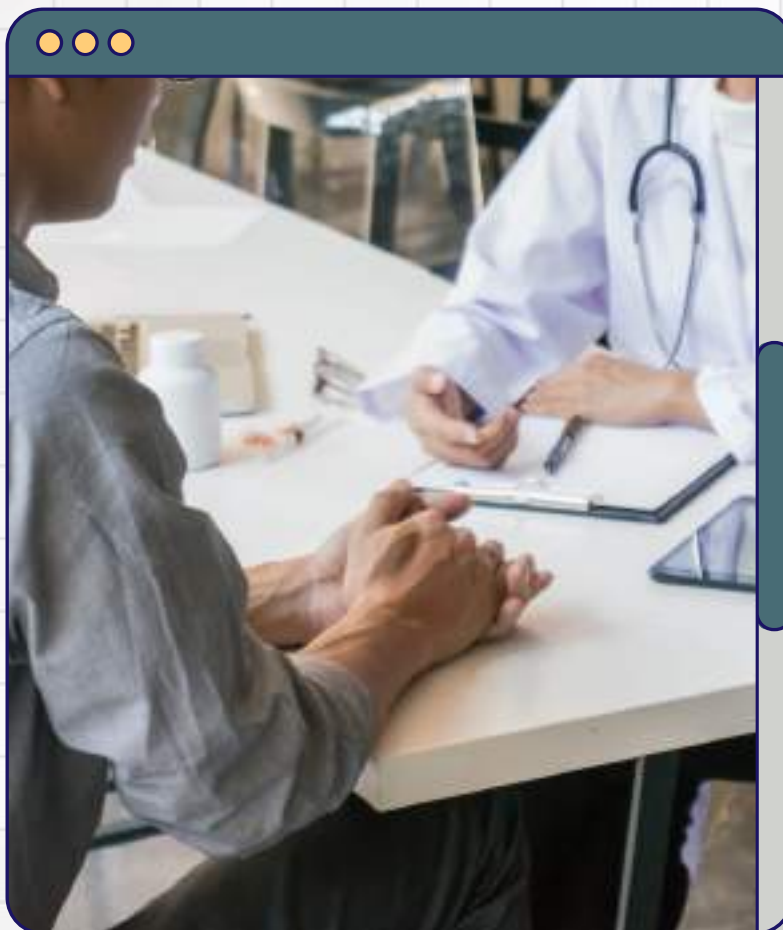
details can be discussed on future magazine column).

All patient would be habituated to book through their apps rather than visiting diagnostic center, leaving the diagnostic centre with little bargaining power. (Same situation happened how Amazon Flipkart destroyed retail business or Makemytrip destroyed individual hotel identity).

Running a fully equipped diagnostic facility is extremely expensive. A 1.5 Tesla machine may cost around 3 crore rupees, along with infrastructure setup can cost 50L & upwards. With rising cost of staff salary, consumables, maintenance, the 2500/- price is totally non

remunerative.

Now your business is a distressed asset, and those platforms would buy out your physical asset at a fraction of its value –the asset which you've built over the years by investing multiple crore rupees. The platform, meanwhile, gains greater control over patient access and pricing, while independent doctors become servants to them. So, partnership with these platforms is serving your own death warrant. It can be prevented only by making a union among diagnostic center



owners and jointly taking the decision to abandon these platforms. However, this requires collective discipline. If only a few centres continue to offer exclusive discounts through external platforms, others may feel compelled to follow. Be strict about pricing; otherwise, outsiders will take your opportunity.

Another challenge is that many doctors invest heavily in medical infrastructure but have a very small budget for the marketing, branding, and patient engagement of their own center. Their marketing teams are lowly educated and have zero technical knowledge about the products and services they're

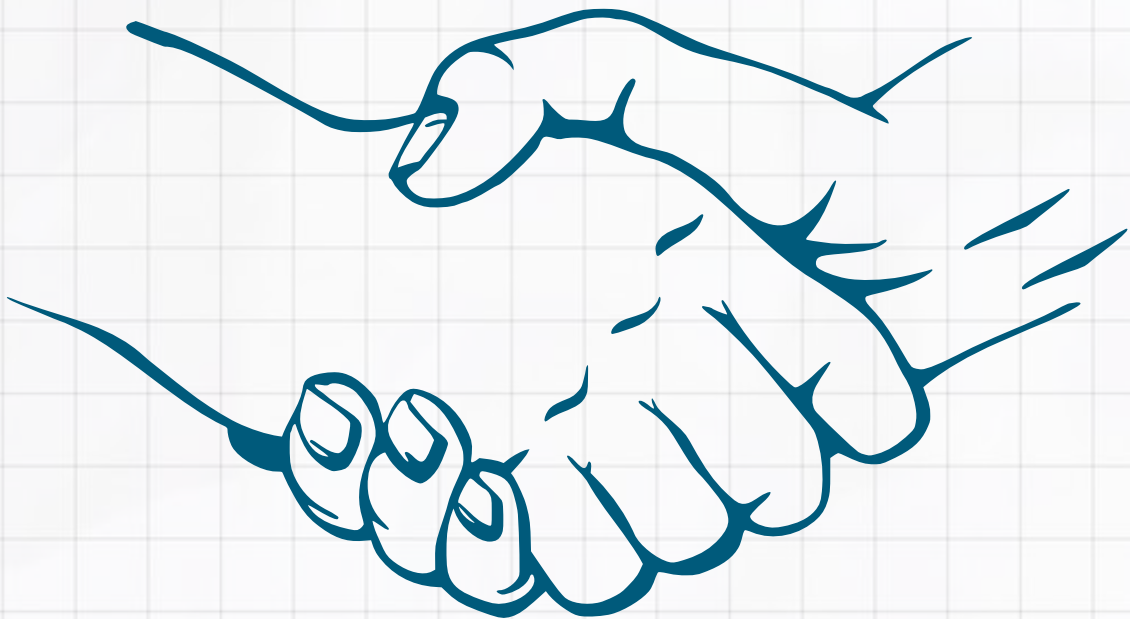
offering. As a result, companies with stronger marketing expertise often dominate the relationship with patients, even though they do not provide the medical service themselves.

Many well-established diagnostic centers have their own portal for booking and are very much strict about pricing. They don't partner with these 3rd party platforms for the greed of a few more patients.

This strategy is very much necessary for

long-term survival and to preserve greater control over their business.

Hope this ground-reality article is found to be helpful and concerning at the same time. In the next column, we can discuss Corporatization and Health Insurance package discrepancies—how small nursing homes/hospitals are affected by this. Your feedback and suggestions are always welcome and will help shape future articles.





চিত্রগ্রাফি



TANMAY PURWAR

BATCH 2020-21

"And when I looked at the sky that day, I felt like I was staring into the same blinding sun I'd seen years ago while sitting by the window in my old house, the one with two windows, the one I grew up in, and somehow I felt I was looking at the house from the cliff and the cliff from the house, and I felt a hollowness in my chest, like that soaring bird must feel while flying from one branch onto another, and I felt it as a tingling over my whole body, like a gilded ray from the quiver had just pierced my heart and the grass all around had thence been colored gold, and I knew the cliff would never come back, and neither would the house."



SHOUNAK DAS

BATCH 2022-23

“উমাকে বলি, "মা, এসো
ঘরে",
নিজের মেয়ে কাঁদে নীরবে
অন্ধকারে।
জীবন্ত দুর্গার সম্মান যেখানে
ক্ষয়,
সেখানে কি সত্যিই দেবীর
বিজয়?”





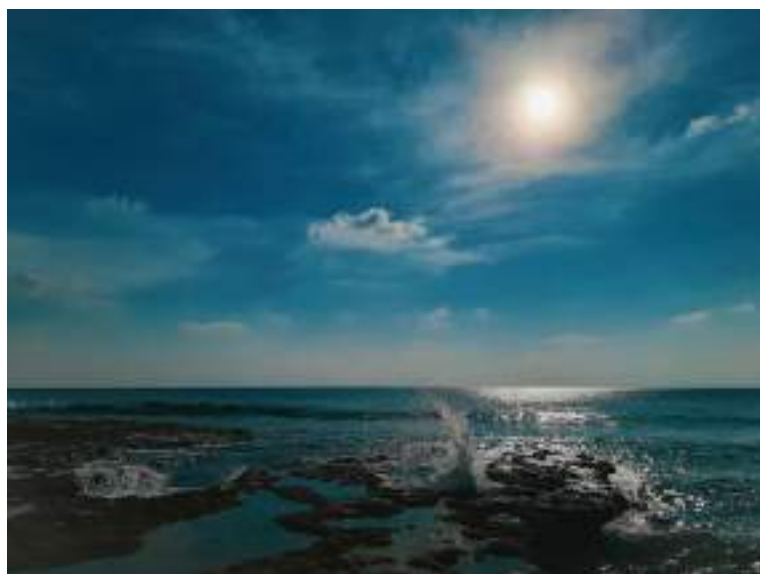
BINIT GHOSH
BATCH 2023-24

“The Predator’s Mirror”



AHANA GHOSH
BATCH 2023-24

“Shore of coral”





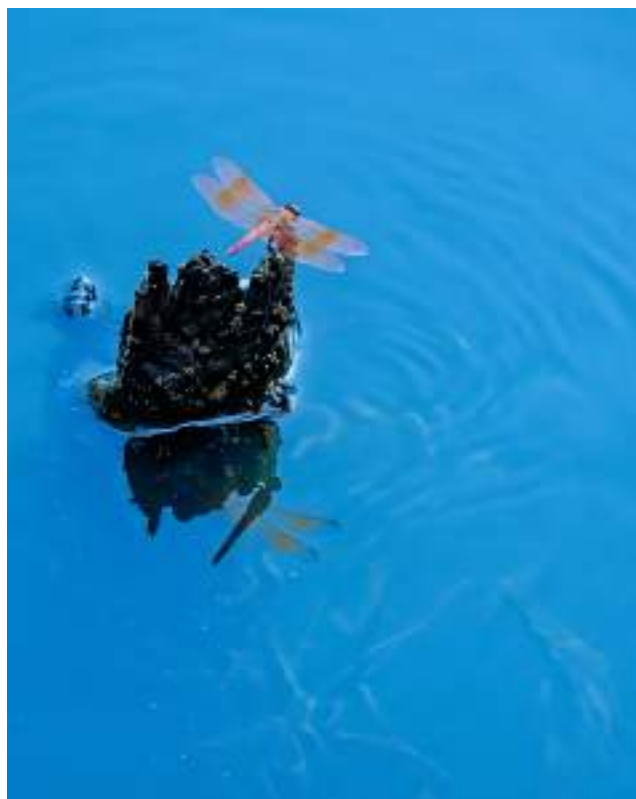
ARITRA SINGHA ROY
BATCH 2022-23

“Infinity is calling you”



KUNTAL SARDAR
BATCH 2025-26

“Reflected calm”





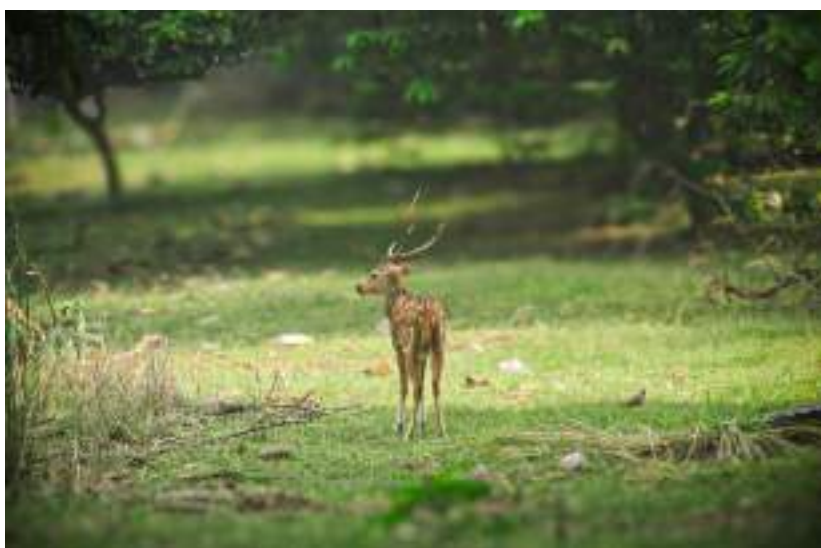
SUBHANKAR KAMILYA
BATCH 2023-24

*“In the heart of every
flame lies a new
beginning...”*



KANKANA CHATTERJEE
BATCH 2024-25

“Royal Antlers”





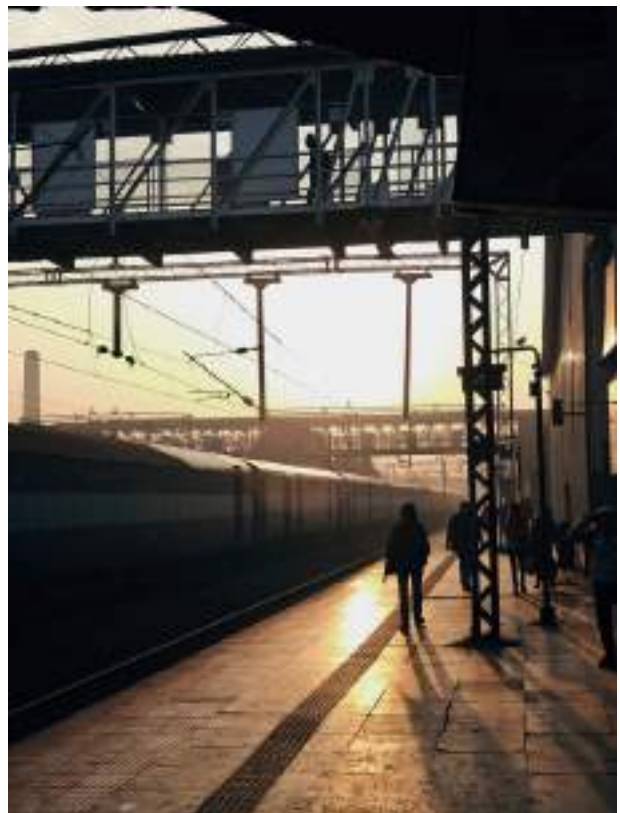
RAJIBUL HOQUE
BATCH 2024-25

*“Beyond the naked eye,
a silent visitor in nature's
golden cathedral”*



PRIYANSHU GHOSH
BATCH 2025-26

“A journey yet to begin”





SHUBHAYU CHAKRABARTI
BATCH 2025-26

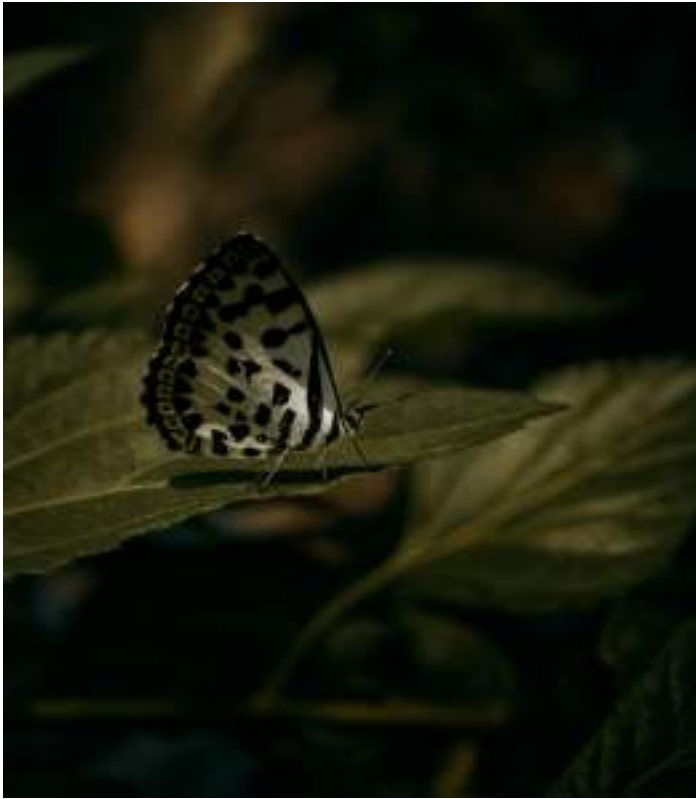
“দূরে, কোথাও বহু দূরে”



NEELANJAN
CHAKRABORTY
BATCH 2023-24

“অবাক জলপান”





SABBASACHI SK
BATCH 2025-26

“নীৰব সৌন্দৰ্য”



MAITRAYEE
MAITI
BATCH 2023-24

*“Every sunset
leaves behind a
story untold”*





AGNIK CHATTERJEE
BATCH 2023-24

*“The columns stand, the tree
 preserved,
 The forgotten planted the seed;
 Through the fracture of time,
 Life goes on.
 Every monument was a promise,
 Rooted in the bones of silence;
 Ruin lay in the prayers,
 The tree reaching for luminance
 never beheld.”*



KALLOL MANDAL
BATCH 2025-26

“সব পেয়েছির দেশ”



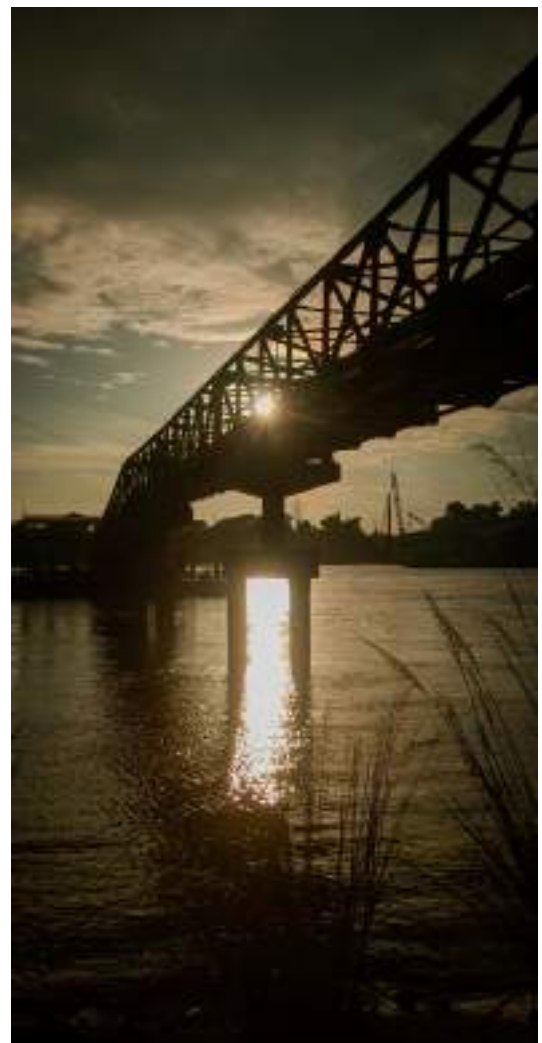


BIVANGSHU ROY
BATCH 2022-23

“As the sun bows to the horizon, the river carries dreams home.”

ABIR BISWAS
BATCH 2025-26

“The day departed in fragments of gold.”



The image is a surreal artistic composition. In the upper left, a brown paint can with a face and a mustache is tilted, pouring a stream of bright green paint. A small black lid lies nearby. In the center, a paintbrush with a black handle and a silver ferrule is positioned as if painting. Below it, a palette with various colors of paint is resting on a wooden easel. The background is a textured, mottled grey and brown surface, with a large, irregular splash of pink and red paint in the center. The entire scene is framed by a thin gold border.

MEHFIL-E-ART



SIBABRATA NAG
BATCH 2023-24

*“An ode to the
eternal muse of
learning”*

AGNIK CHATTERJEE
BATCH 2023-24

*“She strode towards
the city of her
dreams, he knelt
before the ruins of
his own.”*





SOHA AAFRIN
BATCH 2025-26

“Saudade”

NAME - ISHITA SINHA
BATCH - 2025-26

*“Where love meets
devotion”*





SHOUMIK SAHA
BATCH 2022-23

*“Art that speaks the
language of devotion”*

SUPRATIM ROY
BATCH 2023-24

*“সময়ের শিকলে বাঁধা
পড়েছি ঠিকই, কিন্তু কল্পনা
আজও ডানা মেলে ওই
নীল আকাশে।”*





ARCHI RAY
BATCH 2023-24

“Yearning”

SASWATI ROY
BATCH 2022-23

*“এক পেয়ালা চা, এক
মুঠো বিকেল আর
একটু ভূমি ।।”*





SABBASACHI SK
BATCH 2025-26

“রঙে লেখা গল্প।”

TANUSHREE HANSDA
BATCH 2025-26

*“Goku from Dragon
Ball Z”*





SUROTAMA GHOSH
BATCH 2025-26

*“Whispers of love under
emerald canopies”*

SANIA YASMIN
BATCH 2025-26

“The Iron Phoenix”





ANANYA HAZRA
B.SC. NURSING
INTERN

*“Eyes speak where
words fall silent”*

NIRMAN ACHARIA
BMLT 2ND YEAR

*“Anatomy of chaotic
mind”*





Voices behind The pages





Welcome to our inaugural edition! This magazine is a celebration of raw talent, designed to give voice to the incredible enthusiasm of our budding medico-artists.

From designing a cover page deeply inspired by the diverse themes within, to bringing this collective vision to life, every step has been a beautiful process of growth and discovery. It has been an absolute joy to steer this project and I am deeply grateful to everyone who contributed. I hope this debut edition ignites a spark that keeps this creative legacy burning bright for future cohorts.

Afreen Farzana

Batch 2022-23

Chief of the Art and Design team

I genuinely want to congratulate each one of you for the incredible effort, creativity, and dedication you've put into every artwork. 😊 Every drawing reflects your imagination, patience, and passion, making this section truly special.

Whether your work is simple or highly detailed, every contribution adds value and tells its own unique story. ✨ Being a part of our college magazine "Med Darpan" has been a truly memorable and enriching experience. The magazine is not just a collection of pages—it is a home for our creativity, emotions, memories, and dreams. Through your artwork, "Med Darpan" becomes more vibrant, meaningful, and inspiring. Every sketch, painting, and illustration adds life to its pages and reflects the artistic spirit of our college. Keep believing in your talent and continue creating without hesitation. ✨ Art is not about being perfect—it's about expressing yourself, inspiring others, and leaving a part of your heart in every creation. 🖌️

With heartfelt appreciation,

Shoumik Saha

Batch 2022-23

Judging Panel of Art Exhibition





The very first magazine of our college, Med Darpan, and it's been a pleasure to be a part of it. Being on the Photography team, I was amazed to witness the creativity and perspective of the kids reflected in their photographs. Final year is truly demanding and yet to be a small part of this feels privileged. Kudos to everyone for making the magazine success.

Shounak Das

Batch 2022-23

Judging Panel of Photography

Med Darpan is more than a college magazine. It is a reminder that life in a medical college is shaped not only by lectures, wards, and examinations, but also by the stories we live, the friendships we build, and the creativity we often forget we possess ✨.

Every page reflects a different perspective, and together they become a snapshot of a chapter in our lives that we will carry long after we leave these corridors.

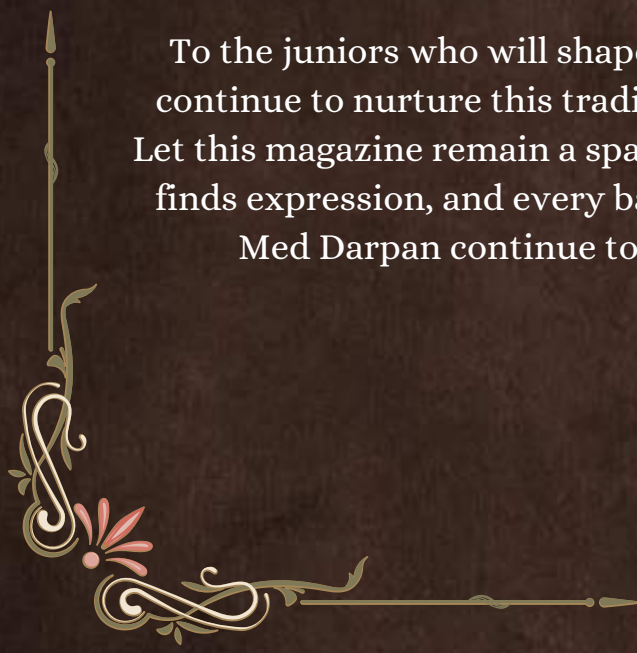
I am sincerely grateful to everyone who devoted their time, effort, and imagination to bringing this magazine to life. Being a part of Med Darpan was an absolute beautiful experience. Thank you to each and every contributor for proving that happens when people come together with a shared purpose, they can create something that will be cherished for years to come. It has been a privilege to be associated with this journey.

To the juniors who will shape the future editions of Med Darpan, I hope you continue to nurture this tradition with curiosity, dedication, and fresh ideas. Let this magazine remain a space where every voice is welcomed, every talent finds expression, and every batch leaves behind a piece of its own story. May Med Darpan continue to grow as a reflection of the spirit, diversity, and aspirations of our college. ❤️

With gratitude,

Sneha Das

Batch 2022-23



চিরটাকাল খেয়ালখুশিতে নিজের মতো ঐকেছি। কোনোদিন কোনো গল্প বা ছবির জন্য ইলাস্ট্রেশন করিনি। প্রস্তাবটা অপ্রত্যাশিত ছিল হয়তো, কিন্তু উত্তর তৈরি ছিল— “হ্যাঁ”। কোনো উদ্দেশ্যের জন্য আঁকলে তার পরিণতি হয়তো বা এই মেড দর্পণ। আমার আঁকা-প্রীতি এবং কতটা সফল হয়েছি, সেটা যাচাই করে দিক পাঠকেরা। এত প্রতিভাবান লোকের সাথে কাজ করে সত্যি আনন্দ পেলাম.. ধন্যবাদ সবাইকে, আমাকে এটার যোগ্য মনে করার জন্য। চিরকৃতজ্ঞ রইলাম।

ইতি,

Supratim Roy

Batch 2023-24

Associate of Art Team

শিল্পের কোনো গন্তব্য নেই, আছে শুধু পথচলা। সেই পথচলাই এতদিন নিজের আবেগ ও অনুভূতিই ছিল পরম বন্ধু। ছোটবেলা থেকেই পেন, পেঙ্গিল, রঙে আঁকিঝুঁকি কাটতে ভালোবাসতাম। তারপর কোথাও না কোথাও বইয়ের স্তুপে চাপা পড়ে গিয়েছিল জমে থাকা ইচ্ছেগুলো। কখনো ভাবিনি, এভাবে নিজের অনুভূতিগুলোকে গল্প, কবিতা আর ছবির মধ্যে মিলিয়ে দেওয়ার সুযোগ পাব। মেড দর্পণের হাত ধরে আবার নতুন করে ভাবতে শিখলাম, নতুনভাবে নিজেকে খুঁজে পেলাম। আশা করি পাঠকবন্ধুরাও এর মাঝে নিজেদের প্রতিধ্বনি খুঁজে পাবেন, কারণ এই প্রচেষ্টার আসল ঠিকানা তাঁদেরই মনে। এই সৃষ্টির অংশ হতে পেরে এবং এত দক্ষ ও গুণী মানুষের সঙ্গে পথ চলতে পেরে আমি আন্তরিকভাবে আনন্দিত এবং সকলের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

শুভেচ্ছান্তে,

Ahana Ghosh

Batch 2023-24

মেডদর্পণ বাস্তবায়ন এবং তাকে সাজিয়ে তুলতে আমি ক্ষুদ্র অবদান রাখতে পেরেছি। এই সুযোগের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। এই পত্রিকা আমাদের পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার ফসল। ধন্যবাদ জানাই সমস্ত কার্যনির্বাহীদের এবং শুভেচ্ছা আমাদের সদ্য চলতে শেখা পত্রিকাটিকে।

Prottyusha Mahanta

Batch 2023-24

Those who have been down in the trenches with us, knew how challenging every step of creating Med-Darpan was, so, I am delighted to have been a part of this process from its genesis to now its very first edition. My love for literature has finally found its home in my alma mater, and for that, I am thankful to each and every member of our team.

What we have created is not simply a magazine, it's legacy. May it continue to showcase our in-house talent and ingenuity for years and years to come!

Anohita Samanta

Batch 2023-24

আবেগের কি আর নিজস্ব কোনো অভিধান থাকে? হ্যাঁ, থাকে বোধ হয়! 'MEDদর্পণ' না হলে এই উত্তরটা আমার কাছে অনেকটাই অধরা থাকতো। আসলে এই ম্যাগাজিনের প্রতিটি পৃষ্ঠার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বেশ কিছু মানুষের ভাবনা, পরিশ্রম, ভালোবাসা আর সর্বোপরি আবেগ। একটি স্বপ্নকে ছুঁতে চাওয়ার সম্মিলিত প্রচেষ্টা যে এতটা ভয়ংকর সুন্দর হতে পারে- তা এই কাজ করতে গিয়েই বুঝতে পেরেছি। অনেক কিছু শেখার সুযোগও হয়েছে। কখনও নিজের লেখা প্রবন্ধের জন্য শব্দ বেছে নেওয়া, কখনও আবার ম্যাগাজিনের বিভিন্ন বিভাগের জন্য তথ্য সংগ্রহ করা, ব্যাকগ্রাউন্ড খোঁজা কিংবা অনুচ্ছেদ লেখা, এই সবকিছুর সাথে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাজ শেষ করা- প্রতিটি মুহূর্ত-ই ছিল মুহূর্তের কাছে ঋণী। অগণিত ঠিকানার ভিড়ে এই ম্যাগাজিনই হয়ে উঠল সেই আপন ঠিকানা যেখানে আমার সৃষ্টিশৈলী নিজের অস্তিত্ব ও পরিচয় খুঁজে পেল। আমার সাহিত্যপ্রেম কে একটি সুন্দর আশ্রয় দেওয়ার জন্য গভীরভাবে কৃতজ্ঞ এই ম্যাগাজিনের কাছে। ধন্যবাদ তাঁদের যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম আর নিঃস্বার্থ সহযোগিতায় এই সমবেত প্রয়াসের প্রথম পথচলা। 'MEDদর্পণ' প্রতিটি সংখ্যায় নতুন স্বপ্ন, সংস্কৃতি, চেতনা ও নতুন সৃষ্টির স্পন্দন নিয়ে পাঠকের মননে অমিলন থাকুক - এটাই প্রত্যাশা...

Meheli Pramanik

Batch 2023-24

Some opportunities stay with you forever, and being a small part of our college's first magazine is one of them. Bringing imagination to paper through my artwork has been truly fulfilling. Wishing this humble beginning grows into a legacy that every future batch will proudly carry forward.

Akashdeep Gupta

Batch 2024-25

Being a medical student, academics is the foundation of a successful career. But when we see ourselves as learners first, we discover countless qualities, that make our academic journey truly fulfilling.

During my time at this medical college, I discovered and developed many skills, and I made every effort to contribute to my institution.

This first-ever magazine of our college will always hold a special place in my heart because behind every printed page lies countless hours of passion, teamwork, dedication, and belief.

I feel so glad to be a part of this unforgettable journey.

Tanaya Chowdhury

Batch 2024-25

I am truly elated to have been able to make a small contribution as a part of the art team towards the college's first ever magazine. It was a wonderful experience being a part of a group of such talented artists united by their shared love for art and dedication for this new beginning. Being a part of this milestone has been an honour. I hope this marks just the beginning of a tradition that lasts, one that celebrates creativity, diverse voices and encourages all to create and to express.

Shruti Priya Rajhans

Batch 2024-25

রংদের নাকি বড় বদভ্যাস—খালি কাগজ দেখলেই দল বেঁধে নেমে পড়ে। রেখাগুলোও কম যায় না; সুযোগ পেলেই এঁকেবেঁকে এমন সব কাণ্ড করে, শেষে আমাকেই বলতে হয়

—"আচ্ছা, এবার তোমরাই ছবিটা শেষ করো!"

মেড দর্পণ-এর পাতায় যে ছবিগুলো দেখবেন, তারা কেউই খুব ভদ্র নয়। কেউ চুপিচুপি গল্প বলে, কেউ চোখ টিপে হাসে, কেউ আবার ভাবতে বসায়। যদি কোনো ছবি আপনার মনে একটুখানি কৌতুহল, একচিলতে হাসি, কিংবা দু'মুহূর্তের নীরবতা রেখে যেতে পারে

—তবেই আমাদের তুলি তার দুষ্টুমি সার্থক করেছে।

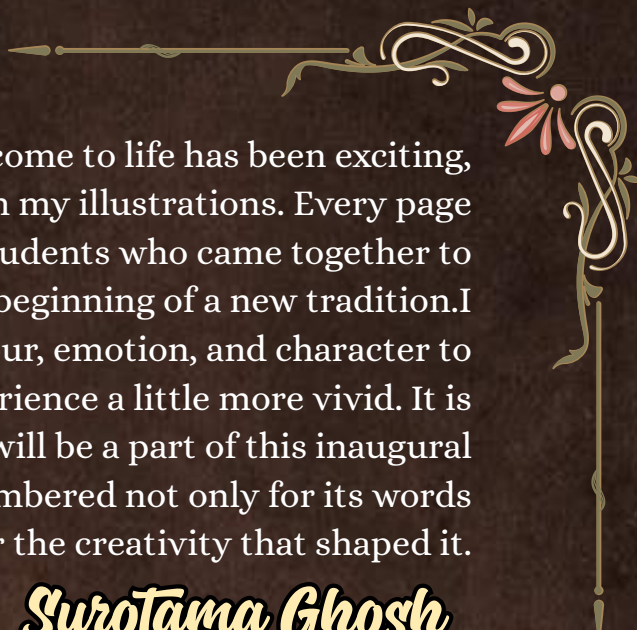
এত প্রতিভাবান দাদা, দিদি,ভাই,বোন এবং বন্ধুদের সঙ্গে এই রঙ-রেখার দৌড়ে সামিল হতে পেরে আমি সত্যিই আনন্দিত। সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ—বিশ্বাস করার জন্য,

পাশে থাকার জন্য, আর একটু-আধটু পাগলামিকে জায়গা দেবার জন্য।

ইতি,

Surajit Roy

Batch 2024-25



Watching our college's very first magazine come to life has been exciting, and I'm grateful to have contributed through my illustrations. Every page carries the enthusiasm and imagination of students who came together to create something that will always mark the beginning of a new tradition. I hope my artworks have helped to add colour, emotion, and character to these pages and making the reading experience a little more vivid. It is wonderful to know that my illustrations will be a part of this inaugural edition, and I hope this magazine is remembered not only for its words but also for the creativity that shaped it.

Surotama Ghosh
Batch 2025-26

This is the very first magazine of our college, and I am delighted to have made even a small contribution to it. I am truly thrilled and grateful to all my seniors for giving me this opportunity. I genuinely loved transforming those penned words into pencil art and eagerly look forward to create many more in the future. Together, we made our first college magazine a reality. Cheers to all of us!

Pritha Ghosh
Batch 2025-26

It's our first magazine to be published since joining this medical college, and I am truly delighted to contribute to it through my artwork. In the busy schedule of medical students, the enthusiasm shown by my beloved seniors and classmates for art and creativity is truly inspiring. Although my contribution to this magazine may not be significant, it will remain a beautiful memory for a lifetime and inspire me to undertake more creative endeavors in the future.

Bikram Majumder
Batch 2025-26



It is a privilege to be a small part of our college's first-ever magazine ,may
this first edition inspire creativity and keep memories

Sabbasachi sk

Batch 2025-26

Being a part of the team behind our college's first-ever magazine has been an experience I will always cherish. As the artist responsible for designing the cover page of the Bengali section, I wanted my artwork to convey more than just an aesthetic appeal—it is a visual representation of unity, dedication, and collective effort.

The illustration depicts students working together to build and place the Bengali section, symbolizing that every contribution, whether through words, art, or ideas, forms the foundation of something lasting. The medical elements woven into the design reflect our identity as future doctors, while the Bengali title celebrates the richness of our language, culture, and literary heritage.

It has been an honour to contribute to this historic first edition. I hope this magazine not only showcases the creativity and talent of our students but also becomes a cherished tradition that continues to inspire future batches.

Ishita Sinha

Batch 2025-26

You know you are in a medical college when you have to sacrifice your own hobbies and tantalising whimsies for the sake of cruel, cruel exams. Yes I am talking about art and how it has been a therapy to me more than a hobby, in the recent few years. After hours of monotonous studying, art has given me a forgiving refuge. I'll admit, I couldn't contribute a whole lot for the art section owing to my untimely semesters , yet whatever I had been blessed enough to contribute has been nothing but pure joy to my famished soul. Hopefully in the upcoming editions, I'll be able to contribute more, doing what I love for the cause I chose to love.

Thank you

Archi Ray

Batch-23-24

খুব ভালো লাগল কাজ করে।
নতুন অভিজ্ঞতা সবসময়ই স্পেশাল। অনেকদিন পর আঁকাতে
হাত দিয়ে পুরোনো স্মৃতি জেগে উঠল।
আরও এগিয়ে যাক এই পত্রিকা। শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা রইল।

Sarthak Bhattacharjee

Batch 2023-24

নিজেকে আর্টিস্ট বলবো না , কিন্তু আর্টকে খুবই ভালোবাসি । আজ
সেই ভালোবাসার টানেই মেডদর্পণ পত্রিকায় সবার সাহায্যে আমার
কিছু ইলাস্ট্রেশন উপস্থাপন করেছি । দাদা - দিদিদের সাথে কাজ করে
খুবই আনন্দ পেলাম ।
ধন্যবাদ সবাইকে ।

"যাবার আগে শুধু এই কথাটি বলে যাই—আগামী বছরের পাতায়
যেন আমাদের স্বপ্নেরা আরও নতুন রঙে রঙিন হয়ে ওঠে।"

Biswambhar Duya

Batch 2024-25



BMC&H SPORTS SPOTLIGHT



ARAMBAGH INTERCOLLEGE TOURNAMENT 2025

CHAMPIONS



- 1.Sahil Raja(21-22)
- 2.Akash Sengupta(21-22)
- 3.Qurban Ali (22-23)
- 4.Saklain Mondal (22-23)
- 5.Arghya Majumder (22-23)
- 6.Akash Murmu (22-23)
- 7.Sagun Mandi (23-24)
- 8.Rohit Roy (23-24)
- 9.Arsalan Ansari (23-24)
- 10.Shreyam Koley (23-24)
- 11.Upendranath Besra (23-24)
- 12.Mustafa Sk (23-24)
- 13.Abhinav Bishnoi(23-24)
- 14.Souvik Mukherjee (24-25)
- 15.Sahin Sarkar (24-25)
- 16.Arnab Das(24-25)

PURULIYA INTERCOLLEGE TOURNAMENT 2026

RUNNER UPS

- 1.Akash Murmu(22-23)
- 2.Yousuf Sk(22-23)
- 3.Abhinav Bishnoi(23-24)
- 4.Shreyam Koley(23-24)
- 5.Mustafa Sk(23-24)
- 6.Arsalan Ansari(23-24)
- 7.Rohit Roy(23-24)
- 8.Sagun Mandi(23-24)
- 9.Upendranath Besra(23-24)
- 10.Swastik Maiti(23-24)
- 11.Sarthak Bhattacharjee(23-24)
- 12.Souvik Mukherjee(24-25)
- 13.Sudipto Murmu(24-25)
- 14.Wasif Waliullah(24-25)
- 15.Akash Mondal (25-26)



UPCOMING

Themes

FOR THE NEXT ISSUE

সন্ধ্যার
কালো ছায়া:
যুক্তির
ওপারে।

ভূতপ্রেত, তন্ত্র ও মানুষ...

আদিম সত্তা বুঝিবা প্রেম হলে, ভয় আদিম অনুভূতি।

মানুষ ভয় থেকেই আগুন জ্বালাতে শিখেছে, কখনও বা অস্ত্র
হাতে শিকার করেছে। মানুষ উন্নত হয়েছে, কল্পনার বিস্তার
ঘটেছে। সেই কল্পনা থেকেই জন্ম নিয়েছে অবয়ব; কখনও বা তা
নিছকই আলেয়া।

প্রথম মাসে হাসির বিষয় দিয়ে বুঝিবা লেখকদের জব্দ করা
গেল না। এবার তবে ভয়...

Where certainty ends, the unknown begins. This issue explores the boundaries of human reason - the moments where established rules break down, logic fails, and new perspectives take over. Stand at the crossroads of what you knew and yet, what you just experienced. Send us your most compelling and reality bending fiction, sharp essays, and poetry.

Reason's Eclipse

अलौकिक:
अज्ञात
एक जहाँ

मनुष्य हमेशा से रहस्यों से अत्यंत आकर्षित रहे हैं। ऐसे सवाल जिसके उत्तर ना कभी विज्ञान दे सका है ना तर्क, इस दायरे के परे आरम्भ होता है एक ऐसा जगत जो कि आज भी अज्ञात है, इस लोक से आगे, अलौकिक कि दहलीज़ पर।

यह उसी अनदेखे और अनकहे संसार कि यात्रा है। केवल अदृश्य शक्तियों तक सीमित नहीं, बल्कि उन अनुभवों और कल्पनाओं का विस्तार जहाँ वास्तविकता और रहस्य मिलते हैं।

इस विषय के माध्यम से रचनाकारों को आमंत्रित किया जाता है ऐसे जहाँ का सृजन करने को जहाँ असंभव भी संभव लगता है।

THE READER'S VOICE

Letters to the Editor

Your Voice, Our Next Issue

We built this issue with diverse designs and fresh perspectives, but the most important voice is yours. Did a particular layout catch your eye? Is there something we could do better?

Send us your thoughts, critiques, and suggestions. The most insightful feedbacks will be featured in our upcoming issue!

Share your thoughts at :
med26bmc.darpan@gmail.com

Or Contact :

Aritra Singha Roy (Editor-in-chief) | +91 8101287357

Agnik Chatterjee (Associate Editor) | +91 9123736163

Neelanjan Chakraborty (Associate Editor) | +91 8093254446



Copyright Notice

© 2026 Burdwan Medical College Magazine Committee & Burdwan Medical College and Hospital. All rights reserved.

The copyright in the original literary works, original artwork, photographs, graphic designs, page layouts, editorial content, and compilation contained in this publication remains jointly vested in the Magazine Committee and the College Authority, unless otherwise specified.

Individual contributors retain moral rights over their original works. By submitting their work, contributors grant the Magazine Committee and the College Authority a perpetual, non-exclusive licence to publish, reproduce, archive, distribute, and promote the work in print and digital formats with due attribution.

Certain images, graphics, logos, and illustrations appearing in this publication are reproduced under licence, with permission, from public-domain sources, or under applicable fair-use/fair-dealing provisions where relevant. Copyright in such material remains with the respective copyright holders.

No part of this publication may be reproduced, stored, transmitted, or redistributed without prior written permission from the Magazine Committee and the College Authority.



BURDWAN
MEDICAL COLLEGE

